
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৮

পরিচয়

সভ্যতাবৃদ্ধির অনুপাতে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় কি-না, এ-প্রশ্ন আজিও তর্কাধীন, কিন্তু জটিলতা যে বাড়ে, সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরাও একমত। পাণ্ডিত্য বাদ দিয়াও দেখা যায়, এক পরিচয়-প্রথাই সভ্যসমাজে কত রকম ছোট-বড় জটিলতার সৃষ্টি করে। দু'বেলাই চোখোচোখি হয়, অথচ একজন সাধারণ-বন্ধুর অভাবে আলাপ করার জো নাই—এমন কে আছেন যাহাকে এ-অবস্থায় পড়িতে হয় নাই? পরিচয়ের অভাবে এক-গাড়ী লোক পরস্পরের দৃষ্টি এড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে চলিয়াছে—এ দৃশ্য এ দেশেও নিতান্ত বিরল নয়।

কিন্তু সভ্যতার আদবকায়দার কড়াকড়ি সত্ত্বেও মানুষের আদিম পরিচয়স্পৃহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। হঠাৎ সিগারেটের জন্য দেশলাইয়ের দরকার হয়, পাশের লোকের রিষ্ট্‌ ওয়াচ্‌ দেখিয়া সময় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া ওঠে, ট্রেণে কে কোথায় নামিবে এবিষয়ে অদম্য কৌতূহলকে চাপিয়া রাখা চলে না—সভ্যতার বাঁধন কিছু আল্‌গা হয়, আর এই ক্ষণিকের ফাঁক দিয়া অনেক সময় স্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়া যায়। সঙ্গলোভী মানুষ অন্যের সংস্পর্শ পাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণতর বোধ করে।

এই সঙ্গলোভই মানুষকে দিয়া সমাজ গড়ায়, শিল্প রচায়, সাহিত্য-সৃষ্টি করায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের স্মৃতি-সভার অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হয়, সাহিত্য কথাটার মূলে আছে 'সহিত'। যে-মানুষ কাহারও সহিত বাস করে না, সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো তাগিদ সে অনুভব করে কি-না সন্দেহ। সাহিত্যের বাহন যে ভাষা, তাহা সমূহের সৃষ্টি। একা-মানুষের ভাষার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। হয়ত এমন জ্ঞান আছে যাহা একান্ত নির্জ্জন সাধনা-সাপেক্ষ; সে-জ্ঞান হয়ত এমন নিগূঢ় ও মৌলিক যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অন্য সব প্রকার জ্ঞানই সুগম হইয়া আসে—যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—তখন ভাষা বা সাহিত্যের কোন প্রয়োজনবোধই থাকেনা। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ সে-জ্ঞানের সাধক নয়। নিজেকে জানিবার, নিজের পরিচয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম তীব্র নয়; সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, এই আত্মপরিচয় লাভই তাহার উদ্দেশ্য; কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের এইটাই

অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপলব্ধি যে, অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্ব-রূপ জানা যায় না; স্ব-কে জানিবার জন্য অপরের প্রয়োজন; আত্ম ও পর কুজন্‌ম্যাজেরু মত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। তাই সে অপরের সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায়। কারণ, সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-পরিচয়, তাহা চাক্ষুষ পরিচয়ের চেয়েও প্রত্যক্ষ। দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্যজগতেই সমধর্ম্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন করে, বিপরীত-মুখী ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যেও তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারে। এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ—ভাষা-সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগসঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণ-চিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।

বাংলা দেশে 'পরিচয়' আজ এই ভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মূলভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া; কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে। কবিতা, কথা-শিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব—পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে, এ-বিষয়ে 'পরিচয়' সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। 'পরিচয়' জানে যে তার সাধ যত, সাধ্য তার বহু পশ্চাতে। কিন্তু তাহার একান্ত বিশ্বাস, তাহার এই স্বীকৃত অক্ষমতাই দেশের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, ও তাঁহাদের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা তাহার রুক্ষ বিঘ্ন-বন্ধুর পথকে শ্যামশোভন ও সহজ-চারণ করিয়া তুলিবে। এই বিশ্বাসই তাহার দুরারোহিণী আশার মূলে জলসেচন করিয়া আজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছে। এখন ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাঁহাদের উপর—বাংলা ভাষার অতীতকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বর্ত্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ।

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ

বৈদিক সাহিত্যের সহিত যাঁহার কিছুমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহার অবিদিত নাই যে, বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড-বেদের লক্ষ্য অভ্যুদয় (স্বর্গাদির সাধন) এবং জ্ঞানকাণ্ড-বেদের উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স (অপবর্গ বা মুক্তি)। 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' লইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ্' লইয়া জ্ঞানকাণ্ড।

সংহিতা প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক, ব্রাহ্মণে যজ্ঞের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা। আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ—'কর্ম্মকাণ্ড বেদের প্রতিপাদ্য যজ্ঞক্রিয়া'। দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রসহকারে যে অনুষ্ঠান বা দ্রব্যত্যাগ, তাহার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের জন্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—উভয়েরই প্রয়োজন। কারণ, সংহিতায় নিবদ্ধ মন্ত্রের জ্ঞানই যজমানের পক্ষে যথেষ্ট নহে—যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণে বিবৃত যজ্ঞের প্রণালী, পদ্ধতি, উপকরণ প্রভৃতির জ্ঞানও আবশ্যক।

দেখা যায়, প্রাচীন যুগে আর্য্য-মানবের জীবন চারিটি নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বে সুবিন্যস্ত ছিল। ইহাদিগের নাম ছিল—'আশ্রম'। প্রথম, ব্রহ্মচর্য্য (studentship), তাহার পর গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ এবং সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস—ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। ব্রহ্মচারী অবস্থায় আর্য্য-বালককে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 'স্বাধ্যায়' করিতে হইত—স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ। স্বাধ্যায় অর্থে সু-আবৃত্তি (memorisation)। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আর্য্যযুবক গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। এই আশ্রমে দার পরিগ্রহ করিয়া তিনি পত্নীর সহিত বৈদিকমন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। গৃহস্থ কিন্তু চিরদিন সংসারী থাকিতেন না—বল্গামুখে মৃত্যু (die in harness) তখনকার প্রথা ছিল না। নিজের শরীরে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ লক্ষ্য করিলে তিনি পুত্রের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত 'আরণ্যক'—অরণ্যং মনুষ্যে। ইহাই বানপ্রস্থ আশ্রম। আরণ্যক বেদের কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করিতেন—যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া যজ্ঞাঙ্গ সমূহের রূপক-ভাবনা ও প্রতীক-উপাসনা করিতেন। যে সকল গ্রন্থে ঐরূপ ভাবনা ও উপাসনার উপদেশ আছে, তাহার নাম 'আরণ্যক'—অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্।

বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। আরণ্যক বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া 'অধিকারী' হইলে, এই চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত পরিব্রাজক বা ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর আলোচ্য গ্রন্থ—

উপনিষদ্। ইহা আরণ্যক গ্রন্থের অন্ত্য বা চরম ভাগ—ইহাতেই বেদের প্রপূর্ত্তি। সেইজন্য ইহার নাম 'বেদান্ত'—বেদান্তো নাম উপনিষদ্। চতুর্থাশ্রমী এই উপনিষদ্ হইতে উচ্চতম ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া মোক্ষ-যাত্রার যাত্রী হইয়া মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতেন। কারণ, মুক্তিই নিঃশ্রেয়স (sommum bonum)। অতএব প্রাচীন ভারতে মানবজীবন যেমন চারিটি আশ্রমে সুবিন্যস্ত ছিল, বৈদিক সাহিত্যও তেমনি চারিটি পর্য্যায়ে সুবিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচারীর জন্য সংহিতা, গৃহস্থের জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থের জন্য আরণ্যক এবং সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদ্।

এই উপনিষদের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, তাঁহাদের অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, ভারতবর্ষের সার সম্পদ যে অদ্বৈতবাদ, ঐ অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের কপোলকল্পিত একটা আধুনিক মতবাদ। অথচ উপনিষদের আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এ মতবাদ অর্ব্বাচীন নহে—সুপ্রাচীন এবং ইহার মূল উপনিষদের মর্ম্মস্থানে সুপ্রোথিত। শুধু মূল কেন? প্রাচীনতম উপনিষদের সহিত পরিচিত হইলে দেখা যায়, এই বৈদান্তিক মতবাদ সেই অতীতযুগে কেবল অঙ্কুরিত নহে, পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়া চিন্তারাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। তাঁহার মনীষার বলে ও রচনার কৌশলে তিনি অদ্বৈতবাদকে এক চমকপ্রদ রূপ দান করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য্যের মুণ্ডুক্য-কারিকায় (যে কারিকার উপর শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন) আমরা পূর্ব্বেই অদ্বৈতবাদের পরিণত মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাই। যোগবাসিষ্ঠে ও সূতসংহিতায়ও অদ্বৈতমতের সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। এ গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী যাহাই হউক না কেন, ইহারা যে শঙ্করের অগ্রগামী, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি স্বয়ং তাঁহার শারীরক ভাষ্যে আত্মমত সমর্থন জন্য 'ভগবান্' উপবর্ষকে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষ নাকি পাণিনির গুরু। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর এক বৃত্তি রচনা করেন—সেই জন্য তাঁহার নাম 'বৃত্তিকার'। উপবর্ষও অদ্বৈতবাদী।

ঐ যে ব্রহ্মসূত্র—যাহার উপর শঙ্কর ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন—উহাও অদ্বৈত-প্রতিপাদক গ্রন্থ। ইহারই নামান্তর বেদান্ত দর্শন। বাদরায়ণ ঐ ব্রহ্মসূত্রের গ্রন্থকার। তিনি কতদিনের লোক?

পাণিনির ৪।৩।১১০ সূত্রে পারাশর্য্য-রচিত এক 'ভিক্ষুসূত্রে'র উল্লেখ আছে। 'পারাশর্য্য'-অর্থে পরাশর-তনয়। অতএব খুব সম্ভব ভিক্ষুসূত্র-প্রণেতা পারাশর্য্য ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস' বাদরায়ণ, অভিন্ন ব্যক্তি। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ভিক্ষুসূত্র ব্রহ্মসূত্রেরই নামান্তর। প্রাচীনকালে

বেদান্ত দর্শন সংসারত্যাগী চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষুরই আলোচ্য ছিল। অতএব উহাকে 'ভিক্ষুসূত্র' বলা অসঙ্গত নহে।

এই ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম—উত্তরমীমাংসা। পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্র যেমন কর্ম্মকাণ্ডবেদের বিরোধভঞ্জনে ও সামঞ্জস্য-বিধানে ব্যাপৃত, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্র জ্ঞানকাণ্ডবেদের (উপনিষদের) সমন্বয়-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে নিয়োজিত। অতএব ইহার সার্থক নাম 'উত্তরমীমাংসা'।

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক কয়েকজন বেদাচার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমী, কার্ষাজিনি, আত্রেয়, জৈমিনি, আশ্মরথ্য ও বাদরি। জৈমিনি প্রখ্যাত পূর্ব্বমীমাংসাকার। অপর কয়জনের রচিত কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। তবে ব্রহ্মসূত্রে যে ভাবে তাঁহাদের মত উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, কাশকৃৎস্ন ও কার্ষাজিনিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রকে 'ঔপনিষদ দর্শন' বলিয়াছেন—কারণ, ব্রহ্মসূত্রের মূল ভিত্তি উপনিষদ্। ব্রহ্মসূত্র কোন্ কোন্ উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তথাপি, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকী, কঠ, মুণ্ডক, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ যে ব্রহ্মসূত্রে লক্ষিত হইয়াছে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকখানি যে অর্ব্বাচীন গ্রন্থ, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। পাশ্চাত্যেরা উপনিষৎ-সমূহকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মুখ্য বা major এবং গৌণ বা minor। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকী, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দ্বাদশখানি মুখ্য উপনিষদ্—আর সমস্ত minor বা গৌণ। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্রহ্মসূত্র যে কয়খানি উপনিষদের উপর স্থাপিত (যাহাদের ইতিপূর্ব্বে নামোল্লেখ করিলাম), ঐ সকল উপনিষদ্ই পাশ্চাত্য মতানুযায়ী মুখ্য বা major উপনিষদ্। ইহাদের মধ্যে আবার বৃহদারণ্যক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক।* এই সকল উপনিষদে—বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে—আমরা যে অদ্বৈতবাদের সাক্ষাৎ পাই তাহা

*Of especial weight in our view, is the proof advanced that Brih. 1—4 (not the appendix 5—6) together with Satap. Br. 10, 6 is older than all other texts of importance, especially older than the Chandogya *Upanishad*. **Thus we have to look for the earliest form of the doctrine of the *Upanishads* above all in the Yagnavalkya discourses of the Brihadaranyaka.—Deussen's Philosophy of the *Upanishads* p. 398.

নিপট, নিবিড়, নিঃসংশয়, নির্ঘাত অদ্বৈতবাদ—তাহার মধ্যে সন্দেহ, সংকোচ, দ্বিধা, দৈন্যের বিন্দুবিসর্গ নাই। পাশ্চাত্যেরা এই অদ্বৈতবাদের সাক্ষাতে বিস্মিত হইয়া ইহাকে daring, uncompromising, eccentric Idealism বলিয়াছেন—কারণ, ইহার তুলনায় পার্‌মিনাইদিস্ বা প্লেটোর ছায়াবাদ অথবা ফিক্‌টে বা বার্‌ক্লির বিজ্ঞানবাদ অকিঞ্চিৎকর। সেই জন্য অধ্যাপক মাক্‌স্‌মূলর গদ্‌গদ বাক্যে বলিয়াছেন যে, ঐ অদ্বৈত-বাদের তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করিলে আমাদের চিত্তের গতি কেমন যেন স্তম্ভিত হয়—আমাদের শরীর যেন 'ছমছম' করে। অতএব অদ্বৈতবাদের স্থান যে, ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে সুপ্রাচীন—এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। পুনশ্চ যে সকল প্রাচীন ঋষিরা এই অদ্বৈতবাদকে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির দ্বারা সজীব, সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করিয়া ইহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগের মুখ্যতম। এই যাজ্ঞবল্ক্য কে? বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়?

পুরাণে বেদসঙ্কলনের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় সমকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তদানীং প্রচলিত ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব মন্ত্রসমূহ সংকলন করিয়া সংহিতার আকারে নিবদ্ধ করেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হয় 'বেদব্যাস'। ব্যাস অর্থে সংগ্রহকর্ত্তা—রচয়িতা নহে। ঐ কার্য্যে চারিজন বেদপারগ শিষ্য তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪।৭

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজুংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয়! ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪।১৩-১৪

'পরে ব্যাস ঋক্‌সমূহের উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ সঙ্কলন করিলেন; যজুঃসমূহের উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদ এবং সামসমূহের উদ্ধার করিয়া সামবেদ সঙ্কলন করিলেন এবং অথর্ব্ববেদ দ্বারা যথাবিধানে ব্রহ্মত্ব স্থাপন এবং রাজার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাইলেন।'

বেদ-সঙ্কলন কার্য্যে যে শিষ্য-চতুষ্টয় ব্যাসদেবের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু।

পরবর্ত্তীকালে ইহাঁদিগের নাম ভারতীয় সমাজে সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে ইহাঁদিগের তর্পণের এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল সূত্র ভাষ্য ভারত ধর্ম্মাচার্য্যাঃ যে চান্যে আচার্য্যাঃ তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪।

পৈল ঋগ্বেদের, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদের, জৈমিনি সামবেদের এবং সুমন্তু অথর্ব্ববেদের সঙ্কলন কার্য্যে গুরুর সহায়তা করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন-সঙ্কলিত যজুর্ব্বেদের নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণ যজুঃ। প্রবাদ এই যে, বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর সহিত বিরোধ করিয়া নূতন যজুর্ব্বেদ গ্রন্থন করেন—তাহার নাম বাজসনেয় সংহিতা বা শুক্ল যজুঃ। এ সম্বন্ধে পুরাণের বিবরণ অনেকটা রোমাঞ্চকর। গুরু-শিষ্যের বিবাদ যখন অতিমাত্রায় উঠিল, তখন গুরু শিষ্যকে বলিলেন—'বেশ! আমার নিকট লব্ধ যজুঃ প্রত্যর্পণ কর।' যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্থ সমস্ত যজুঃ বমন করিলেন আর বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যেরা তিত্তিরি পক্ষীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ বান্ত যজুঃ চঞ্চুপুট দ্বারা উদরস্থ করিল। সেই হইতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের নাম হইল 'তৈত্তিরীয়'-সংহিতা। অভিমানে যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আশ্রম ত্যাগ করিয়া সূর্য্যের উপাসনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন এবং কালক্রমে সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সূর্য্যের প্রসাদে নবতর ও কল্যাণতর যজুঃ লাভ করিলেন। ইহাই শুক্ল যজুর্ব্বেদ। যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের নিকট হইতে এই যজুর্ব্বেদ লাভ করিলেন, অতএব ইহার নাম হইল—'বাজসনেয়'-সংহিতা।

এই উপাখ্যানের মূলে, রূপকাকারে যে সত্যই নিহিত থাকুক, ইহা নিঃসংশয় যে, শুক্ল যজুর্ব্বেদের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বৃহদারণ্যকের শেষাংশে লিখিত আছে—আদিত্যানি (অর্থাৎ আদিত্য হইতে প্রাপ্ত) ইমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে। ঐ গ্রন্থের আরও কয়েক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যকে 'বাজসনেয়' যাজ্ঞবল্ক্য বলা হইয়াছে।

প্রত্যেক বেদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ আছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের যেমন 'তৈত্তিরীয়' ব্রাহ্মণ, সেইরূপ এই শুক্ল যজুর্ব্বেদের সহিত সংশ্লিষ্ট 'শতপথ' ব্রাহ্মণ। এই শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়ের নাম বৃহদারণ্যক। ইহাই আমাদের উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্। ইহার আরম্ভ-বাক্য (opening sentence)—ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। শঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার উপোদ্‌ঘাত (introduction) এইরূপ :—

'উষা বা অশ্বস্য' ইত্যেবমাদ্যা বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণোপনিষদ্।
* * সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদ্ আরণ্যকম্ * *
তস্যাস্য কর্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোঽভিধীয়তে।

এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড এবং সমগ্র তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় অধ্যায় নয় খণ্ডে এবং চতুর্থ অধ্যায় ছয় খণ্ডে বিভক্ত) যাজ্ঞবল্ক্যের কথাকাহিনীতে ও তাঁহার উপদেশে মুখরিত। ঐ সকল উপদেশ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

কিন্তু সে আলোচনার পূর্ব্বে, এই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিগত জীবনের কি বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে তদ্‌বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গৃহস্থ যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী।

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী—বৃহ ৪।৫।১।

দুই পত্নীর মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী আর কাত্যায়নী স্ত্রী-প্রজ্ঞা (স্ত্রী-জনোচিত বুদ্ধিমতী)। গার্হস্থ্য জীবনে যাজ্ঞবল্ক্য যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিতেন, স্বয়ং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তদানীং প্রচলিত রীতি-অনুসারে ছাত্র বা শিষ্যদিগকে গৃহে স্থান দিয়া বিদ্যাদান করিতেন। ঐরূপ ছাত্রকে 'অন্তেবাসী' বা 'ব্রহ্মচারী' বলিত।

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণম্ উবাচ—বৃহ ৩।১।২।

ঐ সময়ে রাজর্ষি জনক বিদেহ (মিথিলার) অধিপতি ছিলেন। বৃহদারণ্যকে তাঁহাকে 'সম্রাট্' বলিয়া সম্বোধন আছে। ইহাতে মনে হয় তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষের অধিরাজ ছিলেন। রাজর্ষি জনক একবার এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ইজে বৃহ ৩।১।১।

ঐ যজ্ঞসভায় কুরুপাঞ্চালের (ফলতঃ উত্তর ভারতের) সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন—তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুঃ। যাজ্ঞবল্ক্যও শিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কে 'অনূচানতম' (বেদবিদ্যায় বরিষ্ঠ)—ইহা জানিবার জন্য জনকের কৌতূহল হইল। (বলা উচিত যে, জনক কেবল যে পার্থিব সম্পদে সম্পন্ন ছিলেন, তাহা নহে—তিনি 'অধীত-বেদ' ও 'উক্তোপনিষৎক' ছিলেন অর্থাৎ বেদবিদ্যায় তাঁহার প্রগাঢ় প্রবেশ ছিল—এবং বৃন্দারক আঢ্যাংসন্ অধীতবেদ উক্তোপনিষৎকঃ (বৃহ, ৪।২।১)। জনক ঐ উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্থলে এক সহস্র গাভী বাঁধিয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেক

গাভীর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশটি স্বুবর্ণ পাদক গাঁথিয়া দিয়া বলিলেন—'হে আর্য্য ব্রাহ্মণগণ!—যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম্—আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি এই গোসহস্র লইয়া যান।' কোন ব্রাহ্মণই অগ্রসর হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যকে আদেশ করিলেন 'সৌম্য! এই গাভীসমূহ লইয়া যাও।' শিষ্য তাহাই করিল। ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বর সভায় কোন দুঃসাহসী কন্যা-গ্রহণ করিলে, রাজারা অপমানে অন্ধ হইয়া তাহাকে যেরূপ আক্রমণ করিত, এক্ষেত্রেও সেইরূপই ঘটিল। সমবেত ব্রাহ্মণেরা বলিতে লাগিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ!—ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য! ব্রহ্মিষ্ঠোসি।' তখন যাজ্ঞবল্ক্যের উপর অজস্র প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যথোচিত উত্তর দিয়া প্রত্যেককেই নিরস্ত করিলেন। যজ্ঞসভায় গার্গীনাম্নী একজন ব্রহ্মবাদিনী উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিলেন—'মহাশয়গণ! আমি ইহাকে দুইটি প্রশ্ন করিতে পারি কি? যদি ইনি আমার ঐ প্রশ্নদ্বয়ের সদুত্তর দিতে সক্ষম হন তবে জানিবেন কেহই ইহাকে ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না—ন বৈ জাতু যুষ্মাকম্ ইমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতা ইতি।' তখন গার্গী বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন বীরপুত্র ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া অরাতিকে দুইটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করে, তেমনি তোমার প্রতি দুইটি প্রশ্নবাণ সন্ধান করিলাম—উত্তর দাও।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—পৃচ্ছ গার্গি! তখন উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলিল। অবসানে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে মান্য ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মবাদে নিশ্চয়ই আপনারা কেহই ইহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। যদি নমস্কার দ্বারা ইহার নিকট নিষ্কৃতি পান, তাহাই যথেষ্ট মনে করিবেন—তদেব বহুমন্যেধ্বং যদ্ অস্মাৎ নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'ব্রাহ্মণগণ! মৌনী রহিলেন কেন? যাঁহার যাহা ইচ্ছা, প্রশ্ন করুন—যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু, সর্ব্বে বা মা পৃচ্ছত।' কিন্তু কেহই সাহসী হইলেন না—তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে (প্রথম হইতে নবম কাণ্ড পর্য্যন্ত) এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ঐ বিবরণে বিবিধ বাদবিতণ্ডার মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব কি ভাবে উজ্জ্বলিত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

স হোবাচ এতদ্ বৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি! ব্রহ্মজ্ঞগণ সেই অক্ষরের এইরূপ বর্ণন করেন। সেই অক্ষর বা ব্রহ্মবস্তু কিরূপ? তিনি—

অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্, অলোহিতম্ অস্নেহম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্, অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্, অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অসুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্—তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, সুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল অ—অ, ন—ন,—তিনি নেতি নেতি মাত্র।

এই বৈদেহ জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা বেদবিদ্যা বিষয়ে অনেক সময়েই আলোচনা করিতেন। অথ হ যৎ জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ অগ্নিহোত্রে সমূদাতে—'কোন সময় বৈদেহ জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য—উভয়ের মধ্যে অগ্নিহোত্র সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল।' এ আলোচনার বিবরণ রক্ষিত হয় নাই। তবে বৃহদারণ্যক হইতে জানিতে পারি, যাজ্ঞবল্ক্য ঐ আলোচনায় প্রীত হইয়া জনককে 'কাম-প্রশ্ন' বর দিয়াছিলেন। তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বরং দদৌ। স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে, তং হ অস্মৈ দদৌ—৪।৩।১।

'কামপ্রশ্ন'-বর দানের অর্থ এই—জনক যাহা প্রাণ চায় প্রশ্ন করিবেন, যাজ্ঞবল্ক্য অসঙ্কোচে তাহার উত্তর দিবেন। তদনুসারে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, জনক আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকে নিগূঢ় প্রশ্ন করিতেছেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাহার সংশয়চ্ছেদী উত্তর দিতেছেন। এখানেও সেই অদ্বৈতবাদ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ—'যদি দ্বৈত কিছু থাকিত, তবে তাহার অনুভব হইতে পারিত। কিন্তু দ্বৈত, দ্বিতীয়, বিভক্ত কই?' এই যে মহান্ অজ আত্মা—যিনি অজর অমর অভয়—তিনিই ব্রহ্ম—স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরঃ অমৃতঃ অভয়ো ব্রহ্ম—বৃহ ৪।৪।২৫।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের আর এক দিনের বিবরণ বৃহদারণ্যকের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে রক্ষিত হইয়াছে। বৈদেহ জনক রাজাসনে সমাসীন আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তথায় উপস্থিত হইলেন—জনকো হ বৈদেহ আসাং চক্রে অথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। রাজা বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য! কি উদ্দেশ্যে আগমন? পশুলাভের ইচ্ছায় না সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনার জন্য?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—উভয়মেব সম্রাট্—'সম্রাট্! উভয়ই বটে।' তখন উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। জনক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে ব্রহ্মতত্ত্বের

নিগূঢ় রহস্যসমূহ বিবৃত করিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইয়া বলিলেন—'হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামি—আপনাকে হস্তিতুল্য বৃষ সহ সহস্র গাভী দান করিতেছি।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'আমার পিতার আদেশ—সম্যক্ উপদেশ না দিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না—নাননুশিষ্য হরেত ইতি।' রাজা আসন হইতে উঠিয়া শিষ্যভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বলিলেন—'নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য! অনু মা সাধি—'গুরো! আপনাকে নমস্কার—আমায় উপদেশ করুন।' তখন যাজ্ঞবল্ক্য ধাপে ধাপে উঠিয়া জনকের নিকট নিগূঢ়তম চরম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন—'স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে, অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্জতে, অসিতো নহি ব্যথতে, ন রিষ্যতি—এই পরমাত্মার একমাত্র পরিচয় নেতি নেতি। ইনি অগ্রাহ্য—ইহাঁকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য্য—শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ—আসক্ত হন না, ইনি অসিত—ব্যথিত হন না, রিষ্ট হন না।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ইহাই চরম—এই আপনি 'অভয়' প্রাপ্ত হইলেন—'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোসি।' জনক বলিলেন—'ভগবন্! আপনি আমাকে অভয় প্রাপ্তি করাইলেন—আপনারও অভয় প্রাপ্তি হউক। আপনাকে নমস্কার—অভয়ং ত্বা গচ্ছতাৎ যাজ্ঞবল্ক্য! যো নো ভগবন্ অভয়ং বেদয়সে—নমস্তে অস্তু—ইমে বিদেহাঃ অয়মহম্ অস্মি—এই বিদেহ রাজ্য ও নিজেকে আপনাকে নিবেদন করিলাম।' উপনিষদ্ বলেন—দ্বৈতাদ্ বৈ ভয়ং ভবতি—দ্বৈত হইতেই ভয় হয়—যিনি অদ্বৈত, সেই ব্রহ্মই অভয়।

অন্যত্রও যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ঐ অভয়ের উপদেশ-অন্তে বলিতেছেন—এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি। 'হে সম্রাট্! ঐ ব্রহ্মলোক, তুমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে।' যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলে জনক বলিলেন, 'ভগবন্! বিদেহ রাজ্য আপনাকে নিবেদন করিলাম। তৎসঙ্গে নিজেকেও নিবেদন করিলাম।'

এইরূপে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহাধিপতি জনককে অদ্বৈততত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রাজর্ষি জনকের পরিচয় স্থলে এ ব্যাপার উল্লিখিত হইত:—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির্যস্মৈ ব্রহ্ম পারায়ণং জগৌ।

প্রাচীন ভারতের প্রথামত, কালক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যের সংসার-আশ্রম ছাড়িবার সময় আসিল। তিনি পত্নীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'মৈত্রেয়ি! আমি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবার জন্য এস্থান ত্যাগ করিব। আইস, তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিই—মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ (অন্যদ্ বৃত্তম্ উপাকরিষ্যন্) প্রব্রজিষ্য

বা অরে অহম্ অস্মাৎ স্থানাদ্ অস্মি ; হন্ত তে অনয়া কাত্যায়ন্যা অন্ত করবাণি ইতি।' মৈত্রেয়ী বলিলেন—'স্বামিন্! এই সমুদয় পৃথিবী যদি বিত্তপূর্ণা হয়, তদ্দ্বারা আমি কি অমৃতা হইতে পারিব ?—সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেন অমৃতা আহো ন ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'তাহা কি কখন হয়? অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন—বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশাই নাই।' ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিতেন—ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। তাই তিনি বলিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যা কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্—যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ না হয়, তাহা লইয়া আমি কি করিব? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি—আপনি আমাকে প্রজ্ঞান উপদেশ করুন।' কারণ, মৈত্রেয়ী জানিতেন—প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ—প্রজ্ঞান দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। তখন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট অমোঘ অদ্বৈততত্ত্ব উপদেশ করিলেন। ইতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার—উপদেশ-অন্তে যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজিত হইলেন।

ঐ উপদেশের সার মর্ম্ম এই :—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। পরমাত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। মৈত্রেয়ি! এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিলে এই সমুদায়ই বিদিত হয়।' যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ? যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। স এষ নেতি নেতি আত্মা * * * বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ * * এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্—৪।৫।১৫। 'যেখানে (মনে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু আছে, সেখানেই একজন অপরকে দর্শন করে, একজন অপরকে আঘ্রাণ করে, একজন অপরকে আস্বাদন করে, একজন অপরকে বচন করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে মনন করে, একজন অপরকে স্পর্শন করে, একজন অপরকে বিজ্ঞান করে। (কিন্তু) যখন কাহারও নিকট সবই আত্মা হইয়া গেল, তখন কিরূপে কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কাহাকে বচন করিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে

স্পর্শন করিবে, কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে? যাহা দ্বারা এই সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' ('ইহা নয়' 'ইহা নয়')। বিজ্ঞাতা কিরূপ বিজ্ঞাত হইবেন? হে মৈত্রেয়ি! ইহাই অমৃতত্ব।' সেই জন্যই উপনিষদ্ অন্যত্র বলিয়াছেন—অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্—যিনি বিষয়ী (Subject), তিনি কখনও বিষয় (বিজ্ঞাত= Object) হইতে পারেন না।

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ—'যে জানেনা সেই জানে, যে জানে সে জানে না।' অদ্বৈততত্ত্ব এমনই প্রহেলিকা—ইহা সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য, সমস্ত দ্বৈতের চিরসমন্বয়—supreme unity of all contradictions।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে এই বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে। উভয় বিবরণে ভাষাগত—এমন কি অক্ষরগত সৌসাদৃশ্য—তবে চতুর্থ অধ্যায়ের বিবরণ কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত। এই দ্বিরুক্ত বিবরণ (double recension) দৃষ্টে মনে হয়, মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ বেশ সুপ্রাচীন।

উপরে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় উপলক্ষে আমরা তাঁহার উপদিষ্ট অদ্বৈতবাদের প্রতি ঈষৎ লক্ষ্য করিলাম। ইহা ইঙ্গিত মাত্র—তদধিক নহে। আগামী বারে আমরা ঐ অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র নির্দ্ধারণ করিতে ও ঐ সূত্রের বিবৃতি ও ব্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বৌদ্ধধর্ম্মের দান

(১) সাহিত্য

বৌদ্ধধর্ম্ম ইউরোপের পণ্ডিতদের দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করতে পেরেছে আমাদের তা' পারে-নি। অথচ এই ধর্ম্ম যে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ তা'তে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রেরণা পেয়েই ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা পূর্ণবিকাশ লাভ করেছিল; কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যে নূতন রস সঞ্চার হ'য়েছিল, অধ্যাত্ম-দৃষ্টিও প্রসার লাভ করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে সাইবিরিয়া ও পারস্য থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের অধ্যাত্ম-দৃষ্টির ভিতর যে আজ অবধি একটা ঐক্য দেখা যায় তা' বৌদ্ধধর্ম্মের অনুপ্রেরণাতেই ঘটেছিল। ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার যদি বেশীর ভাগ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই হ'য়ে থাকে, তবে তা'র ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন উপেক্ষা ক'রে নিজেদের আদর্শকেই যে ক্ষুণ্ণ করছি, সে কথা জোর ক'রেই বলা চলে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে নূতন ভাবধারা বইয়ে দিয়ে ভারতের প্রাণকে রসময় ক'রে তুলেছিল সে ধারা কোথায় কি ভাবে নূতন নূতন উৎসের সৃষ্টি করেছিল তা' আমাদের জানতে হ'বে, নইলে ভারতের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন সাহিত্য নানা ভাষায় পাওয়া গেছে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কম্বুজে পালি ভাষায়, নেপালে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়, ও তুর্কীস্থানের মরুভূমিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও নানাস্থানীয় ভাষায়, এ ছাড়া সমস্ত বৌদ্ধসাহিত্যের অনুবাদ রয়েছে তিব্বতী, চীনা ও মাঙ্গোলীয় ভাষায়। বৌদ্ধসাহিত্যের এই সমষ্টি দিকটা নিয়ে প্রথম তুলনামূলক আলোচনা সুরু করেন ফরাসী পণ্ডিত ইউজেন বুর্ণুফ (Eugene Burnouf)। ১৮৪৪ সনে তাঁর বই Introduction a l'histoire du Buddhisme Indien প্রথম প্রকাশ হয়। তখন বৌদ্ধ সাহিত্যের কোন বইই ছাপা হয়নি। প্রাচীন পুঁথির উপর নির্ভর ক'রেই তাঁকে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করতে হ'য়েছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এই প্রায় একশ বছর ধ'রে তাঁর বই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সব চেয়ে বড় বই হিসাবে পণ্ডিত মহলে সম্মান পেয়ে আসছে। বুর্ণুফের সময় থেকে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার পণ্ডিতেরা বেশীর ভাগ তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণেই বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা ক্রমশই বুঝতে পারলেন যে কোন বিশেষ দেশের বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের যে পরিচয় মিলবে সেটা হ'বে একপেশে। তাই সমস্ত সাহিত্যগুলির তুলনামূলক বিচার ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার হ'বে না তা' তাঁরা দেখতে পেলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডে রিস্ ডেভিড্‌স্ (Rhys Davids) প্রমুখ পণ্ডিতেরা একদম উল্টা পথ ধরলেন। তাঁরা সিংহল থেকে পালি পুঁথি সংগ্রহ ক'রে, পালিতে লেখা বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করলেন। তা'র ফল দাঁড়াল বিষময়, তাঁদের আলোচনা হ'ল একপেশে ও তাঁদের লেখা হ'ল যুক্তিহীন। সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিশ্বাসের ভূত ঘাড়ে চেপে বসল—তাই তাঁরা প্রায় ভিক্ষুদের কথাই ইংরাজী ভাষায় বললেন। তাঁদের মতে, ঠিক হ'ল যে, বৌদ্ধসাহিত্য প্রথম পালিভাষায় লেখা হয়, পালিভাষা কোশল ও মগধের প্রাচীন ভাষা। আর সমস্ত পালি বৌদ্ধসাহিত্য বুদ্ধের মৃত্যুর সময় থেকে অশোকের সময় পর্য্যন্ত, (৫০০—২৫০ খৃঃ পূঃ) এই তিনশ বছরের মধ্যেই রচিত। এই সব বিচারহীন কথায় আর কা'রো ক্ষতি হোক্ না হোক্, আমাদের খুবই ক্ষতি হ'য়েছে। কারণ আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা এই সব মতামত নির্ভুল মনে ক'রে ও পালি বৌদ্ধসাহিত্য খুব প্রাচীন ধ'রে নিয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন ও করছেন তা'র গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে।

যা হোক্ পালিভাষায় লেখা বৌদ্ধসাহিত্য প্রাচীন না হ'লেও বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রাচীন তা'তে সন্দেহ নেই। এই প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের রূপ সঠিক ধরতে গেলে বৌদ্ধসাহিত্যের সমস্ত দিকটা না দেখলে চলে না। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভারতের সীমান্তদেশ ব্রহ্ম, সিংহল, ও নেপালে তা'র আধিপত্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতের বাইরে শ্যাম, কম্বুজ, আনাম, চীন, জাপান, তিব্বত ও মঙ্গোলীয়দেশে তা'র প্রভাব এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাই এ সকল দেশের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম্মকে দু'টা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন—Northern ও Southern Buddhism. কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মকে এ ভাবে ভাগ করা চলে না। কারণ এরূপ ভাগ শুধু দেশ-বিভাগের উপরই স্থাপিত, কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক মতের উপর স্থাপিত নয়। যে সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্ম এখন সিংহলে চলছে তা' প্রাচীনকালে উত্তরাপথেও ছিল, আর যে ধর্ম্মমত উত্তরাপথে ছিল তা'র নিদর্শন প্রাচীন সিংহলেও পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য্যেরা তাঁদের ধর্ম্মমতকে যে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেছেন তার নাম হচ্ছে হীনযান ও মহাযান। এ বিভাগ তাঁরা ধর্ম্মের প্রসার হিসাবে করেন নি—বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্নতির পর্য্যায় হিসাবেই করেছেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণের চার-পাঁচশ বৎসর পরে তাঁর ধর্ম্মমত কয়েকজন খ্যাতনামা আচার্য্যদের হাতে এমন সমৃদ্ধ হ'লো যে তাঁরা তা'কে নূতন আখ্যায় অভিহিত করাই

যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এঁদের মতে প্রাচীনেরা বুদ্ধের ধর্ম্মমতের গূঢ় অর্থ ধরতে না পেরে নিশ্চেষ্টভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের কতকগুলি বাইরের আচার মেনে আসছিলেন। তাই তাঁরা নূতন মতের "মহাযান" এবং প্রাচীন মতের "হীনযান" আখ্যা দিলেন। বস্তুতঃ মহাযান যে বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্নতির একটা নূতন পর্য্যায় নির্দ্দেশ করে—তা'তে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলে মহাযানের উৎপত্তির সঙ্গেই যে হীনযান লুপ্ত হ'য়েছিল তা' বলা চলে না। বৌদ্ধসঙ্ঘের একাংশ বরাবরই প্রাচীন মত অবলম্বন ক'রে ছিলেন, তাই সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কম্বুজে এখনও হীনযান প্রবল রয়েছে। জাপানী বৌদ্ধেরা মহাযান অনুসরণ করলেও হীনযান গ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রে থাকেন। তা' ছাড়া যে যে দেশে মহাযান প্রবল ছিল বা এখনও আছে সেখানে ভিক্ষুর বাইরের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হীনযান বা প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে। শুধু অধ্যাত্মদৃষ্টিকে উদার করবার জন্যই মহাযান পন্থার আবশ্যক। তাই দেখা যায় যে, হীনযান ও মহাযান উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; লৌকিক ব্যবহার হিসাবেই শুধু কতকগুলি বিভাগ নির্দ্দেশ করা চলে।

যাঁরা হীনযান বা প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করতেন তাঁদের দৃষ্টি কিছু সঙ্কীর্ণ ছিল। তাঁদের মধ্যে একদল বুদ্ধ-প্রদর্শিত আচার-ব্যবহার পালন ক'রে, ধর্ম্মপথে থেকে, পুণ্য অর্জ্জন ক'রতে তৎপর হ'তেন—কিন্তু বুদ্ধত্বলাভ করবার দুরাশা পোষণ করতেন না। তাঁদের পথকে বিশেষভাবে শ্রাবক-যান বলা হ'ত। আর একদল বুদ্ধত্বলাভ করবার আশা রাখতেন বটে—কিন্তু সে শুধু নিজের জন্যই। জগতের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে তাঁরা চাইতেন না। সেই জন্য তাঁদের পথকে বিশেষভাবে প্রত্যেক-বুদ্ধযান বলা হ'ত। সুতরাং হীনযানের এই দুই পর্য্যায়ভাগ আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর হিসাবে করা হ'য়েছিল। কিন্তু ভিক্ষুর বাইরের আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি নিয়ে খুব প্রাচীনকালেই বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিতর গোলমাল বেধেছিল। তাই প্রাচীন সঙ্ঘের ভিতর অশোকের পূর্ব্বেই প্রায় আঠারোটী শাখার সৃষ্টি হ'য়েছিল? এই শাখাগুলির মধ্যে দশটী শাখা কালক্রমে প্রভাব-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ও নিজেদের এক-একটা বিপুল সাহিত্য গড়ে তোলে। এই দশটী শাখার নাম হচ্ছে—স্থবিরবাদ (পালিতে থেরবাদ), হৈমবত, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্ব্বাস্তিবাদ, মূলসর্ব্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিক ও সম্মিতীয়। এ দশটীকে আবার দু'দলে ভাগ করা চলে। প্রথম আটটীর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ খুব নিকট। মহাসাংঘিক ও তা'র উপশাখা সম্মিতীয় খুব প্রাচীনকালেই প্রথম আটটী থেকে বেশ দূরে সরে এসেছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের দর্শনদৃষ্টির সঙ্গে মহাযানের এত

গূঢ় সম্বন্ধ যে, মহাযান এঁদের থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে একথা মনে করা অসঙ্গত হ'বে না।

যাঁরা মহাযান অবলম্বন করলেন তাঁদের আদর্শ হ'ল উদার। নিজের জন্য বুদ্ধত্বলাভ করবার চেষ্টা করা বা বুদ্ধত্বলাভ করা তাঁদের কাছে তুচ্ছ মনে হ'ল। ভগবান্ বুদ্ধ যেমন সারা জগতের মঙ্গলের জন্য জন্মে জন্মে নিজেকে বলি দিয়েছিলেন, এঁরাও তাই করবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে শাক্যমুনি-গৌতম বুদ্ধত্বলাভ করবার বহু পূর্ব্ব থেকে, জন্ম জন্মান্তর ধ'রে পরোপকারে আত্মোৎসর্গ ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর সেই অবস্থাগুলিকে বোধিসত্ত্ব অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় বা বোধিমার্গে একবার আরূঢ় হ'তে পারলেই ভিক্ষু ধীরে বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। তাই মহাযান পন্থা যাঁরা অনুসরণ করলেন তাঁদের কাছে এই বোধিসত্ত্ব অবস্থাটাই কাম্য হ'ল—অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করতে পারে সেই অবস্থাটাই তাঁদের আদর্শ হ'ল। এই অবস্থাটা স্থায়ী করা দু'ভাবে সম্ভব হ'ত। মহাযানের প্রথম আচার্য্যেরা মনে করতেন যে, কতকগুলি বিশেষ "পারমিতা" বা করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি বিশেষ গুণচর্য্যা ক'রেই এ অবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। দর্শনদৃষ্টির তারতম্য-অনুসারে এঁরা দুই শাখায় বিভক্ত হ'ন—মাধ্যমিক ও যোগাচার। পরবর্ত্তী কোন কোন আচার্য্যেরা মনে করলেন যে, মন্ত্রশক্তির নিয়োগেও এই কাম্য অবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। তাঁরাও দর্শনদৃষ্টির বিভিন্নতা হিসাবে মোটামুটি তিনটী শাখায় বিভক্ত হ'লেন। এই তিনটী শাখার নাম হচ্ছে—বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। তিনটীকে সাধারণভাবে মন্ত্রযান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এইবার বৌদ্ধদের এই নানা শাখার ভিতর যে বিপুল শাস্ত্রের সৃষ্টি হ'য়েছিল তা'র কিছু পরিচয় দেব। বৌদ্ধশাস্ত্র সাধারণতঃ তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগকে তিন পিটক বা ত্রিপিটক বলা হয়। এই তিন পিটক হচ্ছে—সূত্র-পিটক, বিনয়-পিটক ও অভিধর্ম্ম-পিটক। সূত্র-পিটকে বুদ্ধ কথাচ্ছলে নানা ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেন। বিনয়-পিটকে তিনি শিষ্যদের বিনয় বা ধর্ম্মাচার শিখাচ্ছেন। আর অভিধর্ম্মে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শনের কথা আছে। এই হ'ল হীনযানের প্রধান শাস্ত্র। এ ছাড়া তিন পিটকের বাইরেও নানা বই আছে, সেগুলি বেশীর ভাগ টীকা টিপ্পনী। হীনযানের যে দশটী শাখার নাম করেছি তাদের প্রত্যেকেরই এই ত্রিপিটক ছিল। পালি ভাষায় যে ত্রিপিটক লেখা হ'য়েছিল সে হচ্ছে থেরবাদ বা স্থবিরবাদের শাস্ত্র। এগুলিকে একত্র ছাপ্‌লে প্রায় চার-পাঁচ হাজার অকটেভো পাতা ভরে যায়। এ'তে বহু বিভিন্ন সূত্র

সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। হৈমবত, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক ও কাশ্যপীয়দের ত্রিপিটক মূলতঃ কোন্ ভাষায় লেখা হ'য়েছিল তা' বলা যায় না। কারণ তাদের ত্রিপিটক শুধু চীনা অনুবাদেই পাওয়া গেছে। তবে আন্দাজ করা যায় যে, ধর্ম্মগুপ্তদের ত্রিপিটক উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় লেখা হ'য়েছিল। কারণ মধ্য এসিয়ার এই প্রাকৃতে লেখা ধর্ম্মপদের যে সংস্করণ পাওয়া গেছে—তা' তা'দেরই মনে হয়। সর্ব্বাস্তিবাদ ও মূল সর্ব্বাস্তিবাদের ত্রিপিটক যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হ'য়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই। কারণ এই দুই শাখার প্রাচীন শাস্ত্রের যে যে অংশ নেপালে পাওয়া গেছে তা' সংস্কৃতেই লেখা। তবে এঁদের সম্পূর্ণ শাস্ত্র চীনা, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় অনুবাদেই পাওয়া যায়। মহাসাংঘিক ও সম্মিতীয়দের শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে চীনা অনুবাদে রয়েছে, শুধু তা'র খণ্ডিত অংশ নেপালে পাওয়া গেছে। এঁরা যে ভাষায় লিখ্‌তেন সেটা হ'ল প্রাকৃত-বহুল সংস্কৃত ভাষা বা মিশ্র সংস্কৃত। সুতরাং হীনযানের এই দশটা সম্প্রদায়ের মধ্যে থেরবাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পালিতে আর বাকী ন'টী সম্প্রদায়ের শাস্ত্র আংশিকভাবে খণ্ডিত সংস্কৃত বা প্রাকৃত পুঁথিতে, আংশিকভাবে তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় অনুবাদে এবং সম্পূর্ণভাবে চীনা অনুবাদে পাওয়া যায়। চীনা অনুবাদে প্রায় পাঁচ হাজার বই রয়েছে।

এইবার এই বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্রের গোড়ার কথা কিছু বলা দরকার। শাস্ত্রীয় প্রবাদ যাই বলুক না কেন, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁদের মতাবলম্বী ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাই বিশ্বাস করুন না কেন, এমন কথা বলা চলে না যে এই বিপুল শাস্ত্র বুদ্ধের জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর কয়েকশ বৎসরের মধ্যেই রচিত হ'য়েছিল। বহু শতাব্দী ধ'রে এ'র রচনা চলেছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রের নানাদিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, অশোকের পূর্ব্ব বা খৃঃ পূর্ব্ব তিন শতকের পূর্ব্বে যে বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হ'য়েছিল তা'র সংখ্যা খুব বেশী নয়। ত্রিপিটক ত দূরের কথা, একটা পিটকও রচিত হয় নি। অশোকের একশ বছর পরেও 'ত্রিপিটকে'র কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় শুধু 'পিটক' কথাটা। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অধ্যয়নের সুবিধার জন্য ছোট ছোট শাস্ত্রের একত্র সন্নিবেশ করতে সুরু করেছেন, এইমাত্র বোঝা যায়। অশোক তাঁর অনুশাসনে ভিক্ষু সঙ্ঘকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বলেছেন। তাঁর সময় যদি 'ত্রিপিটক' থাকৃত তাহ'লে তারই নাম করতেন, কিন্তু তা' না করে মাত্র সাতটী সূত্রের নামোল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠ্‌বে, অশোকের পূর্ব্বে বৌদ্ধশাস্ত্রের কি রূপ ছিল, কোন ভাষায় বা তা' লেখা হ'ত। বুদ্ধ নিজে ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন

কোশল ও মগধ দেশে। তাঁর মৃত্যুর পর দু'-তিনশ বছর ধ'রে—এমন কি অশোকের সময় পর্য্যন্ত—বুদ্ধের ধর্ম্ম এই দেশের বাইরে যে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল তা' মনে করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। অশোকের চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধ নিজে ও তাঁর পরবর্ত্তীকালে, এমন কি অশোকের সময় পর্য্যন্ত, সঙ্ঘনায়কেরা কোশল-মগধের ভাষায় ধর্ম্মের আলোচনা করতেন। শাস্ত্র প্রথমতঃ সেই দেশের ভাষায় রচিত হ'ত। কোশল-মগধের ভাষা ছিল মাগধী প্রাকৃত। জৈনরাও এই প্রাকৃতেই তাঁদের শাস্ত্র লিখেছিলেন। এই ভাষার সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল "র" আর "স"-এর প্রয়োগ। সংস্কৃতে বা অন্য প্রাকৃতে যেখানে "র" ছিল, মাগধীতে সেখানে হ'ত "ল"। আর পালিতে যেখানে "স" ছিল, মাগধীতে হ'ত "শ"। অশোক তাঁর অনুশাসনে যে সাতখানি ধর্ম্মগ্রন্থের নাম করেছেন সে নামগুলি যে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লেখা তা'তে সন্দেহ নেই। এই দু'টী বিশেষত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য নিয়ম-কানুনের সাহায্যে বিচার ক'রে দেখা গেছে যে, পালি ভাষা কোশল-মগধের প্রাকৃত নয়। এ ভাষা ছিল পশ্চিম ভারতের বা খুব সম্ভবতঃ অবন্তীর কথিত ভাষার মার্জ্জিত রূপ। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে এ'র যে রূপ পাওয়া যায় সে রূপ যে অশোকের পূর্ব্বের নয় বরং পরের, এই কথা ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা জোর ক'রেই বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পালি ভাষার ভিতরও অনেক মাগধী শব্দ রয়েছে। সেরূপ শব্দ হীনযানের অন্যান্য শাখার সংস্কৃতে লেখা শাস্ত্রেও পাওয়া গেছে। হীনযানের নানা শাখার ত্রিপিটক তুলনা করলেও কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এ'তেই মনে হয় যে, অশোকের পূর্ব্বেই বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা সুরু হয়। সে রচনা হ'ত মাগধীতে বা তার মার্জ্জিত প্রতিরূপ অর্দ্ধ-মাগধীতে। আর নানা সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক তুলনা করলে যে সব সাধারণ বিষয়গুলির সন্ধান পাওয়া যায়—সেইগুলিও এই ভাষায় লেখা হ'ত—সেইগুলি ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন শাস্ত্র, তা'র আকার খুব বড় ছিল না, আর তাকে সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম প্রভৃতি পিটক-ভাগে সাজাবার দরকার হয় নি। এই প্রাচীন শাস্ত্রের এক প্রধান বই হচ্ছে ধর্ম্মপদ। ধর্ম্মপদ পালি, সংস্কৃত ও ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাচীন প্রাকৃতে পাওয়া গেছে। এবং বিভিন্ন সংস্করণগুলি তুলনা করলেই এ'র প্রাচীন অর্দ্ধ-মাগধীরূপ ধরা পড়ে।

অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের নানাস্থানে প্রসার লাভ করল। তার তখন প্রধান কেন্দ্র হ'ল, মথুরা, উজ্জয়িনী ও কাশ্মীর। পরে কাঞ্চী উজ্জয়িনীর স্থান নিয়েছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন অর্দ্ধমাগধী শাস্ত্র

মথুরা ও কাশ্মীরে সংস্কৃত ও উজ্জয়িনীতে স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় অনূদিত বা রূপান্তরিত হ'ল। সেই কারণেই এ সব অনুবাদের ভিতর এখনও অর্দ্ধমাগধী শব্দের সন্ধান মেলে। সঙ্ঘনায়কেরা শুধু প্রাচীন শাস্ত্র অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হ'লেন না—প্রাচীন শাস্ত্রের কাঠামো ও নিজেদের সাম্প্রদায়িক মত নিয়ে শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি ক'রে চল্‌লেন। তাই বৌদ্ধশাস্ত্র ক্রমশঃ বিপুল আকার নিল। তা'কে পিটকভাগে সাজাবার দরকার হ'ল। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে আরম্ভ ক'রে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্য্যেরা দলে দলে চীন দেশে গিয়ে চীনা পণ্ডিতদের সহায়তায় নানা সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে ক্রমশঃ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই সব ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যেই সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এবং দ্বাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তিব্বতী ও মাঙ্গোলীয় ভাষায়ও অনূদিত হ'ল। তাই হীনযান বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে এই সব দিক্‌টা না দেখ্‌লে চলে না। তা'র প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কিছু বল্‌তে গেলে তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া গতি নেই।

হীনযান শাস্ত্র ত্রিপিটকে বিভক্ত হ'লেও মহাযান শাস্ত্রের তা' হ'বার কথা নয়। কারণ পূর্ব্বেই ব'লেছি যে মহাযান যাঁরা অবলম্বন করলেন তাঁরা হীনযানের বিনয়-পিটকই মেনে নিলেন। কিন্তু তা' হ'লেও বোধিসত্বচর্য্যার জন্য যে সব আচার-ব্যবহার শাস্ত্রীয় বলে ধরা হ'ল তা সাধারণ ভিক্ষুর পালনীয় আচারের থেকে কিছু অন্যরূপ। বোধিসত্বমার্গ যাঁরা অবলম্বন করলেন তাঁদের বাইরের আচারের কতকগুলি খুঁটিনাটি না মানলেও চল্‌ত—কারণ তাঁদের কাছে অন্তর্দৃষ্টিরই ছিল বেশী মূল্য। এ-সব কারণেই কালক্রমে মহাযান শাস্ত্রেও এক নূতন বিনয় পিটকের সৃষ্টি হ'ল। মহাযানের প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কতকগুলি সূত্র নিয়ে গঠিত। তা'র ভিতর সব চেয়ে প্রধান হ'ল প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র। প্রজ্ঞা হ'ল মৈত্রী, করুণা প্রভৃতির মতই এক পারমিতা। বোধিসত্বমার্গে উন্নীত হ'তে হ'লে 'প্রজ্ঞা'র চর্চ্চা ছিল খুব দরকারী—কারণ, তা' বাদ দিলে বোধিজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র লেখা হ'য়েছিল সংস্কৃতে—তার পর নানাভাষায় তার অনুবাদও করা হ'য়েছিল। প্রজ্ঞাপারমিতা রচনার কাল এখনও সঠিক নির্দ্দেশ করা যায়নি। তবে মনে হয় যে, কনিষ্কের সময় বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেই এই সূত্র রচিত হ'য়েছিল। অবশ্য পরে এর কলেবর বেড়ে উঠেছিল। এই প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র অবলম্বন ক'রেই পারমিতাযান সৃষ্টি হলো ও খৃষ্টীয় প্রথম শতক কিংবা তা'র কিছু পূর্ব্বে নাগার্জ্জুন তাঁর মাধ্যমিক এবং এর কিছু পরেই মৈত্রেয়নাথ, অসঙ্গ ও বসুবন্ধু যোগাচার দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। এই সব আচার্য্যদের

লেখা কিন্তু পিটকে স্থান পেল না। প্রজ্ঞাপারমিতাকে বুদ্ধের মুখ দিয়ে শোনান হ'য়েছে—কিন্তু নাগার্জ্জুন প্রমুখ আচার্য্যদের লেখা শাস্ত্র ত' আর বুদ্ধির বাণী নয়। তাই তাদের লেখাগুলিকে "শাস্ত্র" সংজ্ঞা দিয়ে পৃথক ক'রে রাখা হ'ল,—যদিও সূত্রগ্রন্থের চেয়ে সে সব শাস্ত্র আদর কিছু কম পেল না। এই শাস্ত্রগুলিই হ'ল মহাযানের অভিধর্ম্ম। মহাযানের প্রথম সূত্রপাত হয় খুব সম্ভব অমরাবতীতে। নাগার্জ্জুন তাঁর শাস্ত্র অমরাবতী কিম্বা তার অদূরে ধান্যকটকের মহাবিহারে বসে লেখেন। কিন্তু কনিষ্কের সময় গান্ধারও মহাযানের একটা বড় কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। শোনা যায় মহাযানের সব চেয়ে বড় কবি অশ্বঘোষ তাঁর অনেক বই গান্ধারে বসেই লিখেছিলেন। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুও গান্ধারের লোক। নাগার্জ্জুনের সব চেয়ে বড় বই হ'ল প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের টীকা। এই টীকার ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠা ক'রে যান। আর যোগাচারের উপর অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর সব চেয়ে বড় বই হ'ল—সূত্রালঙ্কার এবং মহাযান বিংশতিকা ও ত্রিংশতিকা। নাগার্জ্জুনের বইয়ের মূল পাওয়া যায় নি—তা' চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে পড়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর বইগুলির সংস্কৃত মূল নেপালে পাওয়া গেছে। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু তাঁদের বই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে লিখেছিলেন মনে হয়।

এই দুই দর্শনের পুঁথিপত্র ছাড়া মহাযান শাস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি সরস কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়—সেগুলি হচ্ছে ললিতবিস্তর এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত। এ ছাড়া অশ্বঘোষের কতকগুলি ছোট ছোট বইয়েরও সন্ধান মেলে। শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতারকে কাব্যের হিসাবেই ধরা যেতে পারে। ললিতবিস্তর কা'র লেখা তা' বলা যায় না কিন্তু সে বই যে কাব্য তা'তে সন্দেহ নেই। সে কাব্য আরও ফুটে উঠেছে অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতে"। অশ্বঘোষ নিজে বুদ্ধচরিতকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছেন—সেটা যে মহাকাব্য তা' সে বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরা অস্বীকার করেন না। মহাকবি কালিদাসের কাব্যের উপর যে তার ছায়াপাত হয়েছে তা' পণ্ডিতেরা জোর গলায় বলেছেন। 'বুদ্ধচরিতে'র ভাষা সরস, ছন্দের ভিতর প্রাণ আছে, উপমার ভিতর বৈচিত্র্য আছে। আর সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে মহাকাব্যের যে যে গুণ নির্দ্দেশ করেছেন তা' সবই বুদ্ধচরিতে পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ কবিগুরু বাল্মীকির নাম করেছেন। সুতরাং রামায়ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ও তা'র থেকেই তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা' মনে করা অসঙ্গত হ'বে না। অশ্বঘোষের লেখা শারিপুত্র প্রকরণ হচ্ছে নাটক। এ নাটকের কতকগুলি খণ্ডিত অংশমাত্র জর্ম্মাণ পণ্ডিতেরা মধ্য এসিয়ায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাঁদের যত্নেই এই নাটকের কিছু পরিচয় পাওয়া

গেছে। এ নাটক বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়েই রচিত হ'য়েছিল। ভাসের নাটকের কথা বাদ দিলে এর চেয়ে প্রাচীন নাটক আর পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া কতকগুলি বৌদ্ধস্তোত্র, যেমন সর্ব্বজ্ঞমিত্রের স্রগ্ধরাস্তোত্র, বজ্রদত্তের লোকেশ্বরশতক, বা রাজা হর্ষদেবের সুপ্রভাতস্তোত্র—তাদের ভিতরও যে কাব্য রয়েছে তা' নেহাৎ খেলো নয়। স্রগ্ধরাস্তোত্র থেকে একটা নমুনা দিলেই এ-সব স্তোত্রের ভিতর যে কাব্যরস রয়েছে তা'র পরিচয় পাওয়া যাবে। যে-সব দেবকন্যারা মহাযানের দেবতাকে বরণ করতে ছুটেছিলেন কবি তাঁদেরই ছবি অাঁকছেন—

হারাক্রান্তস্তনান্তাঃ শ্রবণকুবলয়স্পর্দ্ধমানায়তাক্ষ্যো
মন্দারোদারবেণী তরুণ পরিমলামোদমাদ্যদ্ দ্বিরেফাঃ।
কাঞ্চী নাদানুবন্ধোদ্ধততর চরণোদারমঞ্জীর তূর্য্যা—
স্বন্নাথান্ প্রার্থয়ন্তে স্মরমদমুদিতাঃ সাদরা দেবকন্যাঃ।

"দেবকন্যারা তোমাকে স্বামীরূপে সাদরে আকাঙ্ক্ষা করছেন। মন্মথের পীড়াজনিত হর্ষে তাঁরা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। গলার হার এসে বক্ষের উপরে পড়েছে; তাঁদের আয়তলোচন শ্রবণকুবলয়কে হা'র মানিয়েছে। তাঁদের বেণীতে যে মন্দার ফুল রয়েছে তা'র গন্ধে ভ্রমর আকুল হ'য়ে উঠেছে। আর তা'দের পায়ের নূপুরধ্বনি দোদুল্যমান কাঞ্চির শব্দকে ডুবিয়ে দিয়েছে।"

এই কাব্যরসই আবার অন্য দিকে ভাস্কর ও চিত্রকরের হাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ-শতকের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য দেখুন—অজন্তার চিত্রকলা দেখুন—এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী দেবকন্যাদের খোঁজ সহজেই মিলবে। কিন্তু অজন্তার চিত্রকর কোথা থেকে তা'র প্রেরণা পেয়েছিল তা' স্পষ্ট বুঝ্তে গেলে পড়তে হ'বে শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার। শান্তিদেব ছিলেন বলভীর লোক—আর তিনি তাঁর বই লিখেছিলেন ষষ্ঠ শতকে। সুতরাং অজন্তার চিত্রকরেরা তাঁর কাব্য থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল তা' মনে করা অসঙ্গত হ'বে না।

এইবার মহাযানের শেষযুগের শাস্ত্র-সম্বন্ধে দু'-এক কথা ব'লেই বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় শেষ করব। পূর্ব্বেই বলেছি যে, এই যুগের একদল বৌদ্ধ আচার্য্যেরা বল্তে সুরু করলেন যে বোধিচর্য্যা মন্ত্রবলেই হ'তে পারে। এঁরা সপ্তম অষ্টম শতকেই বেশ প্রভাবসম্পন্ন হ'য়ে উঠ্লেন ও নূতন নূতন শাস্ত্র রচনা করতে লাগ্লেন। অবশ্য এঁদের দর্শনের মূল যে যোগাচারের মধ্যেই রয়েছে তা'তে সন্দেহ নেই। এঁরা যে-সব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন তা'দের শাস্ত্র নিয়ে বেশী আলোচনা হয়নি। তা' রয়েছে বেশীর ভাগ নেপালী পুঁথিতে আর তিব্বতী অনুবাদে। বজ্রযান

ও কালচক্রযানের শাস্ত্র সংস্কৃতে আর সহজযানের শাস্ত্র অপভ্রংশে লেখা হ'ল। এই অপভ্রংশ শাস্ত্রের রচয়িতারা হ'লেন সিদ্ধপুরুষ। তাঁদের ভিতর সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নুপাদ ও তিল্লোপাদের লেখা বেশী পাওয়া গেছে। এঁদের ভাষা ও প্রাচীন বাংলা ভাষার ভিতর বড় পার্থক্য নেই—তা'ই এদের লেখা বইগুলি বাংলা ভাষার আলোচনার জন্য খুব মূল্যবান। প্রাচীন ছন্দে এঁরা যে সব নূতন সুর সংযোগ করলেন তা'রই প্রভাবে প্রাচীন বাংলা ও হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠ্ল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কবীর প্রভৃতির ভিতর এই প্রাচীন সহজসিদ্ধদের লেখার ভাব ও রূপ আর-ও পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্ল।

তিল্লোপাদ যখন সমাধিস্থ হ'বার জন্য নিজের মনকে আদেশ করছেন—

জহি ইচ্ছই তহি জাউ মণ এথু ণ কিজ্জই ভত্তি।
অধ উঘাড়িঅ আলোঅণে জ্ঝানে হোইরে থিত্তি॥

["মন, তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। তোমার আর এখানে স্থান নেই। আমি অধ্যাত্মকে উদ্ঘাটন করে, এখন ধ্যানে স্থিত হ'ব ও ধ্যানদৃষ্টি লাভ করব।"]

অথবা সরহপাদ যখন সহজ সিদ্ধির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করবার জন্য বল্ছেন—

এথু সে সুরস্বরি জমুণা এথু সে গঙ্গাসাঅরু
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু।

[এই সে সুরসরিৎ মন্দাকিনী, এই সে যমুনা, আর এই সে গঙ্গাসাগর। প্রয়াগ বারাণসী, বা চন্দ্র দিবাকর ও এই।]

তখন তাঁদের ভাবের ভিতর যে ঐশ্বর্য্যের ও ভাষা আর ছন্দের ভিতর যে শক্তির খোঁজ পাই তা' ভারতের মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল। অশ্বঘোষ বুদ্ধের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন—

প্রজ্ঞাম্বুবেশাং স্থিরশীলবপ্রাং সমাধিশীতাং ব্রতচক্রবাকাং।
অস্যোত্তমাং ধর্ম্মনদীং প্রবৃত্তাং তৃষ্ণার্দিতঃ পাস্যতি জীবলোকঃ।

[তৃষিত জীবলোক এই উত্তমা ধর্ম্মনদীর জল পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। প্রজ্ঞাস্রোতে এ নদী বেগবতী, স্থির বিনয়ব্যবহারই এ নদীর তটকে দৃঢ় ও সমাধি এ'র জলকে শীতল করেছে, আর এই উত্তমা নদীর জলে ব্রতচারী চক্রবাকেরা ক্রীড়া করছে।]

বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শন, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা বহুকাল ধ'রে যে আমাদের তৃষ্ণা মেটাবে তা'তে আর সন্দেহ কি? সে রত্নকে শুধু উপযুক্ত আদরে ঘরে তুলে নিতে জানা চাই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

কাব্যের মুক্তি

কাব্য অনাদি। অনাদি-শব্দটা যদি আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে
পীড়া দেয়, তাহ'লে বলা যেতে পারে যে আদিম মানুষ যবে বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ
ধ্বনিকে বিভিন্ন বস্তু ও আবেগের সঙ্গে ছুশ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধতে পারলে, সেই
দিনই কাব্যের জন্মদিন। সে আজ অনেক হাজার বছর আগের কথা।
তার পরে মানুষের ভাষা ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগলো, এবং মানুষ দেখলে
যে, সেই বাক্যগুলোই অনায়াসে মনে থাকে, যেগুলোর মধ্যে যতির
ব্যতিক্রম ঘটে না। এই সূচনা থেকে কাব্যের পরবর্ত্তী বিকাশ কল্পনা
ক'রে নেওয়া সহজ। আস্তে আস্তে এখানে ওখানে ছু'একজন এমন লোক
নিশ্চয়ই দেখা দিতে লাগলো, যাদের উদ্ভাবনাশক্তি অন্যদের তুলনায় ক্ষিপ্র,
যাদের স্মৃতি সাধারণের চেয়ে সবল, যারা সমবেত সঙ্ঘের নীরব অনুমোদনে
ও বিরল সহযোগে শুভদিনে স্মরণীয় ঘটনাগুলো আবৃত্তি করতে সক্ষম।
অল্পে অল্পে যখন সঙ্ঘ জাতিতে পরিণত হলো, এবং দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলোকে
মানুষ বৃত্তিতে ভাগ ক'রে নিলে, তখন এই গাথাপরিচালকের অনির্দ্দিষ্ট
স্থান এলো চারণের দখলে। আধুনিক কবি সেই চারণের উত্তরাধিকারী।

কাব্যের জন্মবৃত্তান্তে আমাদের প্রয়োজন নেই। এ-সন্ধান নৃতত্ত্ব
বিদের। আমরা শুধু এইটুকু জানলেই সন্তুষ্ট যে কাব্য কবির পূর্ব্বপুরুষ
কবি কাব্যের জন্মদাতা নয়। প্রথম কবিতার আবির্ভাব হয়েছিলে
কোনো ব্যক্তি-বিশেষের মনে নয়, একটা মানবসমষ্টির মনে; প্রথম কবিতা
প্রসার শুধু একটি মানুষের উপরে নয়, সমগ্র জীবনের উপরে; প্রাথমিক
কবিতার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ নয়, সঙ্কলন। সেই দিন থেকে আরম্ভ ক'রে
আজ পর্য্যন্ত কাব্যের সেই বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি কেবল ক্ষয়ে গেছে। তার সে
নীহারিকার মতো আয়তন স্বষ্টির রীতিতে আজকে কবিরূপ উল্কাখণ্ডে
মধ্যে আবদ্ধ। ফলে অনেকে জিজ্ঞাসা করতে সুরু করেছেন, কাব্যে
বিকাশধারার কি তবে এইখানেই শেষ। আমার তাই বিশ্বাস। আমি
মনে করি, এই ধরণের একটা পর্য্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে; এর পরেও আবা
যদি কাব্যের মধ্যে একটা তীব্র জ্যোতি দেখা যায়, তবে বুঝতে হা
সে-জ্যোতি পথচ্যুত উল্কার চিতাগ্নি মাত্র।

উপরে যা বললুম, তার থেকে কেউ যেন না-ভাবেন যে এ
অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের জন্যে আমি আধুনিক কবিকে দোষী করি। সে যে
দূরের কথা, আমার মনে হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আর কখনো এ
পূজার্হরূপে দেখা দেয়নি। এতদিন ধরে স্থানে-অস্থানে সে তীক্ষ্ণ স্বরে
যে-অতিমানবতার ঘোষণা ক'রে এসেছে, এইবারে হয়তো তার প্রথম

প্রমাণ মিললো। চিরকালের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলোকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে, সভ্যতার ষ্টীমরোলার আজকে যে-জয়যাত্রায় বেরিয়েছে, তার সাংঘাতিক সংঘাতকে উপেক্ষা ক'রে একা কবি আছে সৌন্দর্য্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই, সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত, সে জানে সে একা, সে জানে যাদের জন্যে তার বিদ্রোহ, তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্দ্ধা পাগলামিরই নামান্তর মাত্র। সে বুঝেছে যে তার পরিচিত বিশ্বকে এক দৈব ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না, কিন্তু তবু তার চেষ্টায় ত্রুটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সে-গান হয়তো আনন্দের গান নয়, তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ক্ষোভে কর্কশ, কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের কোলাহলকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে একা তারি বাণী; তাই সে আমাদের নমস্য, রাহুগ্রস্ত হ'লেও সে আমাদের নমস্য।

অনেকে বলবেন, আমি একটু বাড়াবাড়ি করছি। কাব্য যদি আসলে আর্ট হয়, তাহ'লে বেষ্টনীর বৈরিতায় সে ক্ষুণ্ণ হবে না। এ-মতকে একেবারে উপেক্ষা করা অসম্ভব, কেননা মানুষের এবং তার পরিবেষ্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারে বলেই জীবনে আর্ট অত অবর্জ্জনীয়। অতএব, যদিও সামাজিক অবস্থা অনুকূল না-হ'লে আর্টের আরম্ভ হয় না, তবু পরিণামে প্রতিবেশকে ছাড়িয়ে উঠতে না-পারলে আর্ট ব্যর্থ হ'য়ে যায়। কথাগুলো যে নিতান্ত বাজে নয় তার প্রমাণ-স্বরূপ আধুনিক চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত মনে আসে। ললিত-কলার অন্যান্য বিভাগে যা-ই ঘটে থাকুক, আজকের চিত্রে এবং আজকের সঙ্গীতে বর্ত্তমান সভ্যতার বিকট বিভীষিকাগুলোও যে রূপের আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হয়নি, তা' অস্বীকার করার উপায় নেই।

এইখানে একটা কথা স্পষ্ট করতে চাই। উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে 'art for art's sake'-নামে যে-মতবাদ নিয়ে দিন-কতক খুব সোরগোল উঠেছিলো, তার সঙ্গে উপরের অভিমতটির কোনোই সংস্রব নেই; ওটি বরং Wilde ও তার বিদগ্ধ বন্ধুদের অমূলক দম্ভের প্রতিবাদ। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের আর যা-ই লোকসান হ'য়ে থাকুক, অভিজ্ঞতার মূলধন সুদে বেড়েছে। অজস্র সঙ্ঘর্ষের ফলে আমরা আজ শিখেছি যে, সত্য স্বাতন্ত্র্য সংসারে মেলা তো দূরের কথা, ব্রহ্মাণ্ডের নিভৃততম কোণে সুদ্ধ তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। এবং যেহেতু আর্ট স্বষ্টিছাড়া নয়, স্বষ্টির অঙ্গ মাত্র, তাই আর্টিষ্টের উৎকর্ষ মাপবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সামগ্রিক জীবনের কষ্টিপাথরে তার যোগ্যতা কষে দেখা। এ-কথা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, কবি মাত্রেই কালের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে, এর থেকে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, জগতের আকর্ষণকে যে-

কবিতা এড়িয়ে চলেছে তাতে শিকড়ের 'অভাব'; সে-কবিতা মামির মতো পিরামিডের আওতায় হয়তো বা মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে মানুষের কৌতূহলই কেবল মেটে, আত্মার অব্যক্ত জিজ্ঞাসা তার কাছে কোনো সদুত্তর পায় না।

এই মাপকাটি দিয়ে পরখ করলে সাহিত্যের অনেক সমস্যা সরল হ'য়ে আসে। মহাকবির সমস্ত গুণ সমন্বয় ক'রেও Tennyson কেন মহাকাব্য রচনায় ব্যর্থকাম হয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যা হয়তো এইখানে। কবির কাজ হচ্ছে তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতাগুলোকে একটা পরম উপলব্ধিতে গ্রথিত ক'রে নেওয়া, কবির কাজ হচ্ছে তার চারপাশের খণ্ড খণ্ড জীবনগুলোকে একত্র ক'রে আবহমান জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, কবির কাজ হচ্ছে তার যুগের স্বকীয় চৈতন্যকে শুদ্ধ-চৈতন্যের অন্তর্গত করা। বৈরাগ্যসাধনের দ্বারায় এই মহাব্রতে সিদ্ধি মিলে না, কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে। কবিকে যদি মহাকালের পদ নিতে হয়, তাহ'লে তাকে শুচিবায়ু ছাড়তে হবে, তাহ'লে তাকে ভিক্ষার পাত্রখানি হাতে নিয়ে, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিচারে, দুয়ারে দুয়ারে ফিরতে হবে উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশিষ্ট আহরণ ক'রে। কাব্যের পথে উল্লঙ্ঘন চলে না, তার প্রত্যেক খানাটি পার হ'তে হয় হেঁটে, তার প্রত্যেক ধূলি-কণাকে চলতে হয় মাড়িয়ে, তার প্রত্যেক কাঁটার পিপাসা নিবারণ করতে হয় রক্ত দিয়ে। এখানে পলায়নের উপায় নেই, বিরতি চাওয়া মানেই মৃত্যুকে ডেকে আনা, এখানে বিমুখ হ'লে অনুগামীর পদাঘাত অনিবার্য্য। এ-কথা মানতে যাঁরা কুণ্ঠিত হবেন, তাঁরা যেন ঊনবিংশ শতকের শেষের কাব্যের দুর্দ্দশার ইতিহাস স্মরণ ক'রে দেখেন। Cezanne যখন চূণকাম করা খানিকটা সাদা প্রাচীরের মধ্যে সনাতন সৌন্দর্য্যকে প্রত্যক্ষ করছিলেন, তখন কুঞ্জে কুঞ্জে বাষ্পাকুল চোখে Swinburne ফিরছিলেন বনলক্ষ্মীদের সন্ধানে, অতিমর্ত্ত্য বা আধিদৈবিক আর্টের অন্তিম রিক্ততার অকাট্য সাক্ষ্য এইখানেই।

Tennyson ও Swinburne-এর বিরাট কারবারের দরজায় হঠাৎ লালবাতি জ্বলার ফলেই বোধ হয় সেদিনকার কবিমহলে হিসেব দেখার অত ধুম পড়ে গিয়েছিলো। তখন তাদের বুঝতে বেশী কষ্ট লাগেনি যে বনেদি চাল বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টাতেই অভিমানী কাব্য দেউলে হয়েছে। হিসেবনবিশেরা অনায়াসেই প্রমাণ করেছিলো যে, সারা উনবিংশ শতাব্দীতে এক গোড়ার দিকের তিন-চারজনকে বাদ দিলে, সকলে কেবল খরচ করে গেছে, মুহূর্ত্তের জন্যেও জমার কথা ভাবেনি; কারুর খেয়াল হয়নি যে, বিষয় যত বড়ই হোক, বংশবৃদ্ধি ও কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী বাড়ানোর ব্যবস্থা না-করলে, সোনার খনিও অবশেষে গজভুক্ত কপিত্থের

দশা পাবে। সেই জন্যেই বিংশ শতকের সুরুতেই দেখা গেলো যে পূর্ব্ব-পুরুষের অনন্ত শোষণের ফলে, কাব্যের কলেবর থেকে অর্থের ও আবেগের মজ্জাটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে, পড়ে আছে শুধু কঙ্কাল, প্রতিধ্বনিপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে পড়ে আছে শুধু দীর্ণ জীর্ণ বৈশিষ্ট্যবিহীন কঙ্কাল।

What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief
And the dry stone no sound of water . . . .
Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water . . . .
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From door of mudcracked houses
If there were water
And no rock
If there were rock
And also water
And water
A spring
A pool among the rock
If there were the sound of water only
Not the cicada
And dry grass singing
But sound of water over a rock
Where the hermit thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water.

(T. S. ELIOT.)

উপরের পঙ্‌ক্তি কটা উনবিংশ শতাব্দীর যথাযথ বর্ণনা, এ-কথা অনেকেই মানতে চাইবেন না। Browning-এর নাম নিয়ে, জানি, তাঁরা বলবেন—অন্তত এই কবি-উদ্ধৃত বিবরণের মধ্যে খাপ খায় না। গত শতাব্দীর কাব্যমরুতে Browning শুধু রোমন্থন করেননি, সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, তা সহস্রবার স্বীকার্য্য। Wordsworth এবং Coleridge ছাড়া একমাত্র Browning-ই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কাব্যকে বাঁচতে হ'লে, ধ্বংসাবশিষ্ট পৈতৃক প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসে রূপকথার রাজপুত্তুরের স্বপ্ন দেখা তার চলবে না, তাকে বেরিয়ে আসতে হবে; পোকায়-খাওয়া শিরোপা, মরচে-পড়া সাঁজোয়া, রজ্জুসার জয়মাল্য ফেলে দিয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটের মাঝে, যেখানে পাপপুণ্য, ভালো-

মন্দ, দেবদানব জীবনকে সঙ্কর করে তুলেছে।' তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে শুধু Browning-ই অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, নটরাজের নৃত্যের তাল সব সময়ে শ্রবণসুভগ নয়, সৃষ্টির সুরে আসন্ন-প্রসবার আর্ত্তনাদও মাঝে মাঝে স্থান পায়; শুধু তিনিই বুঝেছিলেন যে, সিদ্ধ-সমৃদ্ধদের অসহযোগে জীবনের মিছিলে হয়তো আড়ম্বরের অভাব ঘটে, কিন্তু নিঃস্ব-লাঞ্ছিতদের অপাঙ্‌ক্তেয় করলে সে-শোভাযাত্রা পরিণত হয় শবযাত্রায়।

সেইজন্যেই Browning সর্ব্ব প্রথমে কাব্যকে যুগরূপের ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু কেবল চেষ্টাই করেছিলেন, সফল হননি। যদি এই মহৎ বৈফল্যের কারণ খোঁজা যায়, তাহ'লে Browning-এর কাব্যের দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হবে, প্রথমত দুটো-একটা বিরল দৃষ্টান্ত ছাড়া Browning-এর সকল নায়ক-নায়িকাকেই জগতে আসার জন্যে বৈতরণীতে খেয়া দিতে হয়েছিলো; দ্বিতীয়ত তিনি যত পতিতের তরফে ওকালতি করেছেন, তাদের সকলেরই পদস্খলন ঘটেছিলো অনিচ্ছায়, দৈবদুর্ব্বিপাকে। এর প্রথমটা পরিগ্রহণ নয়, পলায়ন, এবং দ্বিতীয়টা অন্তর্দৃষ্টি নয়, অভিনয়, সেই ধরণের অহঙ্কৃত অভিনয়, যার সাহায্যে ধর্ম্মধ্বজ উকিল অপরাধীর পক্ষ নিয়ে কাজির উপরে ভোজবাজি প্রয়োগ করে। কথাগুলো যদি রূঢ় লাগে, তবে বলা যেতে পারে যে Browning ক্রীষ্টান, ক্রাইষ্ট নন, কাজেই তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, ভ্রষ্টের দল ইহলোকে ধার্ম্মিকের পাশে না বসতে পারলেও, পরলোকে করুণাময়ের কৃপাকটাক্ষে বঞ্চিত হবে না; জীবনের ভগ্ন বৃত্ত পরিপূর্ণ হবে মরণে, এবং ইতিমধ্যে অভ্যস্ত জগতের অনন্ত তীর্থযাত্রা কোথাও বাধা পাবে না, বরং তার নিরুদ্বিগ্ন পুরঃসরণে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল স্পষ্ট হ'য়ে অবিশ্বাসীর অলস প্রশ্ন-গুলোকে দেবে নীরব ক'রে। এই দুর্দ্দান্ত শুভবাদের পায়ে যাঁরা মাথা নোয়াতে পারেন তাঁদের কাছে আমার শুধু এইটুকু নিবেদন যে, এই মঙ্গলময় জগতে রুচিবিকার না থাকলে আমারো স্থান হতো না। এই ধরণের অত্যন্তীন মনোভাবের চেয়ে এমন-কি ইন্দ্রিয়পরায়ণ Yellow Book-এর অসুস্থ কলুষপ্রীতিও আমার চোখে বেশী স্বাভাবিক।

এই শূন্যগর্ভ অতিবাদের মাঝখানে বিংশ শতাব্দীর উন্মেষ হলো। ফলে প্রত্যেক সাত্ত্বিক কবিই অনুভব করলেন যে, এ-ফাঁকির মধ্যে সত্যের শৃঙ্খলা আনতে হ'লে, ভদ্রাসনের মায়া করা চলবে না, সেই অন্তঃসারশূন্য বস্তু-মাত্রার আমূল উচ্ছেদ চাই। শুধু ইমারৎ গড়ায় কোনোই সার্থকতা নেই, সে ইমারৎকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী করতে হবে; আকাশের আলো তার ভিজে দেওয়ালে বাধা পাবে না, বিশ্বের বাতাস ফিরে যাবে না কেবল তার অর্গলিত দ্বারের শিকল নেড়ে। এর জন্যে একটা নগণ্য বাহ্য

সৌন্দর্য্যের দিকে নজর রেখে ইটের পর ইট সাজিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, এর ভিতরে যারা বাস করবে তাদের ভুললে চলবে না, ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্তে-মাংসে-গড়া দুঃখ-আনন্দের দাস, পরিবর্ত্তনশীল, বর্দ্ধিষ্ণু। তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্যকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে তাই স্বীকার, তাতে যদি নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় আখ্যা-গুলো কুড়ুতে হয়, তবে তাও বরণীয়। প্রথম দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, দ্বিতীয় দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, তৃতীয় দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, শেষের দফায় দরকার অকৃত্রিমতা। বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্রই হচ্ছে অকৃত্রিমতা—integrity।

অকৃত্রিম-বিশেষণটাকে আজ আমরা সন্দেহের চক্ষে দেখি। তার কারণ, ওই মহাবাক্যের আড়াল থেকে এ-জগতে যত প্রবঞ্চনার আমদানি হয়েছে, অন্য কোথাও থেকে তার সিকির সিকিও হয়নি। কিন্তু তাহ'লেও আজকের দিনে ও-শব্দটি একেবারেই অপরিহার্য্য। সাহিত্যে অকৃত্রিমতার মানে, প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার পরিণয়। এই কথাটাকেই আরো সহজ ক'রে বলা যেতে পারে যে, কবি যখন কোনো দৃষ্ট বস্তু বা অনুভূত ভাবের বর্ণনা করবে, তখন তার কবিতা শুধু সেই বস্তু বা সেই মনোভাবের আধারেই আবদ্ধ থাকবে, লোকাচার হিসেবে তাদের দাম জানতে চাইবে না।

এইখানে অনেকে, হয়তো, আপত্তি তুলবেন যে, কবি যদি লোকাচারকেই বাদ দিলে, তবে জগৎকে কোলে নেওয়ার গর্ব্ব সে রাখে কি করে? তার উত্তরে আমি বলবো, লোকাচার আর জগৎ সমার্থক নয়। ভারতের দণ্ডবিধিকে অস্বীকার ক'রেও যদি ভারতকে আপন বলে ভাবা চলে, তাহ'লে লোকাচারকে উপেক্ষা করলেই জগৎকে অবজ্ঞা করা হয় না। ভারতশাসক যেমন ভারতবর্ষের আসল সত্তার প্রতিনিধি নয়, তেমনি একটা সামান্য জনসংখ্যার ব্যবহারিক পক্ষপাতগুলো মহামানবের প্রতিকৃতি হ'তে পারে না। কবি যদি বলে, আমি মৃত্যুকে মানবো না, তবে জগতে তার স্থান নেই; কিন্তু নারীর সতীত্বে যদি তার আস্থা না থাকে, তাহ'লে জীবনকে তো সে প্রত্যাখ্যান করলেই না, বরং জীবনের অন্তরতম লোকে প্রবেশের পথ সহজ ক'রে দিলে। কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে মৃত্যুকে অবহেলা ক'রে সে জীবনের মূলতত্ত্বকে অপমান করছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সমাজে নিঃসার মানবদেহের অসঙ্গত গুরুত্বকে অস্বীকার ক'রে, সে দেখাচ্ছে, মানুষের অনুপাতে জীবন কত বিরাট।

কাব্যে অকপটতায় এই ব্যাখ্যা যাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক বলে বোধ হবে, তাঁরা যেন ভুলে না-যান যে একটা আধ্যাত্মিক পটভূমিকা না-পেলে,

মন্দ, দেবদানব জীবনকে সঙ্কর করে তুলেছে।' তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে শুধু Browning-ই অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, নটরাজের নৃত্যের তাল সব সময়ে শ্রবণসুভগ নয়, সৃষ্টির সুরে আসন্ন-প্রসবার আর্ত্তনাদও মাঝে মাঝে স্থান পায়; শুধু তিনিই বুঝেছিলেন যে, সিদ্ধ-সমৃদ্ধদের অসহযোগে জীবনের মিছিলে হয়তো আড়ম্বরের অভাব ঘটে, কিন্তু নিঃস্ব-লাঞ্ছিতদের অপাঙ্‌ক্তেয় করলে সে-শোভাযাত্রা পরিণত হয় শবযাত্রায়।

সেইজন্যেই Browning সর্ব্ব প্রথমে কাব্যকে যুগরূপের ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু কেবল চেষ্টাই করেছিলেন, সফল হননি। যদি এই মহৎ বৈফল্যের কারণ খোঁজা যায়, তাহ'লে Browning-এর কাব্যের ছটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হবে, প্রথমত ছটো-একটা বিরল দৃষ্টান্ত ছাড়া Browning-এর সকল নায়ক-নায়িকাকেই জগতে আসার জন্যে বৈতরণীতে খেয়া দিতে হয়েছিলো; দ্বিতীয়ত তিনি যত পতিতের তরফে ওকালতি করেছেন, তাদের সকলেরই পদস্খলন ঘটেছিলো অনিচ্ছায়, দৈবছুর্ব্বিপাকে। এর প্রথমটা পরিগ্রহণ নয়, পলায়ন, এবং দ্বিতীয়টা অন্তর্দৃষ্টি নয়, অভিনয়, সেই ধরণের অহঙ্কৃত অভিনয়, যার সাহায্যে ধর্ম্মধ্বজ উকিল অপরাধীর পক্ষ নিয়ে কাজির উপরে ভোজবাজি প্রয়োগ করে। কথাগুলো যদি রূঢ় লাগে, তবে বলা যেতে পারে যে Browning ক্রীষ্টান, ক্রাইষ্ট নন, কাজেই তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, ভ্রষ্টের দল ইহলোকে ধার্ম্মিকের পাশে না বসতে পারলেও, পরলোকে করুণাময়ের কৃপাকটাক্ষে বঞ্চিত হবে না; জীবনের ভগ্ন বৃত্ত পরিপূর্ণ হবে মরণে, এবং ইতিমধ্যে অভ্যস্ত জগতের অনন্ত তীর্থযাত্রা কোথাও বাধা পাবে না, বরং তার নিরুদ্বিগ্ন পুরঃসরণে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল স্পষ্ট হ'য়ে অবিশ্বাসীর অলস প্রশ্নগুলোকে দেবে নীরব ক'রে। এই ছুর্দ্দান্ত শুভবাদের পায়ে যাঁরা মাথা নোয়াতে পারেন তাঁদের কাছে আমার শুধু এইটুকু নিবেদন যে, এই মঙ্গলময় জগতে রুচিবিকার না থাকলে আমারো স্থান হতো না। এই ধরণের অত্যন্তীন মনোভাবের চেয়ে এমন-কি ইন্দ্রিয়পরায়ণ Yellow Book-এর অসুস্থ কলুষপ্রীতিও আমার চোখে বেশী স্বাভাবিক।

এই শূন্যগর্ভ অতিবাদের মাঝখানে বিংশ শতাব্দীর উন্মেষ হলো। ফলে প্রত্যেক সাত্ত্বিক কবিই অনুভব করলেন যে, এ-ফাঁকির মধ্যে সত্যের শৃঙ্খলা আনতে হ'লে, ভদ্রাসনের মায়া করা চলবে না, সেই অন্তঃসারশূন্য বস্তুমাত্রার আমূল উচ্ছেদ চাই। শুধু ইমারৎ গড়ায় কোনোই সার্থকতা নেই, সে ইমারৎকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী করতে হবে; আকাশের আলো তার ভিজে দেওয়ালে বাধা পাবে না, বিশ্বের বাতাস ফিরে যাবে না কেবল তার অর্গলিত দ্বারের শিকল নেড়ে। এর জন্যে একটা নগণ্য বাহ্য

সৌন্দর্য্যের দিকে নজর রেখে ইটের পর ইট সাজিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, এর ভিতরে যারা বাস করবে তাদের ভুললে চলবে না, ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্তে-মাংসে-গড়া ছুঃখ-আনন্দের দাস, পরিবর্ত্তনশীল, বর্দ্ধিষ্ণু। তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্যকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে তাই স্বীকার, তাতে যদি নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় আখ্যাগুলো কুড়ুতে হয়, তবে তাও বরণীয়। প্রথম দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, দ্বিতীয় দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, তৃতীয় দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, শেষের দফায় দরকার অকৃত্রিমতা। বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্রই হচ্ছে অকৃত্রিমতা—integrity।

অকৃত্রিম-বিশেষণটাকে আজ আমরা সন্দেহের চক্ষে দেখি। তার কারণ, ওই মহাবাক্যের আড়াল থেকে এ-জগতে যত প্রবঞ্চনার আমদানি হয়েছে, অন্য কোথাও থেকে তার সিকির সিকিও হয়নি। কিন্তু তাহ'লেও আজকের দিনে ও-শব্দটি একেবারেই অপরিহার্য্য। সাহিত্যে অকৃত্রিমতার মানে, প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার পরিণয়। এই কথাটাকেই আরো সহজ ক'রে বলা যেতে পারে যে, কবি যখন কোনো দৃষ্ট বস্তু বা অনুভূত ভাবের বর্ণনা করবে, তখন তার কবিতা শুধু সেই বস্তু বা সেই মনোভাবের আধারেই আবদ্ধ থাকবে, লোকাচার হিসেবে তাদের দাম জানতে চাইবে না।

এইখানে অনেকে, হয়তো, আপত্তি তুলবেন যে, কবি যদি লোকাচারকেই বাদ দিলে, তবে জগৎকে কোলে নেওয়ার গর্ব্ব সে রাখে কি করে? তার উত্তরে আমি বলবো, লোকাচার আর জগৎ সমার্থক নয়। ভারতের দণ্ডবিধিকে অস্বীকার ক'রেও যদি ভারতকে আপন বলে ভাবা চলে, তাহ'লে লোকাচারকে উপেক্ষা করলেই জগৎকে অবজ্ঞা করা হয় না। ভারতশাসক যেমন ভারতবর্ষের আসল সত্তার প্রতিনিধি নয়, তেমনি একটা সামান্য জনসংখ্যার ব্যবহারিক পক্ষপাতগুলো মহামানবের প্রতিকৃতি হ'তে পারে না। কবি যদি বলে, আমি মৃত্যুকে মানবো না, তবে জগতে তার স্থান নেই; কিন্তু নারীর সতীত্বে যদি তার আস্থা না থাকে, তাহ'লে জীবনকে তো সে প্রত্যাখ্যান করলেই না, বরং জীবনের অন্তরতম লোকে প্রবেশের পথ সহজ ক'রে দিলে। কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে মৃত্যুকে অবহেলা ক'রে সে জীবনের মূলতত্ত্বকে অপমান করছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সমাজে নিঃসার মানবদেহের অসঙ্গত গুরুত্বকে অস্বীকার ক'রে, সে দেখাচ্ছে, মানুষের অনুপাতে জীবন কত বিরাট।

কাব্যে অকপটতায় এই ব্যাখ্যা যাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক বলে বোধ হবে, তাঁরা যেন ভুলে না-যান যে একটা আধ্যাত্মিক পটভূমিকা না-পেলে,

কবি তো কবি, খুব স্থূল অনুভূতির মানুষের পক্ষেও বাঁচা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যদি আসলে কোনো মাঙ্গলিক নিয়ম না-ই থাকে তবুও কবিকে একটা এমন কাল্পনিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আমাদের নিত্তনৈমিত্তিক নিরর্থ অভিজ্ঞতাগুলো ন্যায়ের সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে উঠতে পারে। চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, এবং নির্ণয়, পাণ্ডিত্যশূন্য নির্ণয়, এইদুটি দুর্লভ গুণের সাহায্য-ব্যতিরেকে আমাদের পারিপার্শ্বিক নাস্তির মধ্যে কোনো রকমের শৃঙ্খলা আনা অসম্ভব। কিন্তু এ-কথা ভাবলে খুবই অন্যায় হবে যে, ওই দুটি ধ্রুবতারায় কেবল কবিরই দরকার, কেবল কবিরই দাবি চলে। অন্ধকার যেখানে ঘনিয়ে ওঠে, সেখানেই ওই আলোকস্তম্ভের প্রয়োজন হয়, নিরুদ্দিষ্ট চক্রচরণে যার রুচি নেই, গন্তব্যে পৌঁছনোই যার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, সে-ই এই নিয়ামকদের স্মরণ করে। তবে কবির সম্মান এইটুকু, তার সার্থকতা এইখানে যে, মানুষের এই অনন্ত সন্ধিৎসা তার কণ্ঠে ভাষা পায়। এবং এইখানেই তার বৈশিষ্ট্যের শেষ। সে যদি তার স্বসম্বেদ্য অন্বেষণে আর এই সার্ব্বিক অন্বেষণে সমীকরণ করতে না পারে, তাহ'লে তার কাব্য শুধু গ্রন্থাগারের উচ্চতম শেলফের স্বর্গেই অমরত্ব লাভ করবে। এই অর্থেই বোধ হয় Forster সকল মহৎ আর্টকে অনাত্ম বলেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনোই মূল্য থাকেনা, সে-অভিজ্ঞতা যদি সময়রূপ চতুর্থ আয়তনের সাহায্যে শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলতে না-পারে। এর থেকে বোঝা যাবে, কবির পক্ষে প্রত্যাখ্যান কেন অসম্ভব, কালসংজ্ঞা কেন অত্যাবশ্যক। কথাগুলো বোধ হয় একটা উপমার দ্বারায় সুবোধ্য হবে।

কবি ঘটকের মতো, পাত্র এবং পাত্রীর মিলন ঘটলেই তার প্রয়োজনীয়তার শেষ হয়; তার পরে তার নাম কারো স্মরণে রইলো বা না-রইলো, সে একটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। কিন্তু এ-মিলনকে সিদ্ধ করার জন্যে অসাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা চাই, এমন-কি খানিকটা স্বজ্ঞাও হয়তো ফেলা যায় না। শুধু জগতের প্রত্যেক পাত্রপাত্রীর নাম মনে রাখাই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সকলের সঙ্গেই তার একটা অনুকম্পন থাকা চাই, যার ফলে সে দেখা-মাত্রই বলতে পারে, কে কার যোগ্য। এই কাজে তার নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের স্থান নেই। এমন-কি কোনো রকমের পক্ষপাত পোষণ করার অধিকারেও সে বঞ্চিত। রুচির মর্জ্জি মানতে গিয়ে, সে যদি কোনো কুরূপাকে পার করার সুযোগটি হেলায় হারায়, তাহ'লে বুঝতে হবে ব্যবসা থেকে অবসর নেবার দিন তার ঘনিয়ে এসেছে। অপর পক্ষে ঘটকজীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে গার্হস্থ্য-জীবনে চালানোর চেষ্টাও নিষ্ফল হ'তে বাধ্য। তাকে নিজেকে নিরপেক্ষ

নিরালম্ব থাকতে হবে, অথচ তার পরিচালনায় যে পরিণয়গুলো ঘটবে সেগুলো যদি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না-হয়, তাহ'লে বিবাহ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের ধারণা বিকৃত হ'য়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এই রকমের কোনো-একটা আদর্শ সামনে রেখেই Eliot কবিকে catalytic agent-উপাধি দিয়েছেন।

আর্টে ব্যক্তিবাদ চলে না, এ-কথা শুনে হয়তো অনেকেই আঁৎকে উঠবেন। মুখে কিছু না বললেও, তাঁদের মন হাহতোস্মি ক'রে বলবে,—আজকের দিনে সভ্যতার যাঁতাকলে মানুষমাত্রেই ধূলো হ'য়ে পথে পথে উড়ে বেড়াচ্ছে; এক কবি ছিলো একটু পৃথক, এক কবি ছিলো মানুষের অন্তর্হিত বৈচিত্র্যের স্মৃতি জাগিয়ে দিতে। এবারে এসেছে তার পালা; মানুষ বনস্পতিকে ছাঁটাই-কলে ফেলে দিয়াশলাই করার একমাত্র অন্তরায় এইবারে বিলুপ্ত হলো। আসলে কিন্তু ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। মানুষ যখন বিশ্বমানবের মধ্যে নিজেকে বিলীন ক'রে দিতে পারে, তখনই তার পিঞ্জরিত ব্যক্তিস্বরূপ মুক্তি পায়, এ-সত্য আমরা ইতিহাসে বারবার দেখেছি। এখনো, এই ঐতিহ্যবিপ্লবের যুগেও বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অফ্ এসিসাই কেবল নাম মাত্র নন, শুধু নিরর্থ, নিষ্ক্রিয় নাম মাত্র নন। কেউ যেন না-ভাবেন যে, আমি কবির সামনে ধর্ম্মের আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে চাই। যে তিনজনকে উপরে স্মরণ করেছি, তাঁদের ধার্ম্মিক ব'লে স্মরণ করিনি, স্মরণ করেছি মহাপ্রাণ ব'লে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, মহাপ্রাণতা যেমন খণ্ড-প্রাণকে বিসর্জ্জন না-দিলে পাওয়া যায় না, তেমনি মহৎ কাব্যের আরম্ভ সেইখানে, যেখানে ব্যক্তিগত দুঃখসুখের শেষ। কিন্তু এ-কথার মানে নয় যে, কবিতে কবিতে প্রভেদ থাকবে না। মহাপ্রাণ হ'লেও বুদ্ধ আর ক্রাইষ্ট এক নন, মহাকবি হ'য়েও শেক্সপীয়র ও গয়টে বিভিন্ন। এই বাহ্য অসঙ্গতির মধ্যে একটা উপমারি সাহায্যে হয়তো সামঞ্জস্য আনা যাবে।

কাব্য সমুদ্রের মতো এবং কবি নদী মাত্র। সে যদি ইচ্ছা করে, তাহ'লে পথের মাঝে মরুভূমিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে; কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে আত্মনিমজ্জন করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তবে একটা বিশেষ দিকে প্রবাহিত হ'তে সে বাধ্য। তার সঙ্গে অন্য নদীর সাদৃশ্য এই দিক্ নির্দ্ধারণে; কিন্তু গভীরতায়, বেগে, রাসায়নিক উপকরণে স্বকীয় সত্তাকে স্বতন্ত্র রাখবার সুযোগ ও অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। অপর পক্ষে, কাব্যসমুদ্রের কথা যদি ভেবে দেখা যায়, তাহ'লে বোঝা যাবে যে সেখানেও বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। তার কোনো উপকূল পর্ব্বতবহুল, কোনো স্থান বা পঙ্কিল; তার কোনো অংশ হয়তো তরঙ্গায়িত, কোথাও বা মসৃণতা

বিরাজমান। এমন কি তার আকারও চিরকালের জন্যে নির্দ্দিষ্ট নয়। তার তলে তলে মানবচৈতন্য নিত্যকাল ধরে বহুযুগ ভ্রমণ ক'রে চলেছে, ফলে তার সীমা কখনো যাচ্ছে বেড়ে আবার কখনো আসছে কমে। শুধু তাই নয়, তার আস্বাদনে সুদ্ধ অল্পবিস্তর তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা নির্ব্বিকার গুণ তার সর্ব্বত্রই পাওয়া চাই। যতদিন পর্য্যন্ত কাব্যের এই সনাতন লক্ষণটার নামকরণ না-হয়, ততদিন একে লাবণ্য বললে বোধ হয় ক্ষতি হবে না। কিন্তু এই লাবণ্য একা সমুদ্রেরই সম্পত্তি নয়, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই এটাকে বিবিধ মাত্রায় মিলে। কাব্যের সঙ্গে বিশ্বের যোগ এইখানে।

উনবিংশ শতাব্দীর উগ্র ব্যক্তিবাদের উত্তর রাগে যাঁদের মন এখনো মুগ্ধ, তাঁরা হয়তো আধুনিক কাব্যের অবচ্ছিন্নতাকে সহজে হজম করতে পারবেন না। কাব্যকে এই রকম স্বায়ত্তশাসনে অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি সম্ভবত এই আকার ধরবে যে তাহ'লে সাহিত্যে আর স্বরগ্রাম থাকবে না, শোনা যাবে শুধু একটা বীভৎস চীৎকার। এই তর্কের সাহায্যে আধুনিক কাব্যের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাই যদি তাঁদের অভিপ্রায় হয়, তবে আমার জবাব দেওয়ার কিছুই নেই। এটা হলো রুচির খেয়াল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে আর যাই থাকুক, ব্যক্তিত্বের ছড়াছড়ি ছিলো না, এই সত্যটার সাক্ষিস্বরূপ বাল্যজীবনের অধ্যাপকীয় অনুশাসনগুলো স্মরণ করাই যথেষ্ট। পরবর্ত্তী কবিদের উপরে Wordsworth-এর প্রভাব প্রমাণ করার জন্যে পরীক্ষার্থীদের এখনো "উপযোগী পঙ্‌ক্তি" উদ্ধৃত করে দিতে হয় কিনা জানি না, তবে আমাদের সময়ে হতো; এবং সেই দুর্লভ স্মরণ-শক্তির কণামাত্রও আজ অবশিষ্ট থাকলে সহজেই নমুনার সাহায্যে দেখাতে পারতুম, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কবিতা কতদূর বৈশিষ্ট্যবিহীন হ'য়ে পড়েছিলো। তখনকার কাব্যের দরজা কখনো বন্ধ হতো না, এবং দ্বারীরূপ কবির উপরে গৃহস্বামীরূপ পাঠকের শুধু এইটুকু আজ্ঞা ছিলো যে, প্রবেশপ্রার্থীর বসনে-ভূষণে যেন শ্লীলতার ব্যতিক্রম না-ঘটে। এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে যে, অবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতালক্ষ্মী প্রাকৃত পুষ্পাভরণ ছেড়ে, কতকগুলো মজবুৎ সোনার গহনার আমদানী করেছিলেন, যার নির্ব্বিশেষ আড়ম্বরের আড়ালে আপনার আসন্ন বার্দ্ধক্যকে না-ঢেকে, তিনি কোনো কবির অভিসারেই বেরুতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাব্যের ভাষাকে আর চলতি ভাষাকে এক ব'লে Wordsworth এই মণ্ডিত সর্ব্ববল্লভার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্র ধরেন। সেই জন্যেই তিনি আমাদের পূজ্য, সেই জন্যেই সাহিত্যের স্মৃতিস্তম্ভে তাঁর নাম অত গভীর অক্ষরে খোদা রয়েছে।

গদ্য-পদ্যকে এক করার চেষ্টায় Wordsworth কৃতকার্য্য হননি, কারণ কথ্য ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধ মতেই বিভিন্ন। এই প্রভেদ গদ্যের ও পদ্যের স্বভাবগত। গদ্যের কারবার বিজ্ঞানকে নিয়ে, কাব্যের অন্বেষণ প্রজ্ঞানকে। তাই গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে, কিন্তু কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে; গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি, কিন্তু কাব্য দাবি করে আমাদের নিষ্ঠা; রেখার পরে রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে-ছবিকে গড়ে তোলে, গোটাকয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের জাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে দেয় আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমী ব্রত সিদ্ধ হয় প্রতীকের সাহায্যে। শব্দ-মাত্রেরই দুটো দিক্ আছে, একটা তার অর্থের দিক্, অন্যটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক্। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিক্‌টার খাতিরে, গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণটার লোভে, কাব্যের শব্দ আবেগবাহী। এর থেকে বোঝা যাবে, কাব্য অভিজাত সহানুভূতিকে ছেড়ে, অন্ত্যজ দরদকে কেন কোল দিয়েছে; এর থেকে বোঝা যাবে অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত না হ'য়েও নীচের নমুনাগুলি কাব্যহিসেবে কেন স্মরণীয়, এতই স্মরণীয় যে আমার মতো অলসমনা লোকের পক্ষেও এগুলোকে মনে রাখা অসম্ভব হয়নি:

........................Immemorial elms
And murmur of innumerable bees.

(TENNYSON.)

পথে হলো দেরি, ঝরে গেলো চেরি,
দিন গেলো বৃথা, প্রিয়া;
তবুও তোমার ক্ষমাহাসি বহি
দেখা দিলো আজেলিয়া॥

(রবীন্দ্রনাথ)

As cool as the wet leaves of the lily-of-the-valley
She lay beside me in the dawn.

(EZRA POUND.)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল। কৈ গো কৈ মেঘ উদয় হও;
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও।
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও, অঙ্গে হর্ষের উঠুক ধূম॥

(সত্যেন্দ্রনাথ)

Among twenty snowy mountains
The only moving thing
Was the eye of the blackbird.

(WALLACE STEVENS.)

একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যে, এই পঙক্তিগুলোর ভাবানুষঙ্গ অভিধানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। এদের অনির্ব্বচনীয়তার মূলে শুধু শব্দার্থ নেই, আছে শব্দের অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং ছন্দের শোভনতা। এই গুণসমষ্টির নাম রূপ। রূপের প্রত্যেক অঙ্গটি অপরিহার্য্য। রূপ আর প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ সঙ্গমেই কাব্যের জন্ম, তাই কাব্যকে ভাষান্তরিত করা চলে না, তাই কাব্যের ভাষা আর কথ্য ভাষা পৃথক হ'তে বাধ্য, তাই আধুনিক কাব্যে রূপের এত প্রাধান্য। Wordsworth বলেছিলেন, কাব্যকে অকৃত্রিম করতে হ'লে, কবিকে বাগ্‌ডম্বর ছাড়তে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, ভাষা রূপের উপকরণ মাত্র; তাই আজকের কবি Wordsworth-এর পরামর্শে আর তুষ্ট থাকতে পারে না, বলে, কাব্যকে নিষ্কলুষ করতে হ'লে রূপের রূপজীবী হওয়া চলবে না, রূপের সঙ্গে প্রসঙ্গের সম্বন্ধটা বৈধ হওয়া চাই।

আসলে ভাষার সঙ্গত শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কাব্যের পক্ষে অসম্ভব। যে-শব্দ কোনো ভাষার অন্তর্গত নয়, যে-শব্দ কেবল নিরর্থ ধ্বনির সাহায্যে আবেগ উদ্দীপন করে, তার প্রয়োগ কাব্যের চেয়ে মন্ত্রেই প্রশস্ত। লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনুকম্পার সেতু নির্ম্মাণ করাই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে কাব্যের শব্দকে অভিধানের কোনো-না-কোনো কোণে আশ্রয় নিতেই হবে। এ-যুক্তির দ্বারা আমি কবিকে নতুন শব্দ তৈরি করার সনাতন অধিকারে বঞ্চিত করতে চাইছি না, শুধু এইটুকু বলছি যে, দুগ্ধপোষ্য শব্দের অপেক্ষা প্রাপ্তবয়স্ক শব্দই বেশী কর্ম্মঠ। তাই 'কেমিষ্ট্রী'র তুলনায় 'এলকেমী'র ভাবানুষঙ্গ গভীরতর। কিন্তু মানুষের কার্য্যকারিতার যেমন একটা সীমা আছে, তেমনি শব্দের সক্রিয়তাও অমিত নয়। শব্দের স্বভাব টাকার মতো; ব্যবহারে তার ক্ষয় হয়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল ক'রে দেয় এবং কালে সে স্থান পায় জাদুঘরের গ্লাসকেসে। কিন্তু মিউজিয়মভুক্ত হওয়া বিলুপ্তির নামান্তর নয়, অপ্রচলিত শব্দও অবস্থা-বিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মুদ্রার ব্যবহারিক মূল্য যখন কমে আসে, তখন তার আলঙ্কারিক মর্য্যাদা বাড়ে। তেমনি রূপদক্ষের হাতে প'ড়ে পুরানো শব্দও কাব্যের ভূষণ হ'য়ে দেখা দেয়। Doughty-র লেখায় Anglo-Saxon বাক্যগুলোই আমার কথার সাক্ষী। সম্ভ্রান্ত শব্দসম্বন্ধে যে-কথা খাটে, অপভাষার পক্ষেও তা মিথ্যা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গের খাতিরে, আধুনিক কবি সাধু অসাধু, নবীন প্রবীণ, দেশী বিদেশী সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষার বিষয়ে তার একমাত্র মানদণ্ড হলো প্রাসঙ্গিকতা, কেননা ভাষা রূপেরি উপাদান। সেই জন্যেই ভাষাসম্বন্ধে Wordsworth-এর বিপ্লববাদকে উপেক্ষা করা

ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। তবু সে-যুগের চরমপন্থী Wordsworth আত্মজ্ঞ অকৃত্রিমতার গরজে যেখানে লিখেছিলেন :

> And now the same strong voice more near
> Said cordially, "My friend, what cheer?
> Rough doing these! as God's my judge,
> The sky owes somebody a grudge!
> We have had in half an hour or less
> A twelve months' terror and distress!

সেইখানেই এ-যুগের রক্ষণশীল Rupert Brooke স্বসিদ্ধ ভাষায় লিখতে পেরেছেন :

> The damned ship lurched and slithered. Quiet and quick
> My cold gorge rose; the long sea rolled; I knew
> I must think hard of something, or be sick
> And could think hard of only one thing—you!
> Do I forget you? Retching twist and tie me,
> Old meat, good meals, brown gobbets up I throw.
> Do I remember? Acrid return and slimy,
> The sobs and slobber of a last year's woe . . . .

ভাষা, ভাব আর ছন্দ, এই তিনের সন্নিপাতে কাব্য গ'ড়ে ওঠে। ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কোনো রকমের পূর্ব্ব-সংস্কার পোষণ করা চলে না, তা' আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, আধুনিক তরুণদের মতো এরাও মিলনব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের হিতোপদেশ মানতে চায় না, বলে, আবেগ-সৃষ্টিই যদি আমাদের ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে স্বয়ম্বর-প্রথার পুনঃপ্রচলন অত্যাবশ্যক। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, আমাদের কপটতার ভয় দেখিয়ে তারা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করেছে। এবারে এসেছে ছন্দের পালা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কৃত্রিমতার আশঙ্কায় একেও কি স্বায়ত্তশাসনে অধিকার দিতে হবে? তা-ই যদি দিতে হয়, তবে কাব্যের আর থাকবে কি? এ সমস্যাটা সমাধান হওয়ার পূর্ব্বে ছন্দের স্বভাবকে ভালো ক'রে বোঝা উচিত। ছন্দ আর মিল এক জিনিষ নয়। মিল কাব্যের অপেক্ষাকৃত নতুন অলঙ্কার, কিন্তু ছন্দ অনাদি। কাব্যের জন্মবৃত্তান্তের তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের উৎপত্তি হয়েছিল। এ বিবরণের ভিতরে ভুলচুক থাকা অসম্ভব নয়। এতে করে ছন্দকেই জ্যেষ্ঠের আসন দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু আসলে সে-সম্মানে তার দাবি না-ও থাকতে পারে। ছন্দ আর আবেগ হয়তো যমজ ভাই, তাদের টান হয়তো নাড়ীর টান। এখানে একটা বিষয় অবশ্য দ্রষ্টব্য — আবেগ আর বেগ এক কথা নয়, আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশী; অর্থাৎ আবেগ যখন মুখর হ'য়ে ওঠে তখন তার ভাষা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়য় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে। এই ধ্বনি ও যতির সুব্যবস্থিত নক্সাই বোধ হয়

But heavy sealing darkness, silence, all immovable.
What is sleep?
It goes over me, like a shadow over a hill,
But does not alter me, nor help me.
And death would ache still, I am sure ;
It would be lambent, uneasy.
I wish it would be completely dark everywhere,
Inside me, and out, heavily dark,
Utterly.

আবেগের সঙ্গে ছন্দের এই মিতালি যদি কাল্পনিক না হয়, তবে ছন্দ সম্বন্ধে কোনো রকমের পূর্ব্বসংস্কার পোষণ করা ভাষা সম্বন্ধে হঠোক্তির মতোই অসঙ্গত। আবেগকে আপনার ছন্দ খুঁজে নিতে দেওয়াই প্রশস্ত। এখানেও একমাত্র নিকষ প্রাসঙ্গিকতা। যে-ছন্দ প্রসঙ্গের বিধান ছাড়া অন্য কোনো শাসন মানে না, তারি নাম মুক্ত ছন্দ। কিন্তু ছন্দের মুক্তি আর স্বেচ্ছাচার এক কথা নয়। অঙ্কের আদেশ না-মানলেও, উপরের উদাহরণ-গুলির মতো, সমস্ত মুক্ত ছন্দই একটা স্বয়ন্তর নিয়মের নিবিড় বন্ধনে নিটোল। কিন্তু এটা কেবল মুক্তিরই লক্ষণ নয়, ছন্দ মাত্রেই এই নিয়ম মানতে বাধ্য, অর্থাৎ ছন্দ মাত্রেই আবেগের পদাঙ্কে চলে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নয় যে আবেগ আধারের অন্বেষণে সময়বিশেষে এমন একটা আশ্রয়ে উপনীত হতে পারে যার সঙ্গে আলঙ্কারিকের ছন্দের বিরোধ নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিই ঃ

When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smoothes her hair with automatic hand
And puts a record on the gramophone.

T. S. Eliot 'Waste Land-এর স্বয়ম্বশ, নিরাভরণ, প্রাকৃত ছন্দের মাঝখানে হঠাৎ এই সভ্য ভব্য সাবেকি আমলের চারটে লাইনের সাহায্যে বর্ত্তমান যুগের একটা অকিঞ্চিৎকর প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে এখানে ওই ছন্দটি কেন অবশ্যম্ভাবী। প্রথম পঙক্তিটা Vicar of Wakefield থেকে নেওয়া ; ওটাকে Goldsmith প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর ভাববিলাসী উপ-ন্যাসের লঘুমতি নায়িকার পদস্খলন সম্বন্ধে ; উপরন্তু গত দুশ বৎসর ধরে হাতে হাতে ফেরার ফলে ওটার প্রাথমিক রসের সম্বলটুকু উবে গেছে, পড়ে আছে কেবল একটা বিস্বাদ রসালুতা। অতএব যেই লাইনটা পড়ি অমনি অন্তত আমার মন আজকালকার প্রেমের ভাবালু পূর্ব্বরাগের নিঃসারতায় অভিভূত হয়ে আসে এবং পরের তিন লাইনে এই বহ্বারম্ভের নিষ্ঠুর নিরর্থ পরিসমাপ্তি আমাকে জর্জ্জরিত করে দেয়। লাইন-ক'টার বিধিবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার ভিতরে দেখতে পাই, একটা নিরুদ্বিগ্ন, নির্ব্বোধ রমণী ভগ্ন বাসরের মধ্যে নিষ্কারণে ঘুরে

বেড়াচ্ছে, এবং মিলের ধাক্কায় জেগে উঠে গ্রামোফোন-শব্দটা অনর্গল স্পর্দ্ধায় আমাকে বল্‌তে থাকে যে এই নগণ্য নাটিকার মুখ্য প্রবর্ত্তনা, তারি চীৎকারের মতো যান্ত্রিক, তারি উল্লাসের মতো নিরর্থক।

স্বয়ম্বহ ছন্দের এই নমুনার পাশে পোপ-অনূদিত হোমারকে অথবা মাইকেল-বর্ণিত মেঘনাদকে বসালেই বোঝা যাবে আধুনিক কবি কাব্যকে কেন প্রথাসিদ্ধ ছাঁচে ঢালতে চায় না। তার বিশ্বাস, কাব্য বিজ্ঞানোক্ত ক্রিষ্টালের মতো, সুযোগ দিলে সে আপনার রূপ আপনি বেছে নিতে পারে, কিন্তু বাহ্য নির্দ্দেশের ফলে তার মধ্যে বিকার এসে জোটে। এই কথার ভিতরে কাব্যের অতিমর্ত্ত্যতার কোনো আভাস নেই। আধুনিক কবি প্রেরণাকে উড়িয়ে দেয় না বটে, কিন্তু প্রেরণা বলতে সে বোঝে পরিশ্রমের পুরস্কারকে। প্রশ্ন হতে পারে, কাব্য যদি স্বয়ম্ভূ তাহলে কবির পারিশ্রমিকের প্রস্তাব উঠলো কেমন ক'রে ? এর উত্তরে বলা যায় যে কাব্য সেই অর্থে স্বয়ম্ভু, যে-অর্থে স্বয়ম্ভূ গাছ। একদিন হয়তো সে আপনার আনন্দে আপনিই উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো, কিন্তু বিশ্বের সেই প্রাক্তন উর্ব্বরতা আর নেই। আজকের দিনে কাব্যের কল্পতরুকে চাইলে, সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে তার বীজ সংগ্রহ করতে হয়, তার ভূমিকা প্রস্তুতির জন্যে মনের এঁটেল মাটিতে দিতে হয় লাঙল। তার পরে যখন তার অঙ্কুর দেখা দেয় তখনো তার বৃদ্ধিকে আয়ত্ত করার উপায় নেই, তখনো তার পিপাসা মিটতে হয় অশ্রু-সেচনে, নষ্টমোহের সার দিয়ে তখনো নিবারণ করতে হয় তার ক্ষুধা। এই কঠোর তপস্যার সিদ্ধিস্বরূপ কবি চায় একটিমাত্র বর, তার অক্ষয় বট শুধু তাকেই তাপন-তাপ থেকে রক্ষা করবে না, আশপাশের আরো পাঁচজনকে একদিন ছায়া দেবে।

স্থান ও সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে, আধুনিক কবির মোহমুক্তির ইতিহাসটাকে আমি হয়তো একটু বেশী সরল করে দেখিয়েছি। প্রকৃত পক্ষে তার প্রগতি ইস্রেলীয়দের মতোই পতনে আর অভ্যুদয়ে বন্ধুর। তার প্রতিশ্রুত নন্দনের পথ বারম্বার মরুর প্রান্তরে দিশাহারা হয়েছে, জনপদের কুহকে গন্তব্য ভুলেছে, দেবতাকে ছেড়ে অনুসরণ করেছে অপদেবতার। Symbolist-দের ধূপের ধোঁয়ায় তার চোখে এমনি ধাঁধা লেগেছে যে সে কেঁচো-মাটি আর পর্ব্বতের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করেনি। এ-নেশা কাটার সঙ্গে সঙ্গেই Imagism-এর অহঙ্কৃত বিজ্ঞাপনে সে হয়েছে আত্মহারা এবং Dowson, Symons ইত্যাদির চিত্রল আতিশয্যের পরে নিম্নোক্ত ধরণের তুচ্ছ স্পষ্টোক্তির ভিতরে শুনেছে প্রাক্তন পবিত্রতার সাড়া ঃ

O wind,
Rend open the heat,
Cut apart the heat,

Rend it to tatters.

Fruit cannot drop
Through this thick air—
Fruit cannot fall into heat
That presses up and blunts
The points of pears
And rounds the grapes.

Cut the heat—
Plough through it,
Turning it on either side
Of your path.

(H. D.)

এই রকমের নিরক্ত পাণ্ডুরতার পরে পরবর্ত্তী কবিতায় Georgianism-র মেটে রঙকে যদি তার স্বাস্থ্য-কর মনে হয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই :

Under the long fell's stony eaves
The ploughman, going up and down,
Ridge after ridge man's tide mark leaves,
And turns the hard grey soil to brown.

Striding he measures out the earth
In lines of life, to rain and sun ;
And every year that comes to birth
Sees him still striding on and on.

(GORDON BOTTOMLEY.)

কিন্তু Georgianism-এর অনিত্য মাদকতা মহাসমরের রুধিরাক্ত তাণ্ডবের তালে ধ্বংস ভ্রংশ হয়ে গেছে এবং অনতিবিলম্বে সে বুঝেছে, চষা মাঠ ছাড়াও জগতে আর-এক রকমের ক্ষেত্র থাকতে পারে যার উপরে লাঙলের পরিবর্ত্তে গোলাগুলি-বোমার সাহায্যে অঙ্কিত হয় মরণের রেখা। ফলে Georgian-দের গোপগাথার নব-বিধানগুলোকে সে আর মনে রাখার অবসর পায়নি, কাব্যের সমস্ত কৃত্রিম রীতিনীতিকে ছারখার ক'রে দিয়ে তার সংরক্ত আবেগ সেদিন আপনার ছন্দে আপনি বেজে উঠেছে :

His wild heart beats with painful sobs,
His strained hands clench an ice-cold rifle,
His aching jaws grip a hot parched tongue
And his wide eyes search unconsciously.

He cannot shriek.

Bloody saliva
Dribbles down his shapeless jacket.

I saw him stab
And stab again
A well-killed Boche.

This is the happy warrior,
This is he . . . . . .

(HERBERT READ.)

বাঞ্ছিত সহজতার সুরু এইখানে। কিন্তু আধুনিক কবির অগ্নিপরীক্ষা সেদিনো শেষ হয়নি, তখনো তার বুঝতে বাকি ছিলো শান্তি যুদ্ধের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর, আরো নিরাশ্বাস, আরো নিঃসঙ্গ। আজকে তার "ভ্রান্তি-বিলাস"-নাটিকার উপরে যবনিকা পড়েছে, তার আত্মম্ভর প্রগল্‌ভতার আর অণুমাত্রও অবশিষ্ট নেই, আজকে তার আড়ম্বরশূন্য লেখনী অনায়াসেই লিখতে পারে :

" I will now call on Alberic Morphine to give us a reading."
The rows of young women look up ; their eyes glisten ; they shiver
With the kind of emotion that's really very misleading,
All have fine eyes, yellow faces, vile clothes and a ' liver.'

They smoke a great deal, bathe little, and wear no stays ;
Their artistic garments are made on the Grecian plan ;
They flock in their crowds to the latest poetic plays,
And aspire to a union of souls—with some pimply young man.

(DOUGLAS GOLDRING.)

কিন্তু এই কি তার অন্বিষ্ট নন্দন ?

এতক্ষণ আধুনিক-কবির সাধনার কথা বলেছি, এইবারে তার সিদ্ধির পরিমাপ করা যাক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে মহৎ কবিতা লিখেছে। সে হয়তো শেক্সপীয়রের পাশে স্থান পাবে না, কিন্তু তার কারণ উৎকর্ষের অভাব নয়, তার কারণ জাতির ভিন্নতা। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে বর্ত্তমান কাব্যের অধিকাংশই সাম্প্রতবিদ্, আধুনিক নয়। কিন্তু এ-দুর্নাম শুধু আমাদের যুগেরই প্রাপ্য নয়, অতীতের কাব্যসমষ্টিতেও সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপই বেশী। তবে আজকালকার শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্বন্ধে একটা দারুণ অভিযোগ আংশিক ভাবে সত্য, ইদানীকার কবিতা দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু দুরূহতার দুটো দিক্ আছে, একটা পাঠকের দিক্, অন্যটা লেখকের। যে-দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তার জন্যে কবিকে দোষী করা যায় না। দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতকে বাদ দিলেও কলার অন্যান্য বিভাগে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে যে-আগ্রহ অভিনিবেশ ও অনুশীলন আবশ্যক, কবি যদি তার নিজের কলার পক্ষে সেই পরিমাণের শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায়, তাহ'লে তার দাবি নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যে-দুরূহতার উৎপত্তি অনুকম্পার অভাবে, যার মূল কবির নিজের দ্বিধা, তার কতকটার দায় যুগসন্ধির স্কন্ধে চাপানো গেলেও, বেশীর ভাগটা বইতে হবে কবিকেই। পূর্ব্বেই বলেছি, আমার মতে কাব্য কেবল তখনি পরমত্বে উপনীত হয়, যখন তার সন্ধানে নিত্য প্রলয়ের উল্বণ উতরোলের মাঝখানেও নিরপেক্ষ স্থিতির অবিনশ্বর শান্তিকে মিলে। আধুনিক কাব্য এইখানে হারস্বীকার করেছে। তার এই চেষ্টা কখনো সফল হবে কি-না, তা বলবার সময় এখনো আসেনি। ভবিষ্যদ্বাণী অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর ;

তবু আমার মনে হয়, তার এ অন্বেষণ কোনোদিনই সার্থক হবে না। জীবনের সহজ সূত্র আজকে যে জটিল কুটিল আকার ধরেছে, তার মধ্যে প্রাথমিক ঋজুতা আনা অসম্ভব। আমাদের বৃদ্ধিশীল জ্ঞানই এই আসুরিক প্রচেষ্টার প্রধান শত্রু। আমাদের বুদ্ধির প্রত্নতাত্ত্বিক উল্লেখনী মানুষের কীর্তি স্তম্ভ-গুলোর যে-আপতিক ভিত্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে, তা দেখার পরে শৃঙ্খলার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই জন্যেই কাব্যের কল্পতরু আজকে আর বটের মতো ধরিত্রীর অঙ্কে বদ্ধমূল নয় ; সে-গাছ পর্ব্বতজাত রডোডেন-ড্রণের মতো তনুবাত অন্তরীক্ষে উচ্ছ্‌সিত হয়ে উঠেছে বলেই, তার দেহ গ্রন্থিল, তার পরিসর খর্ব্ব, তার তলায় ছায়া নেই, ফল নেই তার শাখে, আছে শুধু একটা অহৈতুক আন্দোলন, আর আছে ফুল, নিষ্ঠুর, রক্তাক্ত ফুল।

কিন্তু আধুনিক কাব্যের অবশ্যম্ভাবী সঙ্কীর্ণতাকে স্বীকার করলেও, আধুনিক কবির আত্মত্যাগের মহত্ত্বকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। আমরা যেন কোনোদিন না-ভুলি যে, সে যেদিন যাত্রারম্ভ করেছিলো, সেদিন তার পিছনে ছিলো অনুযাত্র বিশ্বের জয়ধ্বনি, এবং সম্মুখে ছিলো আগন্তুক সিদ্ধির বরাভয়। সে-করতালি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে ; প্রমাণ হয়েছে সে-সিদ্ধি মরীচিকা ; তার সহযাত্রীরা পথপার্শ্বের পান্থশালার প্রলোভন জয় করতে না পেরে, তার সঙ্গ ছেড়েছে, তার মাথার উপরে নেমেছে ধ্রুব-তারাহীন অন্ধকার। তবু সে চলেছে, নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেয়নি, উপশন্ন বিপদের আশঙ্কা রাখেনি, ফিরে দেখেনি তার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ পদে পদে খসে যাচ্ছে। সে রসের আশায় রসালুতাকে প্রশ্রয় দেয়নি, প্রাণের পরিপূর্ণ লীলা দেখ্‌তে পাবে ব'লে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, চরমোৎকর্ষের প্রতিবন্ধক ভেবে টান মেরে ফেলে দিয়েছে উপত্যকার মমত্বময় শিকড়গুলোকে। ইতিমধ্যে মণ্ডলাকার প্রগতির পরিক্রমা হয়তো তার শেষ হয়েছে, আর অগ্রগমনের স্থান নেই, এর পরেই হয়তো মৃত্যু, তবুও তার গতিবেগ থামতে চাইছে না, এখনো তার উদ্যমের অন্ত নেই, শ্রান্তি নেই তার চরণে। এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের পারিতোষিক-স্বরূপ সে যেন কেবল এইটুকুই বুঝতে চায় যে শূন্যগর্ভ মায়ার মধ্যে তার সৃষ্টি আরো শূন্যময় !

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রুষ-বিপ্লবের পটভূমিকা

১

চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ায় সমাজ ও শাসনতন্ত্রের যে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা মানবজাতির ইতিবৃত্তে ফরাসী-বিপ্লবের ন্যায়ই প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। ভবিষ্যৎ যুগের ঐতিহাসিকগণের নিকট আমাদের সমসাময়িক এই প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীর প্রধান স্মরণীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংস্কার, পরিবর্ত্তন, বিপ্লব কিছুই একদিনে সংঘটিত হয় না,—সকল নূতন ব্যাপারেরই সুদীর্ঘ প্রস্তুতি আবশ্যক। সুতরাং কোন্ ঘটনা-পরম্পরায় রাশিয়াতে প্রবল পরাক্রান্ত জারের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়া বল্‌সেভিক্‌দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।

ইউরোপের বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশগুলি সম্প্রতি একে একে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসারিত হইতেছে। আধুনিক ইউরোপের রাজ-পরিবারদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান তিনটি—রাশিয়ার রোমানভ্, অষ্ট্রিয়ার হাব্‌স্‌বার্গ্ ও প্রাশিয়ার হোহেন্‌জলার্ণ্ বংশ—গত মহাযুদ্ধের ফলে সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছে। বুর্ব্বন্-কুলের শেষ প্রতিনিধিও আজ আপন রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। ইহাদের মধ্যে রোমানভ্‌দের পতন সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়, কেননা পূর্ব্বে তাহাদের প্রতাপে কোন বাধা বা সীমা ছিল না। জারদিগের ক্ষমতা, স্বৈরাচার ও অত্যাচার প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। কয়েকদিনের মধ্যে এই বিরাট্ রাজশক্তি অকস্মাৎ সমূলে উৎপাটিত হইবে, ইহা কাহারও সম্ভব মনে হইত না। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার অবস্থা-সম্বন্ধে চিন্তা করিলে কিন্তু বুঝিতে পারা যায় যে, বিপ্লবের প্রায় শতবর্ষকাল পূর্ব্ব হইতে রোমানভ্‌দিগের মুষ্টিতে রাজদণ্ড শিথিল হইয়া আসিতেছিল। প্রথম নিকোলাসের রাজত্ব-কালে (১৮২৫-১৮৫৫) রোমানভ-রাজকুল শক্তির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে এবং সেই সময় হইতেই জারতন্ত্রের ক্ষমতাহ্রাসের সূত্রপাত লক্ষিত হয়।

২

পিটার দি গ্রেট্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম নিকোলাসের সময় পর্য্যন্ত রাশিয়ার বহির্মুখীন রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল। এমন কি দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান্ পর্য্যন্ত রাশিয়াকে তাঁহার পদানত করিতে

জন্য কোন কোন দিকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশে এক নূতন যুগ দেখা দিল—সংস্কারের যুগ। রাশিয়ার অধিকাংশ লোক তখন পর্য্যন্ত serf ছিল—আইনতঃ তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসদের মত, রাজা বা জমিদারের সম্পূর্ণ পদানত হইয়া তাহারা জীবন যাপন করিত। ১৮৬১ সালে আলেক্জাণ্ডার তাহাদের মুক্তি দিলেন। ১৮৬৪ সালে রাশিয়ার বিভিন্ন জেলায় ও প্রদেশগুলিতে প্রজাসাধারণদ্বারা নির্ব্বাচিত সমিতির (Zemstvo) সৃষ্টি হইল। সেই বৎসরেই বিচারে 'জুরী' প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। ছয় বৎসর পরে নগরগুলিতেও স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাত হইল। কিন্তু মুক্তিদাতা (The Liberator) সম্রাটের সংস্কার-সমূহে দেশে শান্তি আসিল না। নূতন ব্যবস্থাগুলি বহুপূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল—এখনও তাহাদের মধ্যে উদারতার একান্ত অভাব দেখা গেল। প্রথম আলেক্জাণ্ডারের সময়েই সার্ফ্‌দিগের মুক্তির প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল; তাঁহার মন্ত্রী স্পেরান্‌স্কি ১৮১১ সালে যে শাসন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাহা জেম্‌ষ্ট্‌ভোগুলির অপেক্ষা অনেক উদার সন্দেহ নাই। দেশের অর্দ্ধেক জমি কৃষকেরা এখন পাইল বটে কিন্তু তাহার জন্য ইহাদিগকে বহুবর্ষ ধরিয়া পূর্ব্বতন প্রভুদের ক্ষতি-পূরণের অর্থ জোগাইতে হয়। প্রাদেশিক সমিতিগুলি শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি যথেষ্ট করিয়াছিল—অনেক সভ্য শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সমগ্র দেশে স্বায়ত্তশাসনের সম্বন্ধে আশা করিতে শিখিল। কিন্তু প্রথম হইতেই সমিতিগুলিকে কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় নাই এবং রাজ্যশাসনে জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে কোনরূপ ক্ষমতা দেওয়া সম্রাট্‌ ও তাঁহার পার্শ্বচরগণ বাতুলতা বলিয়া গণ্য করিতেন।

৫

মুক্তির প্রথম আনন্দে সংস্কারকেরা অনেকে যখন দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডারকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন, তখনই চরমপন্থীগণের মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা গেল। এই সময়ে নিহিলিষ্ট্‌ মতবাদের প্রথম প্রচার হয়—প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস ও সকল প্রথার বিরুদ্ধে অনেক যুবক বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে terrorism-এর আবির্ভাব হইল—১৮৬৬ সাল হইতে এমন কি সম্রাট্‌কে পর্য্যন্ত হত্যা করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াতে যুবক ও ছাত্র-সমাজে আন্দোলন আরম্ভ হয়। নির্ব্বাসনে থাকিয়া হার্‌জেন্‌ তাঁহার বিখ্যাত 'কলোকোল্‌' (ঘণ্টা) পত্রিকায় শিক্ষিত রুষ যুবকদের এক নূতন মন্ত্র দিলেন—to the people—'দেশের জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া চল'।

রাশিয়ার পলিটিক্স-ক্ষেত্রে এই যুগে যাহারা প্রাধান্য লাভ করে, তাহাদের নারোদ্‌নিকি-নামে অভিহিত করা হয়। এই শব্দের অর্থ প্রজাসাধারণের আপনার লোক—men of the people। ইহাদের মধ্যে লাভ্‌রভ্‌-প্রমুখ একদল নিজেদের শুধু প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গ্রামে গিয়া সাধারণ লোকের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদের মনে রাষ্ট্রচিন্তার উদ্রেকের চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্য একদল শান্ত সহিষ্ণুভাবে কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। বিখ্যাত বাকুনিনের অগ্নিময়ী বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা বিপ্লবের পথে পদার্পণ করিল। তাহাদের স্বপক্ষে এক প্রবল যুক্তি ছিল এই, যে সব নারোদ্‌নিকি অহিংসভাবে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারাও রাজরোষ এড়াইতে পারে নাই। নারোদ্‌নিক্‌দের প্রতিপত্তির সময়টি রাশিয়ার ইতিহাসে ভাবোচ্ছ্বাসের যুগ। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য্য আশানুযায়ী ফললাভ করিয়াছিল বলা যায় না। কৃষকেরা জমি ও ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ে চিরকালই উদাসীন, তাহার উপর সকল শ্রেণীর নারোদ্‌নিকির উপর শাসকদিগের কৃপাদৃষ্টি নির্ব্বিচারে পড়িতেছিল। অত্যাচারের ফলে প্রচারের স্রোত কমিয়া আসাতে বিপ্লবীদের পথ পরিষ্কার হইতে লাগিল। গুপ্ত সমিতিগুলি শাসকদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে terrorism পূর্ণমাত্রায় আবির্ভূত হইল। ১৮৮১ সালে সার্ফদিগের উদ্ধারকর্ত্তা সম্রাট্‌ দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডার নিহত হইলেন। তাহার কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত বিপ্লবীদের দ্বারা এইরূপ নানা হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা চলিয়াছিল। এই শ্রেণীর কোন ষড়যন্ত্রের জন্য লেনিনের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণদণ্ড হয় (১৮৮৭)।

৬

Terrorism-এর ফলে ১৮৮১ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অত্যাচার অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। তৃতীয় আলেক্-জাণ্ডারের (১৮৮১-১৮৯৪) মধ্যে দমননীতি মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিল বলা চলে। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস্‌ (১৮৯৪-১৯১৭) দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার পিতার শাসন-প্রণালীতে কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। এই কয় বৎসরে রাশিয়ায় অত্যাচার নানা দিকে দেখা যায়। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যে সকল সম্প্রদায় প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহাদের স্বাধীনতাকে নানা ভাবে খর্ব্ব করা হইল। যে সকল বিভিন্ন জাতি রাশিয়ার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের স্বকীয় ভাষা, প্রথা, আচার ইত্যাদির ব্যবহারে বাধা দেওয়া হইল।

বিশেষভাবে য়িহুদীদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র রহিল না—বিচার-পদ্ধতির কঠোরতা ও সংবাদপত্র এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাত্রদিগকে ও সকল প্রকার পোলিটিকাল দলকে বিধিমত দমন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

কিন্তু এই দেশব্যাপী অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক দিক হইতে জারতন্ত্রের পতনের পথ পরিষ্কার হইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে Industrial Revolution-এর বন্যা রাশিয়াতে আসিয়া পড়িল। দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী, অর্থাগমের সহিত, রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ায় উদার-নৈতিক মতের প্রাদুর্ভাবের ইহাই কারণ। অন্যদিকে রেল্‌লাইন, কারখানা ও বিদেশী মূলধনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদিগের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল। তাহাদের জীবনযাত্রার ভার লাঘব করিবার কোন ব্যবস্থাও হইল না। এইরূপে রাশিয়াতে সোসিয়ালিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল।

৭

সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, রাশিয়ায় প্রধান সোসিয়ালিষ্ট্ দল ছিল সোসিয়ালিষ্ট্-রেভলিউসনারীগণ—যাহারা সংক্ষেপে এসার (S R.) দল বলিয়া খ্যাত। তাহাদের সহিত নারোদ্‌নিক্‌দের মতামতের অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এসারের রাষ্ট্রচিন্তা কৃষকদিগের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিল। তাহারা terrorism-এর পক্ষপাতী ছিল; স্বদেশপ্রেম তাহারা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দলে কার্য্য করিতে তাহারা ভালবাসিত—Individualism তাহাদের মজ্জাগত ছিল। দেশের জনসাধারণ বলিতে তাহাদের মনে যে মায়া ঘনাইয়া আসিত তাহার ভিতরে প্রচলিত সোসিয়ালিজ্‌মের শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের (class war) ভাব খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

সোসিয়ালিষ্ট্-ডিমোক্রাট্ নামে পরিচিত দ্বিতীয় একদল সম্পূর্ণ পৃথক্ আদর্শে গঠিত হইতেছিল। তাহাদের প্রধান নেতা ছিলেন প্লেকানভ্। তাহারা মার্ক্‌সের মতবাদ সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রমিকদিগের স্বার্থের জন্যই দেশে বিপ্লব আনিতে চাহিতেছিল। মার্ক্‌সের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ—Das Capital ১৮৭২ সালে রুষভাষায় অনূদিত হয়—ইহাই বোধহয় এই পুস্তকের প্রথম ভাষান্তর। কিন্তু রাশিয়াতে মার্ক্‌সীয় দল ১৮৮৯-এর পূর্ব্বে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; তাহাদের প্রথম সার্ব্বভৌমিক সভা

(First International) ১৮৯৭ সালে সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই নেতৃবৃন্দ কারাগারে বা নির্ব্বাসনে প্রেরিত হইলেন।

প্রথম হইতেই এই দলের মধ্যে লেনিনের প্রতিপত্তি বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। নারোদনিক্ ও এসার মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ওই দুটি দল শ্রমিকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই—স্বদেশের মায়ায় জগদ্ব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে—নিজেদের শক্তি কতকগুলি বৃথা নরহত্যায় অপচয় করিয়াছে—এই ছিল তাঁহার প্রধান অভিযোগ। নানা বিপদের পর বিদেশে তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হয়। লণ্ডন হইতে 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তিনি নিজের মতামত প্রচার করিতে লাগিলেন। মার্ক্‌সীয় দলের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সম্রাটের সমস্ত চরের চক্ষে ধূলি দিয়া 'ইস্ক্রা' রাশিয়ার সর্ব্বত্র পৌঁছাইতে লাগিল, কারণ নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতেও কার্য্য চালাইবার লোকের অভাব হয় নাই।

১৯০৩ সালে লণ্ডনে সোসিয়ালিষ্ট্-ডিমোক্রাট্‌দের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। লেনিনের মতামত লইয়া এই সভাতে দুই দল সৃষ্টি হইল। তন্মধ্যে লেনিনের সমর্থনকারীরা সংখ্যায় অধিক থাকাতে তাহারা বল্‌শেভিক্ অথবা সংখ্যাধিকের দল বলিয়া আখ্যা লাভ করে। অন্য পক্ষ মেন্‌শেভিক্ নামে পরিচিত। বল্‌শেভিক্‌গণ নূতন পদ্ধতি অনুসারে মার্ক্‌সীয়দলের পুনর্গঠন চাহিল। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মন না দিয়া যাহাতে উপযুক্ত লোকেরাই কেবল সভ্য হইতে পারে তাহার চেষ্টাকেই তাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিল। সকলেই একটি কেন্দ্রীয় সমিতির আদেশ-অনুসারে কার্য্য করিবে—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত তাহারা কোন সহযোগ রাখিবেনা—শ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্ত্তন একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারাই সম্ভব—ইত্যাদি মতগুলিও মেন্‌শেভিকেরা গ্রহণ করিতে পারে নাই। মেন্‌শেভিকেরা মুখে বিপ্লবের কথা বলিলেও কার্য্যতঃ জার্ম্মান্ সোসিয়াল্-ডিমোক্রাট্ বা ব্রিটিশ লেবার দলের ন্যায় শান্তিপ্রিয় ছিল—প্রচারকার্য্যের উপরই তাহারা অধিক নির্ভর করিত। মতভেদ সত্ত্বেও সোসিয়ালিষ্ট্-ডিমোক্রাট্‌দের দুইটি শাখা এই সময়ে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া গেল না। ১৯০৩-এর পরে প্লেকানভ্ বল্‌শেভিক্‌দের অপেক্ষা মেন্‌শেভিক্‌দিগের প্রতি অধিক প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তাহার ফলে রাশিয়াতে মার্ক্‌সীয় দলের কর্ত্তৃত্ব মেন্‌শেভিক্‌দের হস্তেই ন্যস্ত হইল। লেনিন্ কিন্তু ফরওয়ার্ড্ (Forward) নামে পত্রিকা বাহির করিয়া নিজের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন।

ছন্দ। ছন্দের এই বর্ণনা যদি ঠিক হয়, তবে গদ্য-পদ্যর সীমাসন্ধি একটু অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু তাতে আপত্তি করলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র নীচের অংশটা পড়ার পড়ে অস্বীকার করা যায় না যে, আবেগ-প্রবণ গদ্য আর কাব্য অভেদাত্মা ঃ

"এখানে নামলো সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে
কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হ'লো?
অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা,
বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো;
কোন্‌খানে ফুটলো ভোরবেলাকার কনকচাঁপা?
জাগ্‌লো কে? নিবিয়ে দিলো সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ,
ফেলে দিলো রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।
এখানে একে একে দরজায় আগল পড়্‌লো, সেখানে জানলা গেলো খুলে।
এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।"

যদি কুসংস্কার বর্জ্জন করে শোনা যায়, তাহ'লে আমাদের কান ওই লাইন-ক'টার মধ্যে একটা অন্তর্ভৌম ছন্দের ঝঙ্কার পাবে। এই গূঢ় শৃঙ্খলার মূলে কোনো রকমের তাত্ত্বিক চাতুরী নেই; কেবল উপমা আর ভাবের বৈকল্পিক বিন্যাসেই এই প্রতিসাম্য এসেছে। নিক্তির একদিকে সন্ধ্যার ভার যেই রজনীগন্ধার সহযোগে এলিয়ে পড়তে চায়, তখুনি কনকচাঁপা সূর্য্যের সমর্থনে ছুটে এসে তাদের নির্ভর হ'য়ে দাঁড়ায়; 'জাগলো কে'—প্রশ্নটা যেমন উতল হ'য়ে ওঠে, দীপের আরতি আর ফুলের অর্ঘ্য অমনি তাকে শান্ত ক'রে দেয়; হাওয়ায় ভরা পালের চালনে অর্গলিত ঘরের স্থবির নিদ্রা কোথায় উধাও হয়ে যায়, কে জানে?

এই লেখাটিকে কাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা যদি অসঙ্গত না-হয়, তাহ'লে আমরা মানতে বাধ্য যে, আলঙ্কারিকের ছন্দকে পরিহার ক'রেও কাব্যরচনা অসম্ভব নয়। বস্তুত আলঙ্কারিক যাকে ছন্দ বলে সে একটা যান্ত্রিক কৌশল মাত্র; সেই নাগরদোলার ঘূর্ণি লেগে আমাদের মন অনেক সময়েই কবিতা-বিশেষের মধ্যে ভাব আর আবেগের অভাব দেখতে পায় না। সংস্কৃত কবিরা এই যন্ত্রবিদ্যাটাকে খুব ভালো ক'রে আয়ত্ত করেছিলো; সংস্কৃত কাব্যের প্রকাণ্ড ফাঁকি সেই জন্যেই অদ্যাবধি ধরা পড়েনি। সেই জন্যেই অজবিলাপের এই বিখ্যাত শ্লোকটা শোকের সঙ্গে কোনো সংস্রব না-রেখেও, আমার মনে আজো একটা দারুণ বিষাদের মুগ্ধ মূর্ত্তি ফুটিয়ে রেখেছে ঃ

স্রগিয়ম্ যদি জীবিতাপহা
হৃদয়ে কিম্ নিহিতা ন হন্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতম্ ক্বচিদ্ভবেৎ
অমৃতম্ বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া ॥

কিন্তু যখনি মোহ কাটে, তখনি বুঝি কালিদাস সেদিন সুন্দরীর শরণ নিয়েছিলেন, তাঁর স্ববহিত আবেগের ধারা শীর্ণ হয়ে পড়েছিলো বলেই।

আধুনিক কবি আমার এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন না করলেও, সে জানে যে কাব্য যখন মহত্ত্বের কোঠায় পৌছয় তখন তার সঙ্গে আর সংখ্যার কোনো সম্পর্ক থাকে না, তখন তার ভিতরে পাওয়া যায় শুধু একটা বিরাট সহজতা। কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দও তেমনি অকৃত্রিমতার পদধ্বনি। অনেকে বলবেন, এটা নতুন সত্য নয়, প্রত্যেক মহাকবিই এ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন, জীবন্ত কবিতার ছন্দ সর্ব্বত্রই অহংজ্ঞানশূন্য, সর্ব্বত্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত। বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাত্ত্বিক আধুনিক কবি নবীনতার বড়াই করে না; সে জানে, সাহিত্যকে নব সম্পদে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চিরদিনই উপহাস্য; তাই সে শুধু আবিষ্করণে মন দিয়েছে। প্রথার অন্ধকূপ থেকে কণ্ঠাগত-প্রাণ ঐতিহ্যকে মুক্ত করাই তার উদ্দেশ্য; তার ব্রত, কাব্যকে আদিম স্বাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। কাব্যের মৌল সত্তা তার কাছে নিরতিশয় বাস্তব বলেই শেক্সপীয়রের ছন্দ বোঝবার জন্যে তার পণ্ডিতী ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। সে জানে নিম্নোক্ত উদাহরণটা লিয়রের উচ্চণ্ড আবেগের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি, সেই জন্যেই গলদ্‌ঘর্ম্ম টীকা-কারের সামান্য মানদণ্ডের সাহায্যে এ-বিশ্বরূপের কিনারা পাওয়া শক্ত ঃ

Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks!
You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt-couriers of oak-cleaving thunderbolts,
Singe my white head! And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o' the world!
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That make ungrateful man!

যে অতীন্দ্রিয় শ্রুতির কল্যাণে আমরা এই অসম্বন্ধ প্রলাপেও অব্যক্ত সাম্যস্থিতির খবর পাই, তারি আশীর্ব্বাদে D. H. Lawrence-এর উদ্ধৃত কবিতার আপাত-বিষমতা একটা প্রচ্ছন্ন স্বরসঙ্গতির পরিচয় দেয় ঃ

No, now I wish the sunshine would stop
And the white shining houses, and the gay red flowers on the balconies
And the bluish mountains beyond, would be crushed out
Between two valves of darkness;
The darkness falling, the darkness rising, with muffled sound
Obliterating everything.
I wish whatever props up the walls of light
Would fall, and darkness would come hurling heavily down,
And it would be thick black dark for ever.
Not sleep, which is grey with dreams,
Nor death, which quivers with birth,

পারেন নাই। টিল্‌সিটের সন্ধির সময় (১৮০৭) নেপোলিয়ান্ সম্রাট্ প্রথম আলেক্‌জাণ্ডারকে তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের পতনের অন্যতম কারণ রাশিয়ায় বিপুল শক্তি—সেইজন্য আলেক্‌জাণ্ডার নিজেকে "বিশ্বজয়ীজিৎ" বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রাশিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধির পথে বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-১৮৫৬) রাশিয়ান্‌দিগের নিকট অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই নূতন সত্যের আভাস আনিয়া দিল। তুরস্কসমরে (১৮৭৬-১৮৭৮) রাশিয়াই বিজয়ী হইল, কিন্তু সন্ধির সময়ে লাভ করিল প্রধানতঃ অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ড। তুরস্কের করগত কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপ্‌লের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে জাতির যে-পন্থা ক্যাথারিণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপে বাধা ঘটিল। এই সময়ে অন্য একদিকে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিতেছিল বটে—১৮৫৯ সালে ককেসাস্ অঞ্চল, ১৮৫১ হইতে ১৮৬০ সালের মধ্যে আমুর্ উপত্যকা ও চীনের সীমান্ত প্রদেশ এবং ১৮৬৫ হইতে ১৮৯১ সনের ভিতরে মধ্য এসিয়া সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার করায়ত্তে আসিয়াছিল। কিন্তু একদিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংঘাতে ও অন্যদিকে ১৯০৪-১৯০৫ সালে জাপানের হস্তে পরাজয়ের ফলে এসিয়া মহাদেশেও অবশেষে রাশিয়ার গতিরোধ হইল। মহাযুদ্ধের সময়ও রাশিয়া পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছিল। ক্রিমিয়া-সমর, রুষ-জাপান সংগ্রাম ও মহাযুদ্ধ এই তিনবার পরাজয়ের ফলে সর্ব্বসাধারণের নিকট জারতন্ত্রের অপটুত্ব ও দুর্ব্বলতা যে ভালো করিয়াই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছিলো তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য প্রত্যেক পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই আমরা রাশিয়াতে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান দেখিতে পাই। ১৯১৪ সালে সার্ব্বিয়ার সংবাদপত্রগুলি অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যকে কীটভুক্ত বলিয়া উপহাস করিত। রোমানভ্‌দিগের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

৩

রাশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম নিকোলাসের যুগ হইতেই সম্রাট্‌দিগের শাসনপ্রণালী-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বিপ্লাচরণের আরম্ভ। পিটার ও ক্যাথারিন্ দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সূচনা করেন বটে (তাঁহাদের পূর্ব্বে এসিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া রাশিয়ার একটা অখ্যাতি ছিল) কিন্তু সে চেষ্টা রাজশক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট

থাকায় তাহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। প্রথম আলেক্‌জাণ্ডারের সময় পশ্চিমের সহিত বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষদের ভিতর দিয়া ইউরোপের স্বাধীন চিন্তার ধারা বর্ষার মতন রাশিয়াতে প্রবেশ করিতে লাগিল। ফলে রাশিয়ায় এই সময়ে আধুনিক পোলিটিক্যাল প্রচেষ্টার আরম্ভ। আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন্ ভ্রাতা সম্রাট্ হইবেন, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে স্থির ব্যবস্থা ছিল না। এই সুযোগে ১৮২৫ সালে, প্রথম নিকোলাস সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র পাশ্চাত্য চিন্তায় অনুপ্রাণিত সৈনিকদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রোহী হয় ও দেশে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে। নিকোলাস সহজেই নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করেন কিন্তু দেশের মনরাজ্যে পাশ্চাত্য চিন্তা যে জাগরণ আনিতেছিল তাহা প্রতিরোধ করা তাঁহার প্রভূত শক্তিতেও কুলায় নাই। যে সময় পুষ্কিন্ ও লার্মণ্টভ্ রুষ সাহিত্যে স্বর্ণযুগের সূচনা করিতেছিলেন; তখন অন্য অনেকে ইতিহাস ও দর্শন-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে বেলিন্‌স্কির নাম স্মরণীয়, কেননা তিনিই এই নবীন চিন্তাশীল দলের কেন্দ্রস্থানীয় ছিলেন। রাশিয়ায় এই যুগের স্বাধীন চিন্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় এক তুমুল তর্কের মধ্যে। ১৮৩৬ সাল হইতে রাশিয়ার ভাবরাজ্যে দুইটি বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়। একদল নিজেদের Slavophil বলিতেন—রাশিয়ার শ্লাভজাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারা জগতে একটা mission লইয়া আসিয়াছে, অতএব বিদেশের ব্যর্থ অনুকরণ না করিয়া পুরাতন স্বদেশী পরিশীলনের পুনর্গঠন আবশ্যক—ইহাই ছিল ইঁহাদের অভিমত। অপরপক্ষে Westerners বা পাশ্চাত্যপন্থীরা পশ্চিমের বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার আলোক পশ্চিম হইতেই আসিতেছে। শেষোক্তদলের প্রভাবই শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়াতে প্রবলতর হয়। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালে স্বাধীন চিন্তাস্রোত রোধ করিবার জন্য অত্যাচারের ত্রুটি হয় নাই। অনেকের ভাগ্যেই কারাগার বা নির্ব্বাসনদণ্ড জুটিয়াছিল কিন্তু এই সময় হইতে শিক্ষিত রাশিয়ান্‌দের মনের জড়ত্ব কাটিবার লক্ষণ দেখা যায়। তাহারা নিজেদের অবস্থা-সম্বন্ধে ভাবিতে ও প্রশ্ন করিতে শিখিল।

৪

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসানে, প্রথম নিকোলাসের পুত্র দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডারের সময় (১৮৫৪-১৮৮১) শিক্ষিত সমাজের মতামত সর্ব্বপ্রথম শাসকদিগের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। যুদ্ধে পরাজয়ের পর সম্রাট্ ও তাঁহার মন্ত্রণাদাতাগণ, রাশিয়ার রাষ্ট্রশক্তি সুদৃঢ় করিয়া লইবার

৮

রুষ-জাপানের যুদ্ধের ফলে জারের সিংহাসন টলমল করিয়া উঠিল। দেশব্যাপী অসন্তোষ প্রকাশ পাইল প্রাদেশিক সমিতিগুলির সম্মিলিত সংস্কার-কামনায় (নভেম্বর, ১৯০৪)। গণতন্ত্র স্থাপনের দাবী সমর্থন করিয়া নানাদিকে সমিতি ও সঙ্ঘ গঠিত হইতে লাগিল—সকল শ্রেণীর লোকেই আন্দোলনে যোগ দিল। রাজধানীতে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সঙ্ঘের সভ্যেরা শোভাযাত্রা করিয়া রাজদরবারে নিজেদের প্রার্থনা জানাইতে গেল। সৈনিকেরা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশমত তাহাদের উপর গুলি চালাইলে প্রায় ১৫০০ লোক সেদিন হতাহত হয়। হত্যাকাণ্ডের সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলনের স্রোত বহিয়া গেল। দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরে পটেম্কিন্-নামক রণতরীর বিদ্রোহ ক্ষণস্থায়ী হইলেও সাম্রাজ্য-পতনের পূর্ব্বাভাসের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে বিপুল জনসভা, শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘট, কৃষকদের জমির দাবী, মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভোটাধিকার প্রার্থনা—নানা উত্তেজনায় ১৯০৫ সাল রাশিয়ার পক্ষে স্মরণীয় হইয়া উঠে। অক্টোবর মাসে রেলকর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মঘট হইতে দেশব্যাপী General Strike সম্ভূত হয়—সকল শ্রেণীর লোকে নিজ নিজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া এক বিরাট্ হরতালের সৃষ্টি করে। রাজধানীতে এই সময় এক অভিনব শক্তির আবির্ভাব হইল—সোসিয়ালিষ্ট্‌দের নেতৃত্বে প্রথম সোভিয়েট্ আপনার কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। সোভিয়েট্ শ্রমিকদিগের নির্ব্বাচিত সমিতি মাত্র কিন্তু এই নির্ব্বাচনের কেন্দ্রগুলি নগরের বিভিন্ন পল্লী অনুসারে ভাগ করা নয়—প্রতি কারখানার শ্রমিকমণ্ডলী পৃথক্‌ভাবে তাহাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। যে কোন মুহূর্ত্তে নূতন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারা যায় বলিয়া সোভিয়েট্ শ্রমিকদিগের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পক্ষে উপযুক্ত উপায়-স্বরূপ সমাদর লাভ করিল। চারিদিক হইতে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া অবশেষে সম্রাট্ অক্টোবর মাসে ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন যে, পূর্ব্ব বৎসরের নভেম্বর মাসের সম্মিলিত প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের জনসাধারণকে শাসন-কার্য্যে কিছু ভাগ দেওয়া যাইবে।

দেশে উত্তেজনা কমিয়া গেলেও যাহারা সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী তাহারা আন্দোলন চালাইতে লাগিল, কারণ সম্রাটের প্রস্তাব সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার চরমপন্থীগণ বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দ্বিতীয়বার General Strike-এর চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর সুযোগ পাইয়া রাজধানীর সোভিয়েট্‌টিকে নির্ম্মূল করা হয়। ১৯০৫

সালের মধ্যেই সম্রাটের প্রভুত্ব অনেকাংশে ফিরিয়া আসে। এই বৎসরের বিপ্লবচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, সোসিয়ালিষ্ট্‌গণ ইহাতে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করে নাই—আন্দোলনে দেশের সকল দলেরই যোগ ছিল। ১৯০৫-এর শেষে মস্কোতে শ্রমিকগণ যে বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা করে, লেনিনের তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটে। অল্পদিনের জন্য তখন তিনি দেশে ফিরিতে পারেন। বারো বৎসর পরে লেনিন তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলেন।

৯

সম্রাটের প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেশে নূতন ব্যবস্থা হইল—প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত এক মহাসভা দেশের শাসনযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দেখা দিল। ইহার নাম ডুমা। কিন্তু ডুমার ক্ষমতা যথাসাধ্য অল্পপরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা হয়—অধিকাংশ ব্যাপারই সম্রাট্ ও তাঁহার নিযুক্ত মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত রহিল। এই কারণে সোসিয়ালিষ্টেরা প্রথমে নির্ব্বাচনে যোগ দেয় নাই। তথাপি ১৯০৬ সালে যখন প্রথম ডুমা সম্মিলিত হইল তখন গভর্ণমেন্টের পক্ষে অল্প সংখ্যক ভোট-ই পাওয়া গেল। সম্রাট্ তখন নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন। প্রথম ডুমার অধিকাংশ সভ্য ভাইবোর্গ্ হইতে দেশের লোকের নিকট গভর্ণমেন্টের সহিত অসহযোগের আবেদন করেন কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই।

দ্বিতীয় ডুমায় (১৯০৭) সোসিয়ালিষ্ট্ দুই দলের (এসার ও মার্ক্‌সীয়) বহুলোক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু নেতাদের মধ্যে অনেককে ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে গভর্ণমেন্ট শাস্তি দিতে উদ্যত হওয়ায় মহাসভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করে। এই দোষে সভার অধিবেশন সাঙ্গ করিয়া নব নির্ব্বাচনের আদেশ হয়। শাসকদিগের প্রীতিপ্রদ না হইলে, জনমতের কোন মর্য্যাদা নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেন সম্রাট্ এই কার্য্য করিলেন। নির্ব্বাচনের নিয়মাবলীও এমনভাবে পরিবর্ত্তন করা হইল যে, অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই ভোট দিবার অধিকার রহিল। ইহার ফলে অবশ্য তৃতীয় (১৯০৭) ও চতুর্থ (১৯১২) ডুমায় গভর্ণমেন্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সভার সার্থকতাও নিশ্চয় অন্তর্দ্ধান করিল। সোসিয়ালিষ্টেরা পুনরায় বিপ্লব চেষ্টায় মন দিল। ডুমার মধ্যে রক্ষণশীল অক্টোব্রিষ্ট (১৯০৫-এর অক্টোবরে জারের প্রস্তাবমণ্ডলীতেও ইহারা সন্তুষ্ট ছিল) ও উদারনৈতিক ক্যাডেট্ দল বাগবিতণ্ডা করিত বটে কিন্তু দেশের লোকের আর ইহার উপর অধিক আস্থা রহিল না।

১৯০৭ হইতে ১৯১১ সাল সোসিয়ালিষ্ট্‌দিগের অবসাদের সময়। কিন্তু ১৯১২ হইতে শ্রমিকদিগের মধ্যে আবার নূতন উদ্দীপনা দেখা গেল। এপ্রিল মাসে লেনা-খনির শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বল্‌শেভিক্‌বাদের বিখ্যাত সংবাদ-পত্র 'প্রাভ্‌দা' (সত্য) এই সময়ে স্থাপিত হইল। ডুমার মধ্যেও স্বতন্ত্র বল্‌শেভিক দল তখন সৃষ্টি হয়। ১৯১২ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিকেরা মেন্‌শেভিক্‌দের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া আপনাদের আদর্শ অনুযায়ী নূতন দল গঠন করে।

১০

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে ১৯১৪ সালে রাশিয়া যখন যোগ দিল তখন দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা আশাপ্রদ ছিল না। বহুকাল হইতে রাশিয়ার কৃষকেরা জমিদারের জমি পাইবার আশা করিতেছিল—তাহাদের মতে জমি ন্যায়তঃ তাহাদেরই প্রাপ্য। পঁচিশ লক্ষ শ্রমিক তাহাদের নিজেদের শক্তি বুঝিতে শিখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে সোসিয়ালিষ্ট্‌ মতবাদ প্রভৃত প্রচার হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশে অধীন জাতিসমূহ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া মুক্তির আশায় বসিয়াছিল।

যুদ্ধে ক্রমাগতঃ শাসনযন্ত্রের অক্ষমতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-বারুদ, দেশের ভিতর খাদ্য, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত—এ সমস্তেরই অভাব দেখা গেল। বিপক্ষের সময় জনমত পুনরায় শাসনতন্ত্রের সংস্কার চাহিল। ডুমার অধিবেশনেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই সময়ে রাশিয়ার প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন রাস্‌পুটিন্‌ নামে একজন ক্রীশ্চান ভিক্ষু। সাম্রাজ্ঞীর উপর তাঁহার অগাধ প্রভাব থাকায় তাঁহার ইচ্ছামত সমস্ত চলিত। তাঁহারই ইঙ্গিতে সাম্রাজ্ঞী সংস্কারের পথে দৃঢ়ভাবে বাধা দিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় নিকোলাস্‌ চিরকালই দুর্ব্বল চিত্ত—এখনও তাঁহার পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে রাস্‌পুটিন্‌ শত্রু হস্তে নিহত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে রোমানভ্‌ বংশের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইল।

মহাযুদ্ধে সোসিয়ালিষ্ট্‌দিগকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহারা দেশে দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনেক প্রচার করিয়াছিল কিন্তু ১৯১৪ সালে ইউরোপের প্রতি-দেশে সোসিয়ালিষ্ট্‌দের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাশিয়াতে প্লেকানভ্‌ তাঁহার চিরজীবনের মতামত বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধ সমর্থন করিলেন—দেশের লোককে জারের পতাকামূলে দাঁড়াইবার উপদেশ দিলেন। মেন্‌শেভিকেরা যুদ্ধে পারতপক্ষে যোগ দেয় নাই, নিরপেক্ষভাবে যুদ্ধ শেষের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বল্‌শেভিক্‌দের

মনে হইল যে, এই যুদ্ধই পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক-বিদ্রোহের পূর্ব্বাভাস ও সুবর্ণ সুযোগ। ১৯১৫-১৯১৬ সালে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যুদ্ধের বিরোধী সোসিয়ালিষ্ট্‌দের দুইটি সভা হয়। লেনিন্‌ সেখানে বল্‌শেভিক্‌ মত প্রচার করেন। তাঁহার দেশে ফিরিবার উপায় ছিল না কিন্তু তাঁহার বাণী দেশে প্রচার করিবার জন্য খাটিবার লোকের অভাব ছিল না। অনেকে গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে শ্রমিকদিগের মধ্যে বল্‌শেভিক্‌বাদ বিস্তার করিয়া যাইতেছিল। বর্ত্তমানে রাশিয়ার কর্ণধার ষ্টালিন্‌ তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

১১

খাদ্যাভাবে ও পুটিলোভ্‌ কারখানায় ধর্ম্মঘটের ফলে রাজধানী পেট্রোগ্রাড্‌ নগরে ১৯১৭ সালের মার্চ্চে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ৯ই মার্চ্চে গুলি চলে কিন্তু ১০ই সৈনিকেরা আর আদেশমত শ্রমিকদের আক্রমণ করিতে চাহিল না। পরদিন এই নূতন ভাব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ১২ই মার্চ্চ সৈন্যদল বিদ্রোহী হইল—শ্রমিকেরাও ১৯০৫ সালের অনুকরণে তাহাদের সোভিয়েট্‌ গঠন করিয়া ফেলিল। অন্যদিকে ডুমার একটি সমিতি সমস্ত রাজ্যের ভার নিজের হস্তে লইল। ১৫ই তারিখে নিকোলাস্‌ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে রোমানভ্‌ বংশের রাজ-শক্তির উচ্ছেদ হইয়া গেল।

নূতন গভর্ণমেণ্ট ডুমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় কিন্তু পেট্রোগ্রাড্‌ সোভিয়েটেরও প্রচণ্ড ক্ষমতা রহিল। সোভিয়েটে এই সময় মেন্‌শেভিক্‌দের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাহারা নিজেদের হাতে দেশের শাসন ভার না পাইয়া গভর্ণমেণ্ট দ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লইবে এইরূপ ভাবিত। মেন্‌শেভিকেরা চিরকালই আপনাদের উপর সকল ভার লইতে ভয় পাইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মতে দেশ তখন সোসিয়ালিজ্‌মের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। অন্যান্য দেশের মত রাশিয়াতেও প্রথমে সাধারণ গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি অনিবার্য্য বলিয়া নিজেদের সান্ত্বনা দিতেছিল। এসারদিগেরও কোন স্থির সংকল্প ছিল না। একমাত্র বল্‌শেভিকেরা মার্চ্চের বিপ্লবে সন্তুষ্ট না থাকিয়া আরও অগ্রসর হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল।

এসার নেতা কেরেণস্কি দেশের কর্ণধার নিযুক্ত হইলেন বটে কিন্তু তদুপযোগী ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। দেশে বিপ্লবের স্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিতেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈনিকেরা চলিয়া আসিতেছিল—তাঁহাদের অধ্যক্ষদের আর তাহারা মানিতে চাহিল না। কৃষকেরা সুযোগ পাইয়া জমি দখলের চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রমিকেরা নগরে নগরে

সোভিয়েট্ গঠন করিল। অধীন জাতিগুলি মুক্তির চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই সময় বিদেশ হইতে প্রত্যাগত লেনিন্ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সোৎসাহে বল্‌শেভিক্‌বাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। পেট্রোগ্রাডে প্রতিদিন লেনিন্ বক্তৃতা করিতেন। তিনি চারটি প্রস্তাবে দেশের লোকের মন জয় করিলেন—যুদ্ধ এখনই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে; কৃষকেরা জমিদার-দিগের জমি দখল করিতে পারিবে; সোভিয়েট্‌গুলির হস্তে সমস্ত শাসন-ভার সমর্পণ করা প্রয়োজন এবং অধীন জাতিগুলি তাহাদের ইচ্ছামত শাসনের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। দেশের অবস্থা ও দেশের লোকের ইচ্ছা এইরূপে বুঝিতে পারিয়া লেনিন্ বল্‌শেভিক্‌দের আধিপত্য সম্ভব করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার অধীন সহকর্ম্মীদের কাহারও কাহারও দোষে জুলাই মাসে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে একবার বিপ্লবের চেস্টা হয়। তখনও ঠিক সময় আসে নাই—বিদ্রোহ বিফল হইল। লেনিন্‌কে তাহার ফলে ছদ্মবেশে আশ্রয় খুঁজিতে হইয়াছিল। এই অজ্ঞাতবাসের সময় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ—The State and Revolution রচিত হয়। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ লিখিবার পূর্ব্বেই কিন্তু তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতে হইল।

দূর হইতেও লেনিন্ তাঁহার বন্ধুদের সহিত যোগ রাখিয়াছিলেন। মস্কো ও পেট্রোগ্রাড্ সোভিয়েটে অবশেষে বল্‌শেভিক্‌দের সংখ্যাধিক্য হইল। এদিকে কেরেণ্‌স্কি দেশের শাসন-পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য একটি জাতীয় মহাসভা আহ্বান করিলেন। সমগ্র দেশে বল্‌শেভিকেরা মুষ্টিমেয় মাত্র। সেই জন্য সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন তাহাদের উপায় ছিল না। লেনিনের পরামর্শ মত বল্‌শেভিক্ নেতাগণ বিপ্লবের চেষ্টা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কেরেণ্‌স্কি ও মেন্‌শেভিক্‌দের দুর্ব্বল হস্ত হইতে দুই দিনের সঙ্ঘর্ষেই বল্‌শেভিকেরা সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারিলেন। (৬ই-৭ই নভেম্বর, ১৯১৭) লেনিন্ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

বল্‌শেভিকেরা তাহাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কৃষকদিগকে জমি ও অধীন জাতিগুলিকে মুক্তি দিয়া নিজেদের ক্ষমতা দৃঢ় করিয়া লইল। যুদ্ধের অবসান ঘোষিত হওয়ায় সাধারণ লোকে আনন্দিত হইল। দেশময় সোভিয়েট্ গঠিত হইল এবং তাহাদের মধ্য দিয়া অনেকাংশে শ্রমিকদের হাতে শাসনভার আসিয়া পড়িল। ১৯১৭ সালের নভেম্বরের বিপ্লবের ফলে বল্‌শেভিক্‌দের নেতৃত্বে এক সম্পূর্ণ নূতন যুগের এইরূপে সূচনা হয়।

শ্রীসুশোভন সরকার

বিজ্ঞানের সঙ্কট

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা নতুন যুগ আরম্ভ হ'য়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা' আলোচনা করবার আগে, বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

নিউটন্ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বল্লে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয় অনেক জিনিষ খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জান্‌তাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্পে বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদবৃদ্ধির জন্য কার্য্যকরী হ'তে পারে এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ-বিজ্ঞানের নিদর্শন-স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ ক'রে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক্ ও তাঁদের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা যে নিয়ম ও সত্যানু-সন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকেরা, জড় জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আন্‌বার চেষ্টায়, সেই রীতি ও নিয়ম-সমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড্ তাই এখনও পর্য্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়ম-কানুন যে জড় পদার্থের গতিবিধিতে লাগান যেতে পারে, তা' নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখ্‌ছি, তাদের পর-স্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাক্‌লে ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে, তা' আগে থেকে নির্দ্দেশ করা যায় কিনা, এইটেই হ'ল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তাঁর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে অনুসরণ ক'রে দেখালেন যে, আকাশের গ্রহ তারকা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট-বড় সব জিনিষের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে মেলে। আকাশের কোন্‌খানে দু'বৎসর বাদে কোন গ্রহের উদয় হ'বে, তা' আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে শত্রুব্যূহের মধ্যে ঠিক কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হ'য়ে পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা জড়পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এ-সব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল প্রসঙ্গের

অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম রীতির অনুবর্ত্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্য হ'য়েছেন।

এদিকে আবার প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জড়পদার্থের গঠন ও উদ্ভব-সম্বন্ধে গবেষণা চল্‌ছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানব মন ব্যগ্র ছিল। বহুদিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত্র বল্‌তে সক্ষম হ'য়েছে যে, বিরানব্বইটী আদি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্ব্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাণীদেহের উপাদান-সমূহ সবই ঐ আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণ-স্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিষ তৈরী ক'রে দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সব জিনিষ জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীব দেহে—মানব চক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে সমস্ত জিনিষ তৈরী করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় ব'লে মনে হ'ত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে যে, সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টী আদি ধাতুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর পুনঃ সংমিশ্রণে সেই সব জিনিষ নিজের পরীক্ষাগারে তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হ'য়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হ'য়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত এই যে, দৃশ্যতঃ কঠিন তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি; পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ু-স্বভাব মূলতঃ পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়-ভাবে উপনীত হ'বার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখ্‌তে হ'ল, যে-নিয়মে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চল্‌ছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কি না। রাসায়নিক বিরানব্বইটী আদি বস্তু আবিষ্কার করেছে, সে কথা আমি আগেই বলেছি। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে, টম্‌সন, রাদারফোর্ড্‌ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে, ঐ বিরানব্বইটী আদি বস্তুও আবার দুইটী মৌলিক উপাদানে গঠিত। তার একটী ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন্‌, আর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রণ্‌। প্রত্যেক রকম পরমাণুরই মূল উপকরণ এই দুইটী। যে-বিশ্লেষণে রাসায়নিক দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন রকমের জড় পদার্থের মূলে বিরানব্বইটী আদ্য ধাতু বর্ত্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করেই আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, আদি বস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুটী বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ওই দুই প্রকারের বিদ্যুৎ-কণার পরস্পর সংযোজনে ও সংমিশ্রণে যত রকম বিভিন্ন-ধর্ম্মী পদার্থের উদ্ভব হ'য়েছে, সেই যোজন-মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম-অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌর জগৎ যেমন সূর্য্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষায় বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাশির সমাবেশে গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতিও তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভিতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশি। এরি চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন কক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেক্‌ট্রণ্‌ ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ, বহিঃকক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদি বস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু-গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষার ইলেকট্রণ্‌-সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর অণুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রণ্‌ বিরাজমান। রাদারফোর্ড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন, এবং এই গঠন-প্রণালীর ফলে যে আদিবস্তুর অনেক ধর্ম্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেক্‌ট্রণ্‌ ধনাত্মক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে, সে-বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি।

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা আবার কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন, যা আমাদের এ-স্থলে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যতঃ ঘন-কঠিন বস্তুও মূলে কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি ব'লে প্রতীয়মান হ'ল, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই চিরচঞ্চল অণুরাশির ঘাত-প্রতিঘাত ও তাদের গতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য বাহ্যাবস্থার কারণস্বরূপ ধরতে হবে। আগুনের মধ্যে একটি ধাতুযষ্টির একপ্রান্ত রাখলে আগুনের বাইরে অন্য দিকও যে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে, এর কারণ, তাঁদের মতে, অনেকটা এই; অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতর অণুর সংঘাতে পূর্ব্বেকার অপেক্ষাকৃত শীতল ধাতুদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অণুগুলির গতি আরও চঞ্চল হ'য়ে উঠে; সেই চাঞ্চল্যের বেগ ক্রমশঃ ঘাত-প্রতিঘাতে বাহিরের দিকে সংক্রামিত হয়।

উত্তাপের পরিমাণ বস্তু-অণুদের চাঞ্চল্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁরা উত্তাপভেদে বস্তুর যে অবস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদের গতির তারতম্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ এই ক্ষেত্রে খাটান যায় কি-না, সে বিষয়েরও আলোচনা সুরু হ'ল এবং তাতে তাঁরা কতকটা কৃতকার্য্যও হ'লেন। এখানে অবশ্য মনে রাখ্‌তে হ'বে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান যে রকম ক'রে নক্ষত্রের বিষয়ে লাগান গিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবে সে নিয়ম-গুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের বিষয়ে লাগানো একরূপ অসম্ভব। আমরা দেখেছি যে, গ্রহ ও জড় বস্তুর অবস্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গণনার জন্যে সেই বস্তুগুলির উপস্থিত সন্নিবেশ ও গতিবিধি জানা দরকার। কিন্তু অণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবুও, তা সত্ত্বেও গতি-বিজ্ঞান যে নির্দ্দিষ্ট কিছু বল্‌তে পারে ব'লে আমরা মনে ক'রে থাকি, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি মুখ্যতঃ এই—বহু কোটী সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি নিয়ে স্থূল জড় পদার্থ। জড় পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনা করতে গেলে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অণুটীর অব-স্থানের সঠিক খবর জানা বিশেষ প্রয়োজন নয়, সাধারণ কয়েকটীর আচরণ আমরা গতিবিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই বল্‌তে পারি, অনেক সময় উত্তাপ-বিজ্ঞানের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেমন একটী দেশে—যেখানে কোটী কোটী লোকের বাস—প্রত্যেক লোকের জীবনের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে না জেনেও দেশের আর্থিক হিতাহিত ও জন্মমৃত্যুর গড়পড়তা হারের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায় যেটা সাধারণতঃ নির্ভর ক'রে সে দেশের জল-বায়ুর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে আমাদের কাজে লাগে এবং সে সকল বিষয়ে আমরা যেমন একটা হিসাব-নিকাশ খাড়া করতে পারি, অণুসমষ্টির গতি-বিধির নিয়মের গণনাও অনেকটা সেই রকম।

নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের মত অমোঘ, এই বিশ্বাসের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ ও স্থূল জড়ের বিষয়ে সেই নিয়ম খাটিয়েছিলেন। গণনার সহিত ঘটনার সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রথমে ধারণা জন্মেছিল যে, প্রত্যেক আদর্শ বৈজ্ঞানিক নিয়মই ঐ রকম অনতিক্রমনীয় ও অটল হ'বে। কিন্তু উত্তাপ বিজ্ঞানের নিয়মের বিষয়ে সে নিশ্চয়তা যে খাটে না, তা' আগেকার কয়েকটা কথা থেকেই বোঝা যাবে। পরমাণু অতিক্রম ক'রে আজ যখন বৈজ্ঞানিকেরা ইলেক্‌ট্রণ্‌ ও প্রোটনের সমষ্টি হিসাবে সমস্ত জড় জগতকে দেখ্‌তে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝা শক্ত হ'বে না যে, আজ তাঁরা বিদ্যুতের আদি-ধর্ম্ম থেকে যে সব জাগতিক নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসারে, উপনীত

হচ্ছেন, সেগুলিকে আর জ্যামিতিক নিয়মের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসান সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী কতকগুলি নিয়ম-রূপেই সেগুলিকে দেখ্‌তে হ'বে। জ্যামিতিক নিয়ম ও পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক-গুলি নিয়মের মধ্যে তফাতের কথা পরে আরো বলার ইচ্ছা রইল।

ইলেক্‌ট্রন্‌ ও প্রোটন্‌ কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতি ক্ষুদ্র ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরো ছোট প্রোটন্‌ বা ইলেক্‌ট্রণের আয়তন ও আকৃতিও আমরা সেইরূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডগুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশী যে, জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থরিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম্ম অনুশীলন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে, আলোককে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গ বিশেষ ব'লে ভাবলে এই শাস্ত্রের অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেলো যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথার-নামে একটা বিচ্ছেদহীন, অখণ্ড পদার্থ। পরমাণু বা বিদ্যুৎকণা সেই ঈথার-সমুদ্রে ভাসমান। আলোকরশ্মি এই ঈথার-সমুদ্রের তরঙ্গ বিশেষ। এই সমুদ্রে ছোটবড় নানা রকমের ঢেউ উঠতে পারে, এবং সকল ঢেউ রিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্র গতিতে ধাবমান। আলোর বর্ণভেদের কারণ ঢেউএর দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যে-সকল ঢেউএর স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তাদের চেয়েও অনেক বড় ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। ঈথারে তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশ পথে যে বেতারে নিমেষের মধ্যে এক স্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কার্য্যে বার্ত্তাবহ ঈথারের ঢেউ। এগুলি আলোকের ঢেউএর চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে রঞ্জনরশ্মি আজকাল রোগনিদানের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিও ওই ঈথারের তরঙ্গমাত্র, তবে সেগুলি আলোর ঢেউএর তুলনায় অনেক ছোট।

এক পরমাণু ও অপর পরমাণুর মধ্যে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা ও পৃথিবীর মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথার সকলকে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত ক'রে রেখেছে। ঈথার-তরঙ্গেই আমাদের কাছে চন্দ্র তারা

নীহারিকা হ'তে আলো আসছে। এই পথেই আমরা সূর্য্যের কাছ থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, যে-শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখ্‌ছি, সে-সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার-পথে আনীত সূর্য্যের কিরণরাজি। আলোক তরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধ'রে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথার-তরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন্-ইলেকট্রণের পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণেই যে জগতের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন-ধর্ম্মী জড়ের বিকাশ হ'য়েছে ও তার লীলাখেলা চলছে, এইটা আজকে পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রতিঘাতের ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের মূল সূত্রগুলির অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের যে-ক্রমোন্নতির ও বিকাশের কথা বলেছি, তা নিউটন্ থেকে আরম্ভ ক'রে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত মানব-প্রতিভার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ ক'রে গণিতকারেরা গতিবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই ওই গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। ফলে তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি নিউটনের গতিবিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিক্রম হ'তে পারে, তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যার যে দু-একটির উত্তর তখনো মেলেনি, তার জন্য তাঁদের গণনার অক্ষমতাই দায়ী,—নিয়মগুলি কিন্তু 'সর্ব্বকাল ও সর্ব্ববিষয়েই প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই জন্যেই তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত ধ্রুব মনে করতেন এবং ভাবতেন, নিয়মমাত্রেই ওই একই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশঃ যখন পরমাণুবাদ ও ইলেকট্রণ্‌বাদের উদ্ভব হ'ল, যখন উত্তাপবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্য্যায়ের ব'লে তাঁরা দেখতে পেলেন। তখন ওই নিয়মগুলি যথার্থ কি, সে-বিষয়ে চিন্তা করতে সুরু করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বিশেষ করে, এই সব কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হ'ল। আলোকবিজ্ঞানের চর্চ্চা করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয়সঙ্কটে এসে পড়লেন। অন্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যে-সব নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন, আলোকশাস্ত্রে সেগুলিকে লাগাতে গিয়ে তাঁরা যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত

হ'লেন, সেগুলি পরীক্ষার ভুল ব'লে সাব্যস্ত হ'ল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান-অনুসারে আলোকতরঙ্গের সহিত পরমাণুদের ঘাতপ্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে, তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন, পরীক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল। ফলে ১৯০০ সালে প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত Quantum theory বা শক্তিকণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটি বলতে গেলে ব্যাপারটি এই। যদিও আলোক-বিজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগুলি আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্লাঙ্ক দেখালেন, যখন আলোকের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরমাণু আলোকতরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে আলোক সৃষ্টিকালে পরমাণুর কার্য্যশক্তি ঈথারে অর্পিত হয়, তখন আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলির কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। আলোকপথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোকরশ্মির মধ্যে যখন শক্তির আদান-প্রদান ঘটে, তখনকার সমস্যার সদুত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায়না। সেই সময়ে বরং আলোক শক্তিকণার সমষ্টি, এইভাবের একটি কল্পনার দরকার হয়।

যেমন রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ও বিশ্লেষণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, জড়ের পরমাণুবাদের কল্পনা আমাদের করতে হ'য়েছিল, আলোকের উৎপত্তি ও আলোকরশ্মি থেকে জড়পদার্থের শক্তি আকর্ষণের ধর্ম্ম বিচার করতে গিয়ে তেমনি আলোককণাবাদে উপস্থিত হ'তে হ'ল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন আলোককণার সমষ্টি, এইটিই Quantum theory-র মূল কথা। আলোকের স্পন্দন-সংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে; এবং জড়ের পরমাণু কিংবা ইলেকট্রণ্ যখন আলোক থেকে শক্তি আহরণ করে তখন আলোক থেকে এই একটি আলোককণার তিরোধান ঘটে। পক্ষান্তরে, জড় পদার্থ থেকে স্বতন্ত্রভাবে শক্তি অর্জ্জন করে, একএকটি আলোককণা উদ্ভূত হয়। এই ভাবের কল্পনা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের একেবারে পরিপন্থী। নিলস্ বর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গত কয়েক বৎসর চেষ্টা করছেন, কি ক'রে এই আলোককণাবাদের সহিত পূর্ব্বযুগের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হ'বে।

আলোকবিজ্ঞানের উভয় সঙ্কটের কথা মুখ্যত এই :— আলোকের প্রবাহের বিচার করতে গিয়ে যে-সব প্রশ্ন ওঠে, সেগুলির সমাধান তরঙ্গবাদেই মিলে; এখানে কণাবাদ অচল। পক্ষান্তরে, আলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কণাবাদই

এ-ক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর সুচারুরূপে দিতে সমর্থ। তরঙ্গবাদ এখানে মোটেই চলেনা। গত চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার বিদ্যুৎকণার বিষয়ে কতকগুলি নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি ; তার ফলে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হ'য়ে উঠেছে। ইলেক্‌ট্রণ্‌কে যদিচ আমরা স্বল্পায়তন কণারূপে কল্পনা ক'রে আসছিলুম, তবু টমসন-গারমার-প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন যে, সময়-বিশেষে ইলেক্‌ট্রণের স্রোতকে তরঙ্গ-ধর্ম্মী ব'লে মনে হয়। আলোকতরঙ্গ যেমন সময়-বিশেষে বিচ্ছুরিত হ'য়ে বর্ণচ্ছত্রের সৃষ্টি করে, ইলেক্‌ট্রণের স্রোত অনেক সময়ে সেইরূপভাবে জড়পদার্থের উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে একটা বিপ্লব হ'য়ে গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে আর আগেকার মত কল্পনা করা চলবেনা। যাকে এতদিন অত্যল্পায়তন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা ব'লে ভেবে আসা যাচ্ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আলোক-তরঙ্গকে ঢেউ সমষ্টি ব'লে কল্পনা করলে ভুল হ'বে, কারণ অনেক সময়ে সেটি ঠিক জড়ের মত কণাসমষ্টিরূপেই ফলোৎপাদন করে।

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও তাদের উচ্চাসন অটল রাখতে পারছে না। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণুর রাজ্যে অচল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ ও অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এত বড় ইমারৎ খাড়া করা হ'য়েছে, তার ভিত্তিগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা বা বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরী করার ন্যায়-সঙ্গত প্রয়াস, সে-বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান ও সময়-নির্দ্দেশ-সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ, এই মাপজোপের উপরেই গতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ; আমরা যখন সেগুলির মাপজোপ করি তখন কি কি প্রচ্ছন্ন জিনিষকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিই, তারও অনুসন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা হ'ল বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ। সাফল্যের উন্মাদনায়, নিত্যনতুন আবিষ্কারের লালসায়, উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত জিনিষকে বিশেষ বিচার না ক'রেই ধ'রে নেওয়া হ'য়েছিল, এখন বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সঙ্গে ভালো ক'রে বোঝাপড়া করতে। এই বোঝাপড়ার বিষয়ে পরে কিছু বলবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

শিল্পীর ব্যথা

ইউরোপের এক বিখ্যাত শিল্পাগারে চিত্রকরের চিত্রশালার একটি আলেখ্য আছে। শিল্পীর আঁকা নানা আকারের নানা চিত্র দেওয়ালে ইতস্ততঃ ঝোলান। সকলগুলির বিষয় ভাল বোঝা যাচ্ছে না। উঁচু খোলা জানালা থেকে আলো এসে ঘরখানি আলোকিত। চিত্রাধারের উপরে একটি যুবতীর অসমাপ্ত চিত্র। নিম্নের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অতি যত্নের সহিত আঁকা ও সেগুলির সৌন্দর্য্য ক্লাসিক্ গ্রীক্ ভাস্কর্য্যের মত নিখুঁত। মুখখানি আঁকতে আরম্ভ করা হ'য়েছে, অতি নিপুণ হাতের টানে মুখের রেখা-চিত্রখানি টানা, দু'চারটি বর্ণের আঁচড়ও দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু চিত্রকর যা ফোটাতে চাচ্ছিলেন, তা পারছেন না। তাই হতাশ হ'য়ে তুলিটি ফেলে দিয়েছেন। তিনি গভীর অবসাদ-ভরে একটি চৌকির উপর বসে পড়েছেন, অবিন্যস্ত হাত-পায়ের ভঙ্গীতে নিরাশা ফুটে উঠেছে। চোখদুটি মুদ্রিত। খোলা জানালা দিয়ে সোনালী আলোর স্রোতে কলালক্ষ্মী প্রবেশ করছেন। আলোর স্রোতে তাঁর স্বচ্ছ অবয়ব ও স্ফুরিত বসনের প্রান্ত ঈষৎ বোঝা যাচ্ছে ; মুখে গভীর অনুকম্পা, চাঁপার কলির মত দীর্ঘ অঙ্গুলিগুলির প্রান্ত দিয়ে তিনি শিল্পীর ললাট স্পর্শ করছেন ও ফলে মুদ্রিত-নয়ন শিল্পীর মুখের উপর একটি গভীর আনন্দ ও সাফল্যের জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত। এদিকে শিল্পীর সর্ব্বদেহে অবসাদ ও নিরাশার ছাপ। চিত্রখানির চমৎকার শিল্প-চাতুর্য্যে মুগ্ধ না হ'য়ে থাকা যায় না। পূর্ব্ব সৃষ্ট চিত্রগুলি শিল্পীকে ঘিরে রয়েছে, অথচ সেগুলি তাঁর কাছে সুদূর ও অস্পষ্ট। তাঁর চোখের সামনে ভাসছে চিত্রাধারের উপর ওই যুবতীর অসম্পূর্ণ চিত্রখানি। চিত্রের পশ্চাতে কোন পটভূমি নেই, তুলনার অন্য কোন বস্তুই নেই, স্রষ্টা ও দর্শকের সমস্ত মন অধিকার করে শূন্যের উপর এই বৃন্তহীন সৌন্দর্য্য-শতদলটি বিকশিত। যতটুকু আঁকা হ'য়েছে তার অঙ্কন-চাতুর্য্য একেবারে নিখুঁত। গোল বেধেছে আননশ্রীর উপর ভাব-ব্যঞ্জনা করতে গিয়ে। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলা শক্ত কথা নয় কিন্তু শিল্পী চাচ্ছেন মুখের উপর এমন একটি ভাব ফুটিয়ে তুলতে যাতে যেভাবের স্রোতে এই সৌন্দর্য্য-কুসুমটি ভেসে এসেছে, তার গতি প্রকাশ পায়। যেটিকে অবলম্বন ক'রে এই সুন্দরীর বিচিত্র জীবন গন্ধে-রসে-ভোগে-আনন্দে-ব্যথায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, সুন্দরীর জীবনের সেই মূলসূত্রের সন্ধানে শিল্পী বেরিয়েছেন। তিনি মানুষের মনে সেই কুহকদণ্ডটি ছোঁয়াতে চান যাতে তার যুগযুগান্তব্যাপী সুপ্ত অতৃপ্ত বাসনারাশি মুহূর্ত্তে জেগে উঠে, শিরায় শিরায়, প্রতি রক্তকণিকায়, জীবকোষের অন্তরতম অন্তঃপুরে, আনন্দ-

বেদনের তীব্র শিহরণ আনে। হায়! দুঃসাহসী শিল্পীর আকাঙ্ক্ষা তাকে কোন শান্তিময় অধিত্যকা থেকে কোন দুরারোহ বিপৎসঙ্কুল শৈলশিখরে তুল্‌লে। আশ্চর্য্য কি যে, শিল্পী গভীর নিরাশায় তুলিকা ত্যাগ করেছেন।

একটি ক্ষুদ্র নারীমূর্ত্তি আঁকতে গিয়ে শিল্পী অজ্ঞাতে কোন রহস্য-সঙ্কুল বাসনার, নিরাশার, গভীর তৃপ্তির, অসীম তৃষ্ণার রাজ্যে, অন্ধকার স্বপ্ন-পথে কোন তীব্র আনন্দের ও তীব্রতর যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছেন। শিল্পীর সুদীর্ঘ অন্তর জীবনের যে বহু বিচিত্র অভিঁজ্ঞতার ও আনন্দ-বিষাদের সরোবরে সৌন্দর্য্য-শতদলটি ফুটেছে, এই ক্ষুদ্র নারী মূর্ত্তিটির ছোট মুখের উপর তার বৈচিত্র্য, তার স্বাদ, তার উন্মাদনা, কি ক'রে তিনি ফুটিয়ে তুলবেন? নিরাশা, অবসাদ ত আসবেই। রসায়নশাস্ত্রে বলে, বিভিন্ন গ্যাসের সমবায় মাত্র-একটি বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গে নিমেষে এক নূতন পদার্থে পরিণত হয়। মনরাজ্যেও এমনই একটা কিছু বিপ্লব ঘটে। তাকে মানুষের অক্ষম ভাষায় বলে দৈব-প্রেরণা। এই বিপ্লব-মুহূর্ত্তে কত জন্ম সঞ্চিত, কত ভিন্ন স্থানে আহৃত সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, কল্পনা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা একীভূত হ'য়ে একটি অখণ্ড, গভীর, ব্যাপক আনন্দানুভূতিতে পর্য্যবসিত হয় ও এই আভ্যন্তরিক প্রলয়ের বিজলী-ঝলকে এইরূপ আনন্দময়ী মূর্ত্তি অবভাস হয়। এই অবভাস যেমনই আকস্মিক তেমনই তীব্র ও ক্ষণিক। কিন্তু এ-মূর্ত্তি শিল্পীর অন্তরে অগ্নিরেখায় ক্ষোদিত হ'য়ে যায়, এর স্পর্শে তার অন্তঃপ্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়। একটা নূতন আলোকে জগৎ মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে, একটা অব্যক্ত উন্মাদনায় শিল্পীর শান্তি নষ্ট হয়। শত সহস্র পূর্ব্ব-জীবনের আনন্দ-বেদনা এক মুহূর্ত্তে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে একটা মধুর অব্যক্ত তীব্র অবর্ণনীয় স্মৃতি রেখে মিলিয়ে যায়। এই অনুভূতি এমনই তীব্র ও এমনই ক্ষণিক যে, শিল্পী সারা জীবন তার মোহ ভুলতে পারেন না, চিরকাল চেষ্টা করেন তবুও আর সে অনুভূতি ফিরে পান না। কিন্তু চেষ্টারও বিরাম থাকে না। ব্যর্থতার আক্রোশে, নূতন উদ্যমে নব নব শিল্প সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকেন কিন্তু সর্ব্বদাই ব্যর্থ হন। লক্ষকোটি বৎসর ধ'রে, যুগযুগান্ত ব্যেপে জন্ম-মৃত্যুর ছন্দে আবর্ত্তন করতে করতে শিল্পী কণায় কণায়, রেখায় রেখায় যে সৌন্দর্য্য যে সৌষ্ঠব-জ্ঞান আহরণ ক'রে এসেছেন, প্রাণের উৎসে বিন্দু বিন্দু ক'রে যে তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতায় জীবনের গাগরী ভরেছেন, আজ তাঁর অস্তিত্বের চরম মুহূর্ত্তে সেই সকল সঞ্চয়, সেই সকল কল্পনা একীভূত হ'য়ে এই কল্প-লোক-দুর্লভ সৌন্দর্য্যের, আনন্দের বিদ্যুৎ-বিলাস-রূপে আত্মার অন্তঃস্থলে চমকিত হ'ল। একটি মুহূর্ত্তে তাঁর চিরকালের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, তাঁর জন্মজন্মান্তরের তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হ'ল। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর মানসনয়ন ঝল্‌সে গেল, মনে হ'ল যেন তাঁর আত্মা

পরম চরিতার্থতা লাভ করেছে। তারপরই মনে হ'ল এই মুহূর্ত্তটি ত নিমেষে মিলিয়ে গেল! এই পরম মুহূর্ত্তটিকে ধ'রে রাখবার, ও সুদীর্ঘ ক'রে চেখে' চেখে' ভোগ করবার ইচ্ছা হ'ল;—চেষ্টা করলেন,—শিল্পীর এই নিরাশা ও অবসাদ তারই ফল। শিল্পী যদি যথার্থ রসজ্ঞ না হ'তেন তাহ'লে হয়ত তুলিকার কয়েকটি পদ্ধতিসম্মত টান দিয়ে চিত্রখানি সম্পূর্ণ করতেন ও মানবসাধারণ হয়ত সেই শিল্পকীর্ত্তির প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠত। তিনি যথার্থ শিল্পী বলেই এমন গোঁজামিল দিয়ে লোক-সমাজকে ঠকাতে চাননি—চিত্রটিও সম্পূর্ণ হয় নি। কলালক্ষ্মীর আবির্ভাব ও ভক্তের ললাটে স্নেহকরুণ স্পর্শের দ্বারা সেই পরম মুহূর্ত্তটির পুনরুদ্বোধনের ভিতর রোমাণ্টিক্-সম্প্রদায়-সুলভ একটা খেলো ভাব-প্রবণতা আছে। থাক্, শিল্পীর এই দুর্ব্বলতায় আমাদের ভিতরের রসলোলুপ মানুষটি বরং সায় দেয়, আমাদের একটু ভালই লাগে। এই দুর্ব্বলতাটুকু না থাক্‌লে শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে হয়ত চিত্রখানিতে খুঁত থাকত না, কিন্তু রসসৃষ্টির হয়ত একটু হানি হ'ত।

শিল্পীর জীবনে দৈবপ্রেরণার সেই পরম অনুভূতিটি ত মুহূর্ত্তেই আসে ও মুহূর্ত্তেই যায়, কোন চেষ্টাতেই তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। বড় জোর তার একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, একটি বর্ণহীন ছায়া মাত্র পাওয়া যায়, এবং শুধু শিল্পীই অনুভব করে এগুলি কত অপ্রাকৃত, কত অসত্য। কোনরূপেই এই অবর্ণনীয় স্বপ্নসুন্দর মুহূর্ত্তটির, এই বিচিত্র তীব্র অলৌকিক অনুভূতির চিত্রটিকে স্থায়ী করা যায় না—যাতে তাকে চেখে' চেখে' ভোগ করা বা বিশ্লেষণ করা চলে। যুগ-যুগ-ব্যাপী কির্ত্তনের পথে এই বিপুল বিশ্ব শিল্পীকে যত প্রকারে স্পর্শ করেছে, আহ্লাদে বিকশিত করেছে, সঙ্গীতে মুখর ক'রে তুলেছে, রসে সিঞ্চিত করেছে, আনন্দে অনুপ্রাণিত করেছে, এই একটি মুহূর্ত্তের অনুভূতির উত্তাপে সে সমস্তই যেন দ্রবীভূত হ'য়ে, বিশ্বের ও শিল্পীর অন্তরাত্মার নিবিড়তম মিলনে বিজলীচপল একটি অপূর্ব্ব অখণ্ড আনন্দের আবির্ভাব হয়। ক্ষণপ্রভার মতই মুহূর্ত্তটি মিলিয়ে যায় এবং বিশ্বজগৎ ও শিল্পী আবার পূর্ব্বের সহজ অবস্থায় ফিরে আসে। বিশ্বজগতের উপর কিন্তু একটা অপূর্ব্ব আলোকের আভা থেকে যায় ও শিল্পীর মনে সেই পরম মুহূর্ত্তটি ফিরে পাবার জন্য একটা দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা সমস্ত যুক্তি-বিচারের বাধা অবহেলা ক'রে জেগে উঠে। শিল্পী বোঝেন যে, সে মুহূর্ত্তটি ফিরে পাওয়া যাবেনা, কিন্তু আত্মার ক্ষুধা ত বুদ্ধির ভ্রূকুটিতে মিটেনা। অবুঝ শিল্পী সহস্রভাবে, সহস্র দিক্ দিয়ে সেই আনন্দ ফিরে পেতে চেষ্টা করেন—চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নানা শিল্পে সেই দুর্লভ লাভের চেষ্টা ফুটে উঠে। হয়ত সে আনন্দের দুই-একটি রশ্মি ক্ষণেকের জন্য

পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়ে তোলে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্যই। এই সকল ব্যর্থ প্রয়াসের উপেক্ষিত নিদর্শনেই পৃথিবীর শিল্পাগারগুলি পূর্ণ।

দৈবানুপ্রেরণার পরমানন্দময় মুহূর্ত্তটি যে ফিরে পাওয়া যায় না, এ দুঃখ সকল প্রকৃত শিল্পীর অদৃষ্টেই অবশ্যম্ভাবী। এ দুঃখ যে কি, তা' যিনি ওই আনন্দের মধুর তীব্রতা ভোগ করেননি, তাঁর পক্ষে বোঝা শক্ত। সুধায় ভরা স্নিগ্ধ পাত্রটি কে যেন ওষ্ঠাধরে তুলে দিয়েছে, একটি চুমুকে চিরজীবনের সকল অতৃপ্তির যেন অবসান হ'য়ে গেল, আর তারপরেই কোন নিষ্ঠুর দুর্দ্দৈব নির্ম্মম হস্তে সেটি চিরকালের জন্য অপসারিত করলে। সে-সুধার আস্বাদ এখনও ওষ্ঠাধরে লেগে রয়েছে, আর একটি চুমুকের জন্য অন্তরাত্মা উন্মুখ, কিন্তু প্রাণপাত ক'রেও কেবল তার স্বাদহীন বিকার ছাড়া কিছুই মেলে না। কি অসীম ব্যথা, কি গভীর যন্ত্রণা! এ-ব্যথায় সমবেদনা মেলে না। যে এই সুধার আস্বাদ না পেয়েছে সে ব্যতীত এ দুঃখ কে বুঝবে? শিল্পীর ব্যর্থ প্রয়াসের নিদর্শনগুলিকে নির্ব্বোধ মানব যতই প্রশংসা করে, শিল্পীর ব্যথা ততই বেড়ে যায়। এ কি অভিশাপ প্রতিভার প্রতি!

আকাঙ্ক্ষিত অনুভূতি ফিরে পাওয়ার প্রয়াসে, শিল্পী অনেক সময় তাঁর অন্তরের মর্ম্মস্থলে আঘাত দেন ও নব নব অনুভূতির আনন্দ লাভ করেন; হয়ত পূর্ব্বানুভূত আনন্দের মতই এটা গভীর ও ব্যাপক, প্রতি অনুভূতিটিই নূতন, কিন্তু পুরাতনটি অন্তরের মধ্যে বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত করে-আর জেগে ওঠে না।

শিল্পীরা আপনাপন শিল্পসৃষ্টির মূল্য বোঝে না ব'লে দোষ দেওয়া হয়। শিল্পসৃষ্টিগুলি অন্তরের প্রতীতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র, এবং শিল্পীরা এগুলিকে তাঁদের অন্তরের অনুভূতির দিক্ দিয়েই দেখেন। জনসাধারণ ও সমালোচকেরা এই শিল্পসম্পদ্ থেকে যে আনন্দ আহরণ করেন, তারই অনুপাতে এগুলির বিচার করেন। এ দুই বিচার সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, স্রষ্টা-শিল্পীর ও রসবিৎ সমালোচকের ভাষা যেন বিভিন্ন, দুজনের পরস্পরকে বোঝা একরূপ অসম্ভব ব'লেই বোধ হয়। নিজের যে-সব সৃষ্টি দৈবানু-প্রেরণার পরমানন্দের একটুকুও তাঁর মনে জাগায়, শিল্পী সেইগুলিকেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করেন। অথচ এগুলি দেখ্‌লে সমালোচকের মনে হয়ত সেরূপ কোন আনন্দই জাগে না। ভুল-বোঝার প্রতিকার আছে, ভুল-অনুভূতির, ভুল-প্রতীতির কোন প্রতিকার নেই; সকলের চিত্তের অনুভূতিশক্তি ত সমান নয়।

চিন্ময় আনন্দের এই পরম অনুভূতিকে বাইরে প্রকাশ করতে গিয়ে, লোকসাধারণকে তার আস্বাদ দিতে গিয়ে শিল্পী যে কেবলমাত্র সেই পরম মুহূর্ত্তগুলি ফিরে পেতে পারেন না ব'লে দুঃখ পান তাই নয়, বহিঃপ্রকাশের

জন্য যে-সকল উপকরণ-সামগ্রীর ব্যবহার অনিবার্য্য সেগুলিও তাঁর দুঃখের কারণ হ'য়ে উঠে। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত সৌন্দর্য্য ও আনন্দের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি এক মুহূর্ত্তে একত্রে মিলে, গ'লে গিয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে, তাকে সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের অগভীর অভিজ্ঞতার ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। শিল্পশাস্ত্রের পরিভাষায়, সঙ্গীতের সুরে, চিত্রের স্থির রেখা-বেষ্টনে, নৃত্যের চপল রেখার হিল্লোলে সেগুলিকে প্রকাশ করতে যাওয়া, দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুকে একত্রে সমাবেশ করার প্রয়াসের মত একরূপ অসম্ভব, অথচ এই অসম্ভবকেই শিল্পী সম্ভব করতে চান। এর ফল কি কখনও শিল্পীর পক্ষে সন্তোষকর হ'তে পারে?

প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের মনের ভাবটি, সেই আনন্দ, গর্ব্ব, তৃপ্তি, ব্যাকুলতা, বেদনা, আশা, নিরাশার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ কি কোন কবি, কোন চিত্রকর, কোন সঙ্গীত-রচয়িতা প্রকাশ করতে পেরেছেন? প্রেমাস্পদের স্পর্শটির মধ্যে কি মোহ আছে—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সংমীলয়তি চ ॥

এই অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় ভাবটিকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে কবি নিষ্ফল কাতরতায় ব'লে উঠেন—

Ce qu'on dit, c'est si vide.
Je cherche, je cherche un moyen. . .
J'ai besoin de exprimer d'expliquer, de traduire.
On ne sent tout a fait que ce qu'on a su dire.
On vit plus ou moins a travers des mots.
J'ai besoin de mots, d' analyses.
Il faut, il faut que je te dise. . .
Il faut que tu saches. . . Mais quoi!
Si je savais trouver des choses de poete,
en-dirai-je plus—reponds—moi—
que lorsque je te tiens ainsi, petite tete,
et que cent fois et mille fois.
je te repete eperdument et te repete:
Toi! Toi! Toi! Toi!

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-সাধনের জন্য সৃষ্ট ভাষা প্রেমের মত সাধারণ অনুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে যদি এমনই বিফল হয়ে আসে, তবে দৈবানুপ্রেরণার মত বিরল অথচ সহস্র মানবীয় প্রেমের অপেক্ষা তীব্র, কেন্দ্রীভূত আনন্দস্ফুলিঙ্গকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর বিফলতা

গভীর নিরাশায় পরিণত হবেই! এই পরম মুহূর্ত্তে শিল্পী তাঁর পার্থি প্রকৃতি ও আবেষ্টনকে অতিক্রম ক'রে অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে উপনীত হন।

এই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তটিকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পীকে যে-সকল উপাদানের সাহায্য নিতে হয়, তাদের স্থূল সীমারেখাগুলিকে না মেনে উপায় নেই। চিত্রকরকে আলোক-বিজ্ঞানের নিয়ম, বর্ণ-বিশ্লেষণ ও সংযোজনের নিয়ম ভাল রকম জানতে হয়, রেখা-প্রক্ষেপের দক্ষতা অর্জন করতে হয় ও সহস্র ছোটখাট কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন করতে গিয়ে প্রচুর শক্তির অপচয় করলে, শিল্পীর সৌন্দর্য্য-স্বপ্নভোগের আনন্দ ও তন্ময়তার আর কি অবশেষ থাকে। ফলে সৌন্দর্য্য-স্বপ্নবিভোর অপার্থিব সুকুমার শিল্পীকে জগৎ চেনে না, চেনে ব্যবহারিক জগতের স্থূল, বিজ্ঞানদক্ষ, সুচতুর, কৌশলী কারুকে। শিল্পীর জীবনে এটা একটা বিরাট দুঃখ—তাঁর সৌন্দর্য্যানুভূতির পরম মুহূর্ত্তগুলি ফেরে ত না-ই, তার যে অস্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া, ক্ষীণ স্মৃতিটি থাকে তাকেও বাইরে আকার দান করতে গেলে এতগুলি অপ্রত্যাশিত স্থূল বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রয়োজন যে, তাঁর সুকুমার শিল্পী-প্রকৃতি তার ছাপে নিঃসন্দেহ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জার্ম্মাণ চিত্রকর ড্যুরার নির্দ্দোষ রেখা-ঙ্কনের উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে প্রতিভার কতখানি অপচয় করেছেন তাঁর চিত্রের ভাব-ব্যঞ্জনার স্ফূর্ত্তির অভাবে তা' প্রকাশ পায়। যান্ত্রিক কৃতিত্বের সাধনা প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতিভার উৎসমুখে একটা জগদ্দল পাথর-রূপে চেপে থাকে, তাঁর ক্ষমতাকে পঙ্গু ক'রে রাখে। কাজে কাজেই শিল্পী যা' উপলব্ধি করেছেন তা' ত প্রকাশ করিতে পারেন না-ই, যে উপলব্ধির যে অস্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া তাঁর স্মৃতিপটে আছে তাকেও বাইরে আকার দিতে পারেন না, বাইরের স্থূল উপকরণগুলি যা' প্রকাশ করতে সক্ষম তাই তিনি তাঁর প্রতিভার রঙে রাঙিয়ে প্রকাশ করেন। দুর্লভ অনুভূতির, দুরূহ সাধনার কি শোচনীয় পরিণতি! শিল্পীর এ-ব্যথার কি পরিমাণ আছে! নানা দেশের শিল্পাগারে যে অমূল্য শিল্প-সম্পদ্ সঞ্চিত রয়েছে, সেগুলিতে শিল্পীর সৌন্দর্য্য-স্বপ্নের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু শিল্পের অনাবিল আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উপর নির্ম্মম জড়-প্রকৃতির নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্যের পরিচয়। যাঁদের সৃষ্টি এগুলি, তাঁরা যে এগুলিকে অবহেলার চক্ষে দেখেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি! এগুলি ত তাঁদের মানস নয়নের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি নয়, তাঁরা যা' প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তা' নয়, এগুলি শুধু বাইরের বর্ণ, পট, পাথর বা সুর, তান, লয় যেটুকু প্রকাশ করতে পারে সেটুকুরই নিদর্শন। শিল্পী এ দুইএর

পার্থক্য ভালই বোঝেন, তাই যা' প্রকাশ করতে পারেন না, কতকগুলি সাঙ্কেতিক ভঙ্গীর দ্বারা তার নির্দ্দেশ করেন। অবনত-জানু পূজারিণীর উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষু-তারকা, প্রেমিকের নয়নের আনন্দজ্যোতিঃ, আনম্র-শিরঃ নিবেদিতা—এ সকল ভঙ্গী কি দর্শকের মনে ভক্তির শান্ত গভীর আনন্দ, প্রেমের বিহ্বলময় উন্মাদনা, বা আত্মনিবেদনের অসীম পরিতৃপ্তি জাগিয়ে তোলে? এগুলি কেবল চিরকাল-সম্মত সঙ্কেতে পরিণত হ'য়েছে। এই সকল সঙ্কেতের পূর্ণ অর্থ, "ফ্রি-মেসন"-সম্প্রদায়ের গূঢ় সঙ্কেতের মত, শুধু তাঁরাই বোঝেন যাঁরা এই তীব্র আনন্দ উপলব্ধি করেছেন, যাঁদের অন্তরাত্মা এই অগ্নিদীক্ষায় পূত ও পরিশুদ্ধ।

নিজের শিল্পসৃষ্টিগুলি, শিল্পীর নিকট, তিনি যা' প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার অতি অক্ষম অনুবাদ, অনেক সময় হয়ত ব্যঙ্গ ব'লেই বোধ হয়। কিন্তু তথাকথিত রসজ্ঞদের হাতে এই সকল শিল্প-সৃষ্টির সমাদর (বা নিগ্রহ) শিল্পীর কাছে নিদারুণ যন্ত্রণার কারণ হ'য়ে উঠে। তিনি যে বিপুল পুলক অনুভব করেছেন তাকেই মূর্ত্তি দিতে চান ও সাধারণের মনে সেই সুরের প্রতিধ্বনি তুলতে চান, কিন্তু ভিন্ন মানুষের মন এমনই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত যে, এই প্রতিধ্বনি অনেক স্থলে শিল্পীর বিস্ময় ও বিরাগই উৎপাদন করে। সাগরকূলে সূর্য্যাস্তের চমৎকার ছবিটি আঁকতে গিয়ে শিল্পীর মনে হয়ত দিবাশেষের ক্লান্তিহারা শান্তির ও ঘনায়মান আঁধারের গম্ভীর রহস্যাকুল মোহের ভাবটি পরিস্ফুট ছিল, কিন্তু অস্তাচলের প্রান্তে সূর্য্যের লোহিত চক্রটি দেখে নানা লোকের মনে নানা স্মৃতির উদয় হ'য়ে থাকে যা' শিল্পী কখনও ভাবেন নি—প্রেমিকের মনে হয়ত প্রিয়তমার নির্ম্মল ললাটের সিন্দূর-বিন্দুটি, সৈনিকের মনে হয়ত মৃত্যুদ্‌গীরণকারী কামানের মুখের রক্তবর্ণ গোলা ও পাচকঠাকুরের মনে হয়ত বা অগ্নিকুণ্ডের উপরস্থ উত্তপ্ত পাকপাত্র বিশেষটি। কোন বিশেষ শিল্পকীর্ত্তি দেখলে দর্শকের মনে কি ভাব উঠবে তা' নির্ভর ক'রে তাদের মনের উপাদানের উপর ও উপাদান বিন্যাসের উপর, মনের সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহিতা বা কর্কশতার উপর ও সবচেয়ে তার ভিতর জন্মজন্মান্তর আহৃত সংস্কার-লীন বাসনার উপর। বিশ্বনাথ কবিরাজ রসবিচার করতে গিয়ে রসের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য-অনুভব-যোগ্যতা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, দর্শকের মনে যদি সেই বাসনা সঞ্চিত না থাকে ত রসানুভূতির চেষ্টা তাঁর পক্ষে পণ্ডশ্রম মাত্র—যেমন বৃদ্ধ মীমাংসক বা শুষ্ক বৈয়াকরণ। কথাটা সকল শিল্পসৃষ্টি-প্রণিধানের বিষয়েই সত্য। মনের তার যদি মোটা বা অসম হয় ত যত দক্ষ হাতেই তাতে ঘা দেওয়া যাক না কেন, তা' থেকে কর্কশ ও বেসুরো ধ্বনি বেরুবেই। অনেক শিল্পকীর্ত্তি দেখে তাই অনেকের মনে

কলুষিত ভাব ও দুষ্কৃতির প্ররোচনাই জেগে উঠে। আর এই সমস্ত লোকই সমজদার-হিসাবে রুচিবাগীশ হন ; পারি নগরীর নগ্ন পাষাণ-প্রতিমাগুলির কটিতটে সবুজ পাতার আবরণ পরিয়ে বেড়ান (Anatole France, Les Opinions de Jerome Coignard)। প্রকৃত শিল্পীর ভাগ্যে নিষ্করুণ দৈব এই সকল সমালোচকদের বিচার শোনার দণ্ডও বিধান করেন। শিল্পীর ব্যথার কি পরিমাণ আছে ! বর্ত্তমান লেখক এমন একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কথা জানেন, যিনি একবার মাত্র তাঁর রচনা প্রকাশ ক'রে সাধারণের নিকট যে সমাদর লাভ করেছিলেন, তাতে জীবদ্দশায় আর কখনও কোন রচনা প্রকাশ করার সাহস তাঁর হয়নি। সেগুলি যে তাঁর চিত্তোদ্যানের কল্পকুসুম, কত যত্নে, কত সাধনায় মুকুলোদ্গম হ'য়েছে, রাসায়নিকদের পরীক্ষাগারে কি তাদের দগ্ধ ক'রে, বিমর্দ্দিত ক'রে সৌরভের বিশ্লেষণ করতে দেওয়া যায় ?

অথচ তাঁদের সৃষ্ট শিল্পকীর্ত্তির সুবিচার, তার মর্ম্মবাণীটির প্রকাশ ও ন্যায্য প্রশংসাদান শিল্পীর পক্ষে কত প্রয়োজন তা' বলা যায় না। সুচিন্তিত প্রশংসা ও উৎসাহের আবহাওয়া না পেলে শিল্প-প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হয় না। শিল্পী যে মানবচিত্তের একটা অভাব মিটিয়েছেন, চিরন্তন মানবকে চিরকালের জন্য একটা নিবিড় আনন্দের সামগ্রী দান করেছেন, এটা লোকে না বুঝলে তাঁর মনে হয় যেন সকল প্রয়াসই বিফল। তিনি যত আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন তা' ত পারেন নি, এ অক্ষমতা কাঁটার মত শিল্পীর বুকে বিঁধে আছেই কিন্তু যা' দিতে পেরেছেন তা' যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর অবহেলার বস্তু নয় এইটুকু জানতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর তা' না পেলে উৎসাহ আসে কোথা থেকে। কবির ভাষায় বলতে গেলে সকল যথার্থনামা শিল্পীরই আকাঙ্ক্ষা—

নবীন আষাঢ়ে রচি নবমায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্যছায়,
আর একটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর,
তারপরে ছুটি নিব।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে,
মাগিছে তেমনি সুর ;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারটি কথা
রেখে যাব সুমধুর।

আর যখন শিল্পী দেখেন যে তাঁর প্রাণান্ত প্রয়াসে জগতে মতভেদ ও দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি হচ্ছে তখন সে দুঃখের কি সীমা আছে! তথাকথিত রসজ্ঞদের শিল্প-বিচারে শিল্পীরা যে অসহিষ্ণুতা, যে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তা'তে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি ? উভয়ের বিচারের মূল্য নির্দ্ধারণের মূল সূত্রই যে ভিন্ন। শিল্পীরা রুক্ষস্বভাব, অব্যবস্থিত চিত্ত, কর্কশ প্রকৃতিও নন এবং প্রতিভা আর উন্মত্ততাও এক পর্য্যায়ের বস্তু নয়।

শিল্পীর ব্যথার বোধহয় প্রতিকার নেই, কিন্তু সে দুঃখটা যে কি তা' বোঝা ও তার সহিত সমবেদনা অনুভব করা বোধহয় অসম্ভব নয়। বিজলী-চপল মুহূর্ত্তে প্রাণ-মন-উন্মাদক, গভীর, তীব্র, অবর্ণনীয়, আনন্দ-প্রতীতি একা প্রতিভার ভাগ্যেই ঘটে। তারপরই শিল্পীর দুঃখের আরম্ভ। সেই আনন্দের স্মৃতি এমনই পাগল ক'রে তোলে যে, সেই অনুভূতির সন্ধানে সকল শক্তি নিয়োজিত করতে হয়। এই পরম অনুভূতির অন্বেষণে বেরিয়ে তেমনই তীব্র ও গভীর নব নব অনুভূতি পাওয়া যায় কিন্তু তৃষ্ণা বেড়ে যায়। সে আনন্দময় মধুর স্বপ্নটিকে বাইরে আকার দিতে যতদিক্ দিয়ে প্রয়াস পাওয়া যাক্ না,—কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, যে স্থূল উপাদানের সাহায্যে এই চেষ্টা করা যায় সেগুলিই তাদের জড় শৃঙ্খলে প্রতিভাকে বেঁধে পঙ্গু ক'রে তোলে,—আর শিল্পী যতই তার বিকলাঙ্গ সন্তানদের দিকে চান, ততই তাঁর দুনয়নে দুঃখের বারি ছাপিয়ে উঠে। সেগুলি যতই বিকলাঙ্গ হ'ক, যদি তারা দর্শকের মনে শিল্পীর অনুভূত বিপুল পুলকের একটুকুও রেশ তুলত তাহ'লে শিল্পীর কিছু সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু চারিদিক্ থেকে যে অভিনন্দনের কোলাহল উঠে, খাঁটি আর্টের দিক্ দিয়ে, শুধু form-এর দিক্ দিয়ে, সমাজের দিক্ দিয়ে, নীতির দিক্ দিয়ে, মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে যে উন্মত্ত সমালোচনার তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হয়, তাতে শিল্পী আপনাকে এই দ্বন্দ্ব-নিনাদের মূল-কারণ ভেবে, মহা অপরাধী ব'লেই মনে করেন। কোথায় আদি বিশ্বের

বিবর্ত্তনের স্রোতে কণায় কণায় ভেসে আসা সৌন্দর্য্যের নিমেষে পরি
সমগ্রতায় বিকাশ ও আনন্দ-প্লাবনে বিশ্বজগতের ও শিল্পীর আপন অস্তিত্বে
নিমজ্জন, আর কোথায় এই অর্থহীন প্রশংসার ও নিষ্প্রয়োজন নিন্দার
কর্কশ চীৎকার! অসহিষ্ণু শিল্পী যদি গভীর অবজ্ঞাভরে ব'লে উঠেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী॥

তাহ'লে কি তার যথেষ্ট কারণ আছে বলতে হবে না? আমাদের মধ্যে
একটুখানিও শিল্পী-প্রকৃতি না থাক্‌লে তাঁকে, হ'আমরা বুঝব কি ক'রে
মর্ত্ত্যের জীব হ'য়েও শিল্পীর স্বপ্ন-বিভোর নয়নে ক'ঞ্জেকটুখানি স্বর্গীয় অঞ্জনের
লেশ লেগে আছে, আর আমরা যে মৃণ্ময়ী পৃথিবীর নিতান্তই ধূলিধূসর
সন্তান।

ার ম

শ্রীসুশীল বোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তিভা
ন,
রেছেন
তিঁ
টার ম
নিতান্ত
গবিক,
বলতে

প্রেমপত্র

"গল্প কখনও সত্য হয়?"

"নিশ্চয়ই হয়, নচেৎ আমি কখনও প্রেমে পড়ি?"

"বল কি হে? প্রেমে ত সকলেই পড়ে!"

"আমি ত আর সকলের একজন নই।"

"জানি তুমি অ-সাধারণ। শুনি এক অ-সাধারণ ব্যক্তির অ-সাধারণ গল্পটি।"

দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছিল। দু'জনেরই বয়স ত্রিশের ওপর। ঠোঁটের চাপে, চোখের দীপ্তিতে, চিবুক-চোয়ালের গঠনে পার্থক্য ধরা পড়ে। একজন বুদ্ধিমান, বুদ্ধির গর্ব্বে গর্ব্বিত। অন্যজন সাদাসিধে, ভাল মানুষ। দু'জনে নদীর ধারে গিয়ে বসল।

"দ্যাখ, অ-সাধারণ ব্যক্তির অভ্যাসই হচ্ছে যে, সে নিতান্ত সাধারণ ঘর-পোষা লোকের কাছে তার অ-সাধারণত্বের বড়াই করে। যখন তার দলের অন্য ব্যক্তির বিদ্রূপে সে কর্ণপাতই করছে না, তখন দেখা যায় যে, তার নিম্নশ্রেণীর লোকের ঠাট্টায় সে বিচলিত হচ্ছে। নেপোলিয়নের সর্ব্বদাই ভয় হ'ত, প্যারিসের মেয়েলী আড্ডায়, বুল্‌ভার্দের কাফেতে তার সম্বন্ধে কে কি বলছে। তোমাদের দেশের যে কোন বড় লোকের কথা স্মরণ করতে পার, নজীর পাবে। সেই জন্য আমার গল্প শুনে তুমি ঠাট্টা করলে আমি বিচলিত হব। কিন্তু ঘটনাটি নিতান্তই সাধারণ হ'লেও ব্যাপারখানি সত্যই অ-সাধারণ ও অলৌকিক।"

"বল"

"সে ছিল আমার খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। আমার সঙ্গে সম্বন্ধও হয়েছিল—বিয়ে করি নি। এক বন্ধুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। হয় কেন? আমিই ঘটকালি ক'রে দিয়ে দিই। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় Science Association-এর লেক্‌চার হলে। ছেলেটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক—অর্থাৎ ইংরেজী না জানার, ইতিহাস মুখস্থ করবার অক্ষমতা এবং সংস্কৃত কালা অক্ষরের প্রতি প্রীতি না থাকার দরুণই যে সে বিজ্ঞান পড়ত তা নয়। নিজের মুখে শুনেছিলাম যে, সে ছেলেবেলা থেকেই লেন্‌স্ নিয়ে নাড়াচাড়া করত। বাপের বউবাজারে একটা পাথুরে চস্‌মার দোকান ছিল। সে যাই হোক্, বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হ'য়ে গেল। বন্ধু স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে পূরলেন। বছর খানেক কি দেড়েক পরে মেয়েটি এল বাপের বাড়ীতে। কারণটি শুনলাম সনাতন, সাধ-ভক্ষণ। মাস দুই পরে, এক গভীর রাতে মেয়েটির ভাই এসে ডাকাডাকি করল, কেদার দাসের বাড়ী যেতে হবে। ভীষণ

বিপদ—শীতের রাত! যারা মূর্খ, যাদের স্বামী এমন মূর্খ তাদের সাহায্য করাই পাপ, তাদের মরাই উচিৎ। হঠাত মনে হ'ল কেদার দাসের এক এসিষ্টাণ্টের ছেলে ত আমার বন্ধু—বুক কোম্পানিতে আলাপ—ছেলেটার বাপের পয়সা আছে, নতুন বই কেনে, পড়ে কিনা জানি না। মেয়েটির ভাইকে একটা চিঠি দিতে সম্মত হলাম। ছোক্‌রা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লে, 'দাদা, তুমি চল, খুকী মর-মর, সবই করেছ, আর একটু উপকার না হয় করলে!' ও রকম কাকুতি করলে আমার আবার কেমন দুর্ব্বলতা আসে। তাই গেলাম। সস্তার এক দাসকে ধ'রে নিয়ে এলাম। বাড়ী ঢুকতে যেন গাটা ছম্ ছম্ ক'রে উঠল, একটা গোঁঙানি কানে এল। ছিঃ, ugly শুধু নয়, একেবারে vulgar—। হাঁ, বুঝি Creative Evolution লেখা হচ্ছে, বার্গসনের গোঁঙানি বোঝা যায়! কিন্তু এ কী! জীব-জগতে সৃষ্টির মধ্যে সহজ ভাব কোথায়? সব বাধা-বিঘ্ন, impediments-কে consume করলেই, পুড়িয়ে ফেল্লেই ত আলো শুভ্র হয়। যা সৃষ্টি হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ ত জানাই আছে! সকালে শুনলাম একটা জড়পিণ্ড জন্মেছে, ও তখনি শিশুমৃত্যুর ক্রম-বর্দ্ধমান হারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মারা গিয়েছে। জড়পিণ্ডের জড়-ভারতী মা'টি তখনও জীবিতা, প্রথামত খাবি খাচ্ছেন। উচ্ছন্ন যাক্ বাঙলা দেশ! ভাগ্যিস্ একজন ডাক্তার এনে দিয়েছিলাম! ডাক্তারদেরকেও বিশ্বাস নেই। সেদিন দেখছিলাম, বিলেতে শতকরা যত মেয়ে আঁতুড় ঘরে মরে, অথচ যাদের মরা উচিত নয়, তাদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন মরে ডাক্তারদের দোষে, আর শতকরা সেই সংখ্যাই মরে নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞানতার দোষে। তা হ'লে ডাক্তারের বাহাদুরীটা কি? তবু আনলাম ত!

কি জানি কেমন ক'রে নিজেকে দেখলাম আঁতুড়ঘরের দরজায়। বোধহয়, সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ ফলটি দেখতে, সমালোচকের নেশাই তাই। ভাগ্যিস ঐতিহাসিক নই! গলা পর্য্যন্ত ঢাকা, ঘরের কোণে হাঁড়িতে গুলের আগুন টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে—ধোঁয়ার ব্যূহ ভেদ ক'রে কিছুই নজরে পড়ে না। নজরে পড়ল এক জোড়া চোখ! কী করুণ, গরুগুলো যেমনি ক'রে চায়, কী বড়! আকাশ জুড়িয়া মেলিল তব আঁখি—চোখ দুটো বাড়তে বাড়তে আকাশ ভরিয়ে দিলে—ঘোলাটে মেঘের সঙ্গে মিশে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, চোঁয়ান চাঁদের আলোর ম্রিয়মাণ মুমূর্ষু দীপ্তি যেন আত্মগোপন করতে চাইছে, একটা যূথভ্রষ্ট বলাকা ডানার ঝাপটা দিতে দিতে, করুণ আর্ত্তনাদ ক'রে উড়ে গেল, তারই আওয়াজ যেন কানে এল।

"এসেহ?"

"তার আর কী হয়েছে! এ-ধারে যে ঘর বিষে ভ'রে গেল, গুল্ ভাল পুড়ছে না, পিসীমা, হাঁড়িটা বাইরে নিয়ে যাও।"

"বোসো—মাথা ঘুরছে, কথা কইতে পারছি না।"

"একটু কেমিষ্ট্রি জানা ভাল মেয়েদের রঙটাও পরিষ্কার হয়, আত্মরক্ষাও হয়, সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও দূর হয়, তোমার স্বামী আবার পদার্থ-বিজ্ঞানের অপদার্থ এম্, এস্, সি, বুঝি, খুড়ী!"

"কাল মরছিলাম, সে কী কষ্ট!"

"দু'দিন পরেই ভুলে যাবে, দিদি, কোন কষ্ট কি ভয় থাকবে না।"

ভাল লাগল না, চলে এলাম। সর্দ্দাবিলের সর্দ্দা সাহেব মহাত্মা-গান্ধীর চেয়ে বড়। আরো বড় হ'তে পারতেন, যদি সমাজ-রক্ষকের দল না থাকত।

তার পর রোজই যাই। মেয়েদের কী অসাধারণ সেরে ওঠবার ক্ষমতা! এক মাসের মধ্যেই উঠে হেঁটে বেড়াতে আরম্ভ করল। বেশ গোলগালধরণ, রঙ গৌর নয়, তবে কেমিষ্ট্রির সাহায্য-ব্যতিরেকেও চামড়া পাৎলা ও মসৃণ, নাইবার সময় তুর্কী তোয়ালের দরকার হয় না, চোখের পালক sea-gull-এর ডানার মতন, সে ডানা যেমন দেহের তুলনায় বড়, তেমন বড় চোখের পালকগুলো তার চোখ ঢেকে ব'য়ে এসে গালের ওপর পড়েছে। স্বভাব মিষ্টি, চরিত্রে কিসের একটা সাম্য আছে, লোভের অভাবে বোধ হয়, চোখে, মনে কিসের একটা শান্তি আছে—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্যের বোধ হয়। লম্বা ধরণের ছিপ্ ছিপে হ'লে Nausica-র মতন হ'তে পারত। মোটের ওপর মন্দ নয়—ঢের বেশী সুন্দর মেয়ে দেখেছি ওর চেয়ে। রোজ যেতে হয়, রোজই কথা কই। মাঝে মাঝে চাল ভাজা, মুড়ী খেতে ভালই লাগে। গেলে কি যে করবে ঠিক্ পায় না। কিন্তু হাঁটে আস্তে আস্তে, চিরকালই তাই। মনে ভাবেন হয়ত থিয়েটারের রাণীর মতন হাঁটাই আদর্শ হাঁটা। তাও নয় বোধ হয়—জোরে হাঁটা শিক্ষায় বাধে। সংযম, সংযম! কী যে সমাজের চাপ! কত বড় জগদ্দল পাথর বুকের ওপর চাপান রয়েছে! হৃদয়ের গোপুরমে সংস্কারের পাহাড়!

মেয়েটি দেখি একদিন এক মাসিক-পত্রিকা পড়ছেন। খাঁটি অভিজাত, কুলীন-সাহিত্য, এক সংখ্যায় তিন-তিনটি আই, সি, এসের লেখা ও গল্প। সাহিত্যের নামে সৌখিনত্বের, snobbishness-এর প্রকাশ! সেও ভাল। একটু আলোচনার পর দেখি কেমন একটা সরল রসগ্রহণের ক্ষমতা আছে। তাকে বুঝিয়ে দিলাম 'সরলভাবে রসগ্রহণ করার কোন মূল্য নেই। আদৎ কথা সমালোচনা-শক্তি, তাকে অর্জ্জন করতে হয় বিলেতী বই পড়ে, মার্জ্জন করতে হয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মুখে মতামত শুনে।' আমি ভাল ভাল বই যোগাবার ভার নিলাম, মাঝে মাঝে শক্ত জায়গাগুলো

বুঝিয়ে দিতাম, আর, আমার মতামত ছাড়া আর কারুর মত শোনবার স্বযোগ তার ছিল না। স্বামী তখন Compton effect নিয়ে ব্যস্ত—বেচারি সাহিত্যালোচনা কখনও করেনি। সে মাঝে মাঝে আসে, আর জিজ্ঞাসা করে, 'দাদা, যতীন সেনের কবিতা নাকি ভাল ?' আমি কবির pessimism-এর ব্যাখ্যা করি। বলি 'আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের অবস্থায় নতুন স্বর বটে, কিন্তু দেশের ঐতিহ্য ও অন্যান্য অবস্থা দেখলে এই স্বরই স্বাভাবিক মনে হয়। এতদিন বাজে নি কেন আশ্চর্য্য হই! আশ্চর্য্যান্বিত হবার ফলে হয়ত যতীন সেনের কবিতাকে একটু বড় ক'রে দেখি। অবশ্য লেখেন ভাল। আমি দুঃখরাগের অন্য রাগিণী শোনবার অপেক্ষায় ব'সে আছি'—ইত্যাদি। মেয়েটি গালে হাত দিয়ে, কখনও বাঁকা চোখে, কখনও পালক নামিয়ে শোনে—বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভুরু কোঁচকায় না। স্বামী নিজের মেসে চলে যায়। একটু আমার উপর কৃতজ্ঞ। কোন দিন সেখান থেকে জলখাবার খেয়ে আসি—নিজে হাতে তৈরী করে। রান্নার হাত মন্দ নয়।

তার পর মধ্যযুগ। সে যুগের শুধু করুণাটুকু, ঘোড়ায় চড়া কিম্বা তলোয়ার খেলা নয়। কেমন যেন আমেজ লাগে। আচ্ছা, মাথায় কি করুণা বাসা বাঁধে ? মধ্যযুগের ধারণা ছিল—করুণার পীঠস্থান পেটে। বেশ চিঁড়ে ভাজা খাওয়া যেত, চা ভাল হ'ত না, অত তাড়াতাড়ি জল গরম হয় না, এক চুমুক খেয়ে রেখে দিতাম, পরে শিখে নিলে। ঘরের কাজ ছেড়ে আমার কাজই করে। ঘরের আর কাজই বা কি ? সেবা-খাওয়ার মধ্যে একটা মধুর বিলাস আছে, প্রথম শরতের হাওয়ার মতন। অভ্যাসের বশে দাবী করবার প্রবৃত্তি এল। অবশ্য এ ভাবটা ঠিক্ মধ্যযুগের নয়, তখন প্রেম ছিল কর্ত্তব্যজ্ঞান। আর দাবী করবই না কেন ? আমি না করলে আর কেউ করবে। আমার ধর্ম্মই তাই—তার ধর্ম্মও তাই। কথাটা সন্দীপ বলতে পারত, নয় ? কিন্তু সেও মক্ষিরাণী নয়, আর স্বামীটিও নিখিলেশ ছিলেন না। আমার দাবী করবার অধিকারকে সে কেমন নীরবে, বিনা ওজর-আপত্তিতে, হাওয়া যেমন মানুষে টেনে নেয়, সেই রকম সহজে মেনে নিলে। একটু খারাপ লাগত, অত অম্লান-বদনে কেউ কিছু মেনে নিলে তাকে ভাল লাগতে পারে না, তাকে শুধু ব্যবহার করা যেতে পারে। হাজার হোক্ সে ত পরস্ত্রী, আর পরের ক্ষেতেই ঝাল খেতে ভাল। আমার নিজের মানসী-প্রতিমা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই—কিন্তু পরের কি ধরণের হওয়া উচিত তা আমি জানি। পরস্ত্রী হবে যেন ধনুকের জ্যা, ছুঁলেই টঙ্ ক'রে বাজবে, চাবুকের মতন চটপটে, লিক্‌লিকে—না হ'লে মনে হয় যেন বর্ষাকালে তিন দিনের বাসি মুড়ী খাচ্ছি, তাও আবার ঘি দিয়ে। কিন্তু তবু অত নির্ব্বিবাদে আমার দাবী গ্রহণ ও অত অকৃপণ

ভাবে সে দাবী-পূরণ দেখে দেখে মনে সন্দেহ হ'তে লাগল। কেমন যেন নতুন নতুন ঠেক্‌ল। এই নতুনত্বের মোহই আমার চোখে ছানি টান্‌লে।

মোহটা কি ধরণের জান ? বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে, বর্ষাকাল শেষ হ'লে, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসের ভোরবেলার miasma দেখেছ ? রোম-সাম্রাজ্যের মতন দুর্দ্ধর্ষ সাম্রাজ্য গেল কাম্পানার কবলে—আমার stoicism কোন্ ছার! কিন্তু এর বিপক্ষে লড়াই করিনি, কি সাবধানী হই নি ভেবো না। চার-বারের ডাঙ্গা শুক্‌নো রেখেছি, কোন মশাকে ডিম পাড়তে দিই নি, নিজেকে মশারির ভেতর রেখেছি, নিম-পাতা কুইনিন খেয়েছি—তবুও কোথা থেকে কামড়ে দিল, তাই মাঝে মাঝে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে, কাঁপুনি আসত। হৃদয়ের আবেষ্টন নীরস রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও, আকর্ষণের কোন সুবিধা ও কারণ না ঘটতে দিয়েও, নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেও, cynicism-এর আবরণ সত্ত্বেও, আমার সব পুরুষালি দাম্ভিকতাকে তার নীরব নারীত্ব ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপিয়ে দিলে। কত কঠিন হয়েছি, কত বকেছি, কত নিষ্ঠুর, নির্ম্মমভাবে অবহেলা করেছি—কিন্তু কই আমি ত—এই ছাখনা তোমার কাছে জীবন-কাহিনী বল্‌ছি। আগে কখনও ভাবতে পারতে যে আমি তোমার সঙ্গে ব'সে এই ধরণের 'কাব্যি' করব ?

একদিন তাকে দাবী ও অধিকারের ইতিহাস ও মর্ম্ম বোঝাতে লাগলাম। আদিম যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কি ছিল, কি হ'ল তারই ইতিহাস। সমাজ-তত্ত্ব মেয়েদের বোঝা উচিত। চুপ ক'রে শুন্‌লে, মাঝে মাঝে, বড় বড় চোখ ক'রে চায়, পালক ঝাঁপের মতন ওঠে পড়ে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চল্‌ছে কিনা বোঝা যায় না। বুঝছে কিনা প্রমাণ পাই না। প্রশ্ন করে, "দাবী-দাওয়ার ভাগবাটোয়াঁরা ক'রে কার কতটুকু রইল ? যতটুকু রইল তা'তে যদি সুখ না হয়, ভাগ না ক'রে কেউ যদি শুধু দাবী করে, আর কেউ দাবীর অধিকার পুরোপুরি স্বীকার ক'রেই সুখ পায়, তা'তে ক্ষতি কি ?" উত্তর দিই, "মেয়েদের ও-ভাবে মেরী ও মার্থার খোঁয়াড়ে পূরতে পার—জানি না ঠিক্—কিন্তু পুরুষ মানুষের স্বভাব ও শিক্ষা ভিন্ন। একই পুরুষ দিতেও জানে নিতেও জানে। তোমার কি মনে হয় ?" "কি জানি", ব'লেই ভাঁড়ার ঘরে চ'লে যায়। তর্ক সে কখন করতে শেখে নি। সব শিক্ষা বৃথা হয়েছে, ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে!—সে কিছুই গ্রহণ করে নি। সে শুধু দিতে শিখেছে।

আর একদিন তার বাড়ি গিয়েছি। সপ্তাহ খানেক যেতে পারি নি। স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। আমি যেতেই ব'লে উঠল—'যে লোক তিলের তেল আর নারকেল তেলের তফাৎ বোঝে না, তার বিজ্ঞান পড়ার

মুখে ছাই! আমি আনতে বোল্লাম গন্ধ তেল, আনা হ'ল বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল!' আমি বল্‌লাম, 'বৈজ্ঞানিকের মতই কাজ করেছেন, ও সুগন্ধি তেলকে তোমার চুলের পক্ষে খারাপ ভাবে, তাই আনে নি।' 'আমার চুল কিসে ভাল হয়, আর কিসে খারাপ হয় আমি জানি, বৈজ্ঞানিক জানে না, এ ফেরৎ দিও, যা বলেছি কাল এনো।' বন্ধু একটু অপ্রস্তুতের হাঁসি হেঁসে চলে গেল। তার পর আধঘণ্টা ধ'রে তাকে শ্যেন-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছি, কোন রকমের অনুশোচনার চিহ্ন পর্য্যন্ত নজরে পড়ে নি। সংযম বটে! হয়ত সংযমের কথাই নয়। তবে কি মেয়েদের স্বভাব অন্য ধরণের?—কারুর কাছে দাবীই করে, যতটুকু না দিলে নয় তাই দেয়, দেবার সময় ঠকায়, যেন সবই দিচ্ছে, আবার কারুর দাবী মাথা পেতে গ্রহণ করে, দ্বিধা করে না, বুঝিয়ে দেয় আরও ভার সে সহ্য করতে পারে? প্রত্যেকেই multiple personality, সামান্য উত্তেজনাতেই dissociated হ'য়ে যায়। আগে ভাবতাম, লোক ঠকিয়ে খায়, তা নয়।

ঠিক্ এই সময়ে আমাকে বার্গসনে পেয়ে বস্‌ল। জীবনীশক্তি নাম শুনেই মনে হ'ল, তাই ত, সবই ত এরি কাজ, আমারা ত এরি হাতের পুতুল! বুঝলাম স্ত্রীজাতি ত এরি প্রধান এজেণ্ট! লোকটার কী লেখবার ক্ষমতা! যা সন্দেহ ক'রে এসেছি তাই ঠিক্ ব'লে দেয়—এই না হ'লে লেখক! সামান্য সামান্য ঘটনায়—যার পারম্পর্য্য তুমি বার্গসন না পড়লে বুঝবে না—আমি প্রমাণ পেলাম যে আমি কোন্ শক্তি-প্রবাহের ঘূর্ণীতে পড়েছি—আমাকে ঘাড় ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, টানের জোরে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলেছি। বুদ্ধিগড়া নিজত্বটুকু, অ্যালান পো-এর গল্পের ঘূর্ণীর মধ্যে নৌকার মতনই, ভেঙ্গে খান্ খান্ হ'য়ে গেল। আমি নিজেকে হারালাম। যেদিন বুঝলাম যে হাল আমার হাত থেকে খসে গিয়েছে, সেদিন আমার যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ এসেছিল বল্লে, আশা করি, বিশ্বাস করবে। না, না, অত বিশ্বাস ক'রে অপমান করো না। কী কুক্ষণেই বার্গসন্ পড়ি!

জান বোধ হয়, বার্গসনের শিষ্যবৃন্দ Syndicalist-রা, তাঁদের প্রধান কথা Direct Action। তাই একদিন তা'র দিকে সোজা চেয়ে বল্‌লাম—'তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে'। চোখের পাতা নামিয়ে নিয়ে পায়ের আঙ্গুলটা পর্য্যন্ত সাড়ির পাড় দিয়ে ঢেকে দিলে। বল্‌লাম, 'তা ভাল, পূব-পশ্চিমের তফাৎ অনেক'। আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে। কেমন বাধ-বাধ ঠেক্‌ল—আর কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ঘন গলায় বল্‌লাম, 'আর আমার এখানে আসা উচিত নয়।' কী বড় চোখ তার, কালো তারা, পালকগুলো যেন চীনে

কালিতে ডোবান তুলির আঁশ। বুদ্ধির প্রভা তাতে নেই, শুধুই ভাল মানুষ, নিছক্ ভাল মানুষ। চোখ নিয়ে জন্মেছে, তাই চায়।

আবার গেলাম, পরের দিনই। তাকে বল্‌লাম যে সে আমাকে আকর্ষণ করেছে, সে আকৃষ্ট হয়েছে কিনা প্রশ্নের হাঁ কি না সাফ্ উত্তর চাই, আমি আকৃষ্ট হয়েছি সে জানে কি না। নড়ে না, চড়ে না নয়ন পাথার—নট্ নড়ন্ চড়ন্ ঠকাস্-মার্ব্বেল। তা হ'লে জানাই ভাল—nothing like facing the issue—এই হ'ল নতুন মনোবিজ্ঞানের কথা। আমি তার হাত ধরতেই উঃ করে উঠল, হাতের নোয়া বেঁকে গিয়েছে। কথা কয় না, দাঁড়িয়ে শুধু কাঁপে। এ এক বিপদ! নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে তার জুড়ী দেখি নি। হয়, নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা, না হয় প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, জড়ভারতী! 'কথা কও, কথা কও, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না,' বলতে চোখ তুলে চাইলে—তা'র পরই water-works! ভাবলাম সুবিধা বটে, কেননা নীরবতা কান্নার সঙ্গে মিশলে স্বীকারোক্তি কেন চুক্তিপত্র পর্য্যন্ত রেজেষ্ট্রি হ'য়ে যায়। হ'লও তাই।

তার পর, তার পর আর কি? সে আমাকে এক লম্বা চিঠি লিখলে। অমন লম্বা, অমন আবোল-তাবোল, অমন ভাবপ্রবণতার রসে ডোবান রসগোল্লা মার্কা চিঠি, অমন boring লেখা এক বাঙলা মাসিক পত্রিকা ছাড়া অন্য কোথাও পড়িনি। উচ্ছ্বাস, কেবলই উচ্ছ্বাস, একটু ন্যাকামি মেশানো, রেডিওতে নতুন ঢঙের যেন গজল গান শুনছি। বিবাহের পর স্ত্রীকে পড়তে দেবো ভেবে চিঠিখানি অনেকদিন রেখে দিয়েছিলাম। সে দিন পুড়িয়ে ফেলেছি। চিঠির উত্তর দিই নি। বিকেলে যখন গেলাম তখন দেখে মনে হ'ল যেন সে ব্যক্তিই নয়। শুপারি কাটছে। এই শান্ত প্রকৃতির ঘরণী-গৃহিণীর মধ্যে এত উচ্ছ্বাস ছিল—আগ্নেয় গিরির বুকে ছাইয়ের মতন। যাই হোক্, সে ছাই উড়ে আমার আকাশকে রঙীন করলে, কতদিন পর্য্যন্ত মনের আকাশে যে সূর্য্যাস্তের সময় সে ছাই রঙের ভিয়ান বসাত তাই ভেবে এখনও অবাক্ হই। স্মরণ আছে এখনও, না হ'লে তোমাকে গল্প বলি!

যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 'যা লিখেছ সব সত্যি,' সে জবাব দিলে 'হাঁ সত্যি, সত্যির অর্দ্ধেকেরও কম।'

'আর বাকীটা? সব মিছে?'

'না, তাও সত্যি।'

'আমাকে অনেক দিন থেকে বাসতে পার, কিন্তু কত জন্ম ধ'রে বাসছ কি ক'রে জান্‌লে? জাতিস্মর?'

'জানি।'

'বিজ্ঞানে জানে না'। রাইডার হাগ্যার্ডের গল্পটা বলেছিলাম, ন
হয় না ত !

'তবু জানি।'

পিকিঙ্‌মুণ্ডের যুগে না হয় সে আমাকে ভালবাসতে পারত, তা
আগে ? বরফের যুগে ? তারও আগে ? পৃথিবী যখন আগুনে টগ
ক'রে ফুট্‌ত ? তারি বুকের জ্বালায় বোধ হয় !

'আমাকে দেখ্‌তে, কেবল দেখ্‌তে ভাল লাগে ?'

'হুঁ।'

'কেন ? সুন্দর ব'লে ?'

'জানি না।'

'জান বই কি ? অনেকেরই চেহারা আমার বয়সে আমার চে
ভাল ছিল।'

'হয়ত ছিল।'

'চিরকাল দাসী হ'য়ে সেবা করবে ? তুমি কোন যুগের ? এ
বিংশ শতাব্দী জান ? বিলেতে মেয়েরা সমগ্র স্ত্রীজাতির অধিকারের জ
জেলে পর্য্যন্ত যাচ্ছেন জান ? কতবার না বলেছি জেলে পর্য্যন্ত যে
হবে তোমাদের ?'

'দাসীও হব, জেলেও যাবো।'

'সে কি ক'রে হয়, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে দু কাজ একত্রে সমাধা হ
গিয়েছে যে !'

'বিয়ে আমার হয় নি।'

এ কী কথা বলে ? সেই যে সাতপাক, সেই যে মধু দেওয়া
পিঠে পুতুল আঁকা, মন্ত্র পাঠ,—মন্ত্রের শক্তি, দেখছি, শুধু অনুরূপা দেবী
বুঝেছেন ! সংস্কৃত মন্ত্রকে বাঙলায় তর্জ্জমা না করলে চলে না দেখছি।
'বিবাহ তোমার হয়ে গিয়েছে।'

'না গো হয় নি।'

কোথা থেকে তার গলায় এত জোর এল কে জানে। পাথরের
গায়ে কোঁদা অক্ষরের মতন প্রত্যেক অক্ষরটি স্থির, সুনিশ্চিত, কথার মধ্যে
কোন জড়তা নেই, সন্দেহের দোলন কি কম্পন নেই, ভাবালুতার লেশ
পর্য্যন্ত নেই। এ কী ক'রে হয় ?

'আমাকে ও ভাবে চিঠি লিখলে কেন ? এতদিন কি ঐ শিক্ষা হ'ল !
বাকী ছিল, প্রিয়তম, প্রাণেশ্বরটুকু, আরো বেশী বানান ভুল আর আ
শূন্য আসি তোমারই দাসী—বাদ পড়ল কেন ?'

'তুমি আমাকে ব্যথা দিতে ভালবাস'

"এই ত তরুণদের ভাষা জান ! তবে কেন আত্মগোপন ? ধরা
দেবেনা ব'লে ? আমাকে খুঁজে নিতে হবে ব'লে ?

"আচ্ছা, আর কখনও লিখব না। তোমার সব শিক্ষা বিফল হয়েছে।"

"ঠিক্ বলেছ। ক্ষেত্র বোধ হয় উর্ব্বর ছিল না।"

"আমি যে ও ছাড়া লিখতে জানি না।'

"এতে অবশ্য তোমার বেশী দোষ নেই। অন্য সাহিত্যে প্রেমপত্র সব ছাপা হয়, বড় বড় প্রেমিকের, হয়ত তাঁ'রা বড়লোকই ছিল না। প্রেমপত্রের চয়নিকা সস্তা দামে বিক্রী হয়, সেজন্য সে দেশের প্রেমপত্রের সাধারণ standard অত উঁচু। রবি বাবু ভানুসিংহের পত্রাবলী ছাপিয়েই ক্ষান্ত হ'লেন, তাই দেশের এই দুর্দ্দশা, তুমি কি করবে !"

কিন্তু মনে তৃপ্তি পেলাম না। ও দেশের প্রেমপত্রও ত ঝোলাগুড়, কোন দানা নেই, অথচ যারা লেখে তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও কাজ করবার শক্তিও অদ্ভুত ! তবে কি প্রেম-নিবেদনের ভাষাই ঐ ? তা হ'লে, সাহিত্যের ভাষা দুর্ব্বল হ'লেও তার পিছনের ভাবটি সত্য হতে পারে ? রূপ তা হ'লে কি ? সেদিন এই সব প্রশ্নের বোঝা নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। উত্তর আজও পাইনি। কিন্তু আমার অগোচরে একটি ধারণা আমাকে ধ'রে বসল যে হয়ত এই মেয়েটি সত্য কথা কয়েছে, কিন্তু ভাষার দোষে তার ভাবটি পর্য্যন্ত বিকৃত হয়েছে। একদল মনোবৈজ্ঞানিক বলেন ভাষা থেকেই ভাবের সৃষ্টি হয়। সে কথা বোধ হয় ঠিক নয়। জোর, ভাষার জোরে ভাবটি ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে, কিংবা বিকৃত হ'তে পারে। সে সত্য কথা বলেছে ধারণাটি যখন আমাকে ভূতের মতন পেয়ে বসল, তখন বুদ্ধির সব আগড় গেল ভেঙ্গে। হলাম বর্গসনের গোঁড়া শিষ্য।

এই হ'ল আমার অ-সাধারণ গল্প। আমার মতন লোকের ছোট খাট মানসিক ঘটনাও অ-সাধারণ। যদি না বুঝে থাক, তা হ'লে স্বীকার কর যে, ferro-concrete-এর ভিতর দিয়ে অশথ গাছের চারা জন্মাতে পারে। আমার বার্গসনে বিশ্বাস, আমার পক্ষে স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করবার প্রবৃত্তি, আমার পক্ষে romanticism-এর, হৃদয়-বৃত্তির দাবী মানা—এ সব যদি অ-সাধারণ ঘটনা না হয়, তা হ'লে আর কাকে অ-সাধারণ ঘটনা বলবে জানিনা।"

বন্ধুটি বল্লেন—'ও রকম খোসামোদ করলে সকলেই বার্গসনের শিষ্য হ'তে পারে। তুমিই আদৎ silly, তোমার বুদ্ধিবাদ সব pose—চাল ! সে মেয়েটি তার সহজ অনুভূতি দিয়ে তোমার pose expose করেছিল। তুমি একটি আস্ত বোকা, ধরতেই পারনি। অতি সহজেই

মেয়েরা পুরুষের ফাঁকি ধরতে পারেন। মেয়েদের একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে, যার জোরে—'

'যার জোরে তোমার বোকামি-মাখান কীর্ত্তিকলাপ অবলীলাক্রমেই তোমার গৃহিনী ধরতে পারেন, কেমন? তোমার স্ত্রীজাতির ওপর যে রকম প্রগাঢ় বিশ্বাস তাতে তোমাকে যে-কোন আশ্রমেই পাঠালে চলে—খুব বড় চেলা হবে হে! পরে মোহন্ত পর্য্যন্ত উঠতে পার! হয়ত তোমার ওপর অন্যায় করেছি। বার্ণাড শ পড়ে বোধ হয় cynic হয়েছ—তাই ভাবছ মেয়েটি বোধ হয় অতিশয় চালাক ছিল। চল, ওঠা যাক্ আজ সন্ধ্যাটাই মাটি, তুমি যাও সত্যের সন্ধানে, আমি যাই স্বপ্নের রাজ্যে। বার্ণাড শ পড়োনা হে, যদিও পড়, তাঁর গুরু বার্গসন পোড়ো না; বিপদে পড়বে। আচ্ছা যদি এই নিয়ে একটা গল্প লিখি তা হ'লে 'বার্গসনের বাহাদুরী' নাম দিলে কি হয়?

'মন্দ হয় না, কিন্তু 'Pose Exposed' নাম রাখলে আরো ভাল হয়।'

'একই কথা'।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান

বর্ত্তমান প্রবন্ধকে মোটামুটি বাংলা ও হিন্দী গানের তুলনামূলক আলোচনা বলা যেতে পারে। জগতের সব গানের মধ্যেই মূলগত একটা ঐক্য পাওয়া যায়, কারণ জীবোৎপত্তি সর্ব্বস্থানে প্রায়একই ধারা অনুসরণ করেচে। অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য গানের মধ্যে প্রকাশ করেনি, এমন জাতি দুর্ল্ভ। তবু ভিন্ন ভিন্ন জাতির রুচি তাদের সভ্যতা-অনুযায়ী, একমাপে গড়ে ওঠেনি; তাই সঙ্গীতের শাখা-প্রশাখা, পত্রপুষ্প যখন বিকশিত হ'য়ে উঠেচে, তখন তারা মূলকে অগ্রাহ্য না ক'রে-ও নিজেদের মধ্যের ব্যবধানে ও দূরত্ব সৃষ্টি করেচে। একই উপাদান যে নির্ম্মাণে ভিন্ন হ'য়ে পড়ে, তার কারণ মানুষ ও জাতির মধ্যে সৃষ্টির বৈষম্য আছে। সৌন্দর্য্যের অনুভূতির প্রকার এক হ'লেও স্থানকালপাত্র ভেদে প্রকাশের আকার ভিন্ন হ'য়ে যায়।

হিন্দী ও বাংলা গান একই সভ্যতার ছায়ায় পুষ্ট হ'য়ে উঠেচে। ভারতের আচার-ব্যবহার ও ভাষার বিভিন্নতা অল্পবিস্তর থাকলেও তার শিল্পকলাগুলি পরস্পর থেকে একেবারে সম্বন্ধশূন্য হ'য়ে পড়েনি। হিন্দী ও বাংলা গানের সংস্পর্শ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-রেখার ন্যায় স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হ'লেও অদৃশ্য নয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হিন্দী ও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিত করা—কে কোথায় শ্রেষ্ঠ, কে বড়, কে ছোট ইত্যাদি মূল্যের তারতম্য বিচার করার কোন উৎসাহ বা প্রয়াস লেখকের নেই।

প্রথমে একটি অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করতে হবে। সেটি রাগে স্বরের বৈচিত্র্য। স্বর-বৈচিত্র্যের প্রকৃতি বুঝলে আমার বক্তব্যটি, অর্থাৎ হিন্দী ও বাংলা গানের মূলগত প্রভেদ, পরিস্ফুট হবে। বাংলা ও হিন্দী উভয় সঙ্গীতেই রাগরাগিণীর ব্যবহার হয়েচে। হিন্দুস্থানী গানে সাতটী শুদ্ধ ও পাঁচটী কোমল স্বরের ব্যবহার হয়। কিন্তু যখন গান গাওয়া হয়, তখন দেখা যায়, যে-সব স্বর ব্যবহার হচ্চে, তাদের সংখ্যা এই বারটীর দ্বারা পূরণ হয় না। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক:—

(ক) হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কোমল স্বরগুলির স্থান অনির্দ্দিষ্ট; পাশ্চাত্য স্বর-কম্পনের সংখ্যা এখানে আমাদের বিশেষ সহায়তা করে না।

ভৈরব ও শ্রীরাগের ঋষভ, মিয়ামল্লার ও কানাড়ার গান্ধার, ভৈরবের ধৈবত আন্দোলিত হ'য়ে পার্শ্বস্থিত শ্রুতি (quartertone বা microtone) স্পর্শ করে, এবং তাদের এই প্রকার রাগের আন্দোলন ব্যতিরেকে বিস্তার করা অসম্ভব।

(খ) যেখানে কোমল স্বর আন্দোলিত হয় না, সেখানে অনেক রাগে আরোহণে (চড়বার সময়) ও অবরোহণে (নামবার সময়) একই স্বরের অল্প তারতম্য ঘটে। টোড়ীর গান্ধার; পুরিয়া ধানশ্রী, জৌনপুরী ও মালকোষের ধৈবত; ভীম-পলাশীর নিষাদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(গ) কাফী ঠাটের কয়েকটী রাগে কোমল গ ও নি'র আরোহণে প্রায় উচ্চ হওয়ার প্রবণতা থাকে।

(ঘ) বিহাগ ও শঙ্করার গান্ধার ও নিষাদ অল্প উচ্চতা লাভ করে। সোহিনী, হিন্দোল প্রভৃতি কয়েকটী রাগে ধৈবতে এই রকম পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে, কিন্তু বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। যে কোন প্রথম শ্রেণীর হিন্দুস্থানী গায়কের গান মনোযোগ দিয়ে শুনলে এটা সুস্পষ্ট হবে। তাঁরা রাগভেদে স্বরভেদ এত অবলীলাক্রমে করতে থাকেন যে, অনেক সময় বিস্মিত না হ'য়ে থাকা যায় না। এইজন্যে বাল্যকাল থেকে ওস্তাদেরা এই শক্তির উৎকর্ষসাধনে সচেষ্ট হন এবং যোগ্য হ'লে অসামান্য দক্ষতা লাভ করেন। ইন্দোরের সঙ্গীতরতন নাসিরুদ্দীন, পুণার আবদুল করিম, লক্ষ্ণৌর শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর বা রামপুরের মুস্তাক হোসেনের নাম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু লোককে বিপদে ফেলার জন্যে ওস্তাদেরা এ জটিলতার সৃষ্টি করেননি। বংশানুক্রমে দীর্ঘকাল চর্চ্চার পর তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, স্বর আপনা হ'তে রাগবিশেষে নিজের উচ্চতা, অনুচ্চতা বেছে নেয়, আর বুঝেছিলেন রাগের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বহুল পরিমাণে এই স্বর-বৈচিত্র্যের উপরেই নির্ভর করে। য়ুরোপীয়রাও এ-খবর রাখেন, যদিও তাঁদের সঙ্গীতে হার্ম্মনি-আবির্ভাবের কারণে তাঁরা স্বরবৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নি। সেদিন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত Metfessel কয়েকটী প্রসিদ্ধ গায়কের গ্রামোফোন রেকর্ড পরীক্ষা ক'রে দেখেচেন, তাঁদের স্বর সব সময় স্বরকম্পন-অনুযায়ী নিখুঁত থাকে না, প্রায়ই অল্পবিস্তর ভ্রষ্ট হয়; এবং তাঁর মতে গানের আর্ট অনেকটা এই বিচ্যুতির দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। আমাদের দেশে এই স্বরবৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য আজই আবিষ্কৃত হয়নি, আমাদের সঙ্গীতে এর ব্যবহার পূর্ব্বেও ছিল।

শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে হ'লে শ্রুতির কথা না ক'য়ে উপায় নেই। শ্রুতি নিয়ে এত বিভীষিকার উদ্ভব হ'য়েছে যে, একথার উত্থাপন করাতেও আতঙ্ক আসে। কিন্তু অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রী শুধু কথার মারপেঁচে এত রকম বাদানুবাদের সৃষ্টি করেচেন যে, এ-বিষয়ে নির্ম্মল আলো-বায়ুর নিতান্ত

প্রয়োজন হয়েচে। শ্রুতিকে দুইদিক থেকে দেখা যায়। প্রথম আমাদের প্রাচীন হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স্কেল (ঠাট বা মেল) নিরূপণে। এইদিক থেকেই কণ্ঠসঙ্গীতে উদাসীন পণ্ডিতেরা সব চেয়ে জোর দিয়েচেন। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়, কৌতূহলী পাঠক লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত কলেজের প্রকাশিত 'Sangeeta'-র প্রথম দুই সংখ্যা দেখতে পারেন*। যেহেতু শাস্ত্রকার বলেচেন যে, নি ও সা'র মধ্যে চারটী শ্রুতি, সা ও রে'র মধ্যে তিনটী শ্রুতি আর রে ও গা'র মধ্যে দুটী শ্রুতি আছে, অতএব কয়েকজন স্থির করে বসলেন এরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের major, minor, semitone ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ তাঁরা লক্ষ্য করলেন না যে, এসব স্বর দরকার-মত নিজের শ্রুতির সংখ্যা কমাতে বাড়াতে পারে, এমন নজির শাস্ত্রে আছে। সেদিন হৃদয়নারায়ণ দেবের প্রণীত 'হৃদয় প্রকাশ' (১৭শ শতাব্দী) গ্রন্থে রাগভেদে যে স্বরের শ্রুতিভেদ হয়,—তার অনেক দৃষ্টান্ত পেয়েছিলাম, অর্থাৎ দরকার হ'লে একই স্বর যে চতুঃশ্রুতি, দ্বিশ্রুতি আর একশ্রুতি হ'তে পারে—একথা লেখা ছিল। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। দ্বিতীয় দিক থেকে শ্রুতির যে সার্থকতা ছিল, তা' পুরোনো স্কেল আবিষ্করণের গোলমালে চাপা প'ড়ে গেল। শ্রুতির ব্যাখ্যায় শাস্ত্রকার বলেছেন—যা' শুনে চিনতে পারা যায় (অভিজ্ঞেয়ত্বম্) এবং সঙ্গীতে যার ব্যবহার হ'তে পারে (গীতোপযোগিত্বম্) তারই নাম শ্রুতি। তার থেকে এবং রাগ বর্ণনা থেকে এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে, শ্রুতির ব্যবহার ও প্রয়োগ প্রাচীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেও ছিল। স্বরের এই উচ্চ বা অনুচ্চ অবস্থাকে ইংরাজীতে intonation বলা হয়, আমরা বাংলাতে শ্রুতিভেদ কথাটা এইস্থানে ব্যবহার করতে পারি। প্রাচ্য সঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্বগুলির মধ্যে এইটী অন্যতম।

* * *

বাংলা ভাষায় খেয়াল বা ধ্রুপদ গাওয়া প্রায় উঠে গিয়েছে। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ও পশ্চিম দেশবাসী কয়েকজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী খেয়ালী ও ধ্রুপদী হিন্দুস্থানী ঢঙে বাংলা ভাষায় রচিত গান গাইতেন, তাতে আলাপ, তান সামান্যই থাকত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চেয়ে তার প্রকৃতি সরল ও সহজ ছিল। এমন কি, সে সময়কার থিয়েটারে হিন্দীগান ভেঙ্গে বিশুদ্ধ রাগে বাংলা গান রচনা হ'ত। কিন্তু এসব প্রাচীন গায়কদের কাছে শোনা কথা, তার থেকে মাত্র অনুমান করতে পারি, সে সময়কার বাংলা গানে সামান্য শ্রুতিভেদ থাকার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধে

---

* দ্বিতীয় সংখ্যায় Nature of Hindusthani Raga-melody-প্রবন্ধে স্কেলের পরিণতি ও শ্রুতির সার্থকতা যথাসাধ্য পরিষ্কার করে বলতে চেষ্টা করেছি।

আলোচ্য সঙ্গীত বর্ত্তমানের, সুতরাং তারই প্রকৃতি নির্ণয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হ'বে। বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল সেন ও কাজী নজরুলকে নতুন ঢঙের প্রবর্ত্তক বলা চলে। তাদের প্রত্যেকেরই গানে একটী নিজস্ব ছাপ পাওয়া যায়, যদিও প্রায় সকলেই দেশজ অর্থাৎ কীর্ত্তন, ভাটিয়াল, বাউল, রামপ্রসাদী, পুরাতন টপ্পা ইত্যাদির অনুকরণে গান রচনা করতে দ্বিধা করেন নি।

একথা বললে মিথ্যার দায়ী হ'তে হ'বেনা যে, বর্ত্তমান বাংলা গান হারমোনিয়মের সাহায্যে পুষ্ট হ'য়ে উঠেচে এবং এর কাল ২৫।৩০ বৎসরের বেশী হ'বে না। উল্লিখিত সঙ্গীত রচয়িতাদের কাছে শুধু গলায় গান শোনবার সৌভাগ্য হ'লেও, তাঁদের গান হারমোনিয়ম ছাড়া বাইরে কোথাও শুনেছি বলে স্মরণ হয় না। হারমোনিয়মের অনুকরণে স্বরপ্রয়োগের দরুণ শ্রুতিভেদ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। আমি বলচিনা, এর ব্যতিক্রম নেই বা সব জায়গায় গায়ক হুবহু হারমোনিয়মের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করেন। আমি বাংলা দেশের সাধারণ অবস্থার কথা বলচি। সস্তা ও সুবিধার যন্ত্র জাপানী মালের মত চারিদিক ছেয়ে ফেলচে, তা' ভাল কি মন্দ তাও এখানে বিচার্য্য নয়, কেবল তার ফলে বাংলা গান কি রকম দাঁড়াচ্চে, সেইটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

হারমোনিয়মের কথা যখন এসেচে, তখন একটু সবিশেষ বর্ণনাই ভাল। য়ুরোপীয়দের শুদ্ধ স্কেল (diatonic scale) প্রায় আমাদের বর্ত্তমান শুদ্ধ (বিলাবল) ঠাটের মতন। Diatonic scale-এর শুদ্ধ স্বরগুলির মধ্যে দূরত্ব অসমান। পিয়ানো বা হারমোনিয়মে যখন এই স্কেল ব্যবহার হ'ল, তখন দেখা গেল যে, শুধু সা থেকে গান-বাজনা আরম্ভ করলে, তাতে কাজ চলে, কিন্তু স্কেল যদি বদলায়, অর্থাৎ সঙ্গীতে রে, গা, মা, পা ইত্যাদিকে সা করা যায়, তা'হলে বহু নূতন স্বরের প্রয়োজন হয়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে স্কেল বদলান একটা রীতি, তাই তাঁরা দেখলেন, শুদ্ধ Diatonic scale ছাড়তে হয়। ফলে একটি সপ্তক (octave) বারটী সুরে পরস্পর থেকে সমান দূরত্ব (equal temperament) মেপে ভাগ করা হ'ল এবং সেইজন্য সা ছাড়া কোন স্বর শুদ্ধ রইল না। হারমোনিয়ম এইভাবে শুদ্ধ স্বর থেকে ভ্রষ্ট হ'ল। য়ুরোপীয়ের সহজ প্রবৃত্তি হচ্চে সুরের যুগপৎ ব্যবহারের সামঞ্জস্য (consonance), যেটা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁদের কানে এই tempered scale তত খারাপ লাগেনা, কিন্তু যখন ভারতীয় সঙ্গীতে এই যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার হতে আরম্ভ হ'ল, তখন ফলের জন্য বেশী অপেক্ষা করতে হ'ল না। একে ত হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স্বরগুলির কিছুই

পাওয়া গেল না, তারপর শ্রুতির বা মিড়ের বিশেষত্ব কিছুই থাকলনা।* দক্ষিণ ভারতেও যে এই নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হ'য়েছে Madras Music Academy-র প্রকাশিত সঙ্গীত-পত্রিকার প্রথম তিন চার খণ্ড তার সাক্ষ্য দেবে। বাংলা দেশেই হারমোনিয়মের প্রভাব সীমাবদ্ধ হ'য়ে নেই, পশ্চিমেও সাধারণের মধ্যে এর বিপুল প্রচার হচ্চে। সুখের বিষয় উচ্চ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কোনো ক্ষতি এখনও হয়নি, কারণ গায়কেরা এখনও তানপুরা ও সারেঙ্গ ছাড়া স্বরসাধনা করেন না। তবুও সেদিন বেহারের এক সহরে হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের শুনলাম হারমোনিয়মের সাহায্যে খেয়াল শেখাতে, সে গান আর যাই হোক্ হিন্দুস্থানী গান নয়, একথা নির্ভয়ে বলা চলে। কলকাতায় আমার একটী আত্মীয়া ছোট মেয়েকে গান শেখাবার জন্য একজন খ্যাতনামা মুসলমান ওস্তাদ নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। ওস্তাদ নিজে তান-পুরায় গান অভ্যাস করেচেন, কিন্তু এসে দেখলাম বালিকা গলার চেয়ে হারমোনিয়মের উপর ভরসা রাখে। প্রতিবাদ করায় তিনি বল্লেন, "কলকাতায় বাঙ্গালীর বাড়ীতে শিক্ষায় এই সাধারণ রীতি এবং যদি ইচ্ছে করেন তবে তানপুরাতে শেখাই।" আমাদের ইচ্ছে সেইরকম হওয়াতে তিনি তানপুরাতে শেখান আরম্ভ করেন।

বর্ত্তমানে আবার আর এক বিপ্লব আরম্ভ হয়েচে। তরুণ বাঙ্গালী গায়কদের হিন্দুস্থানী গান ভাল লাগে, তাই তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুস্থানী তান, আলাপ, খোঁচ ইত্যাদি বাংলা গানের মধ্যে প্রয়োগ করচেন।

---

*"If the Mohammedan 'Star' singer knew that the harmonium with which he accompanies himself was ruining his chief asset, his musical ear, and if the girl who learns the pianoforte could see that all the progress she made was a sure step towards her own denationalization as if she crossed the black water and never returned—they would pause before they laid such sacrilegious hands on Saraswati. Excuses may be made for such practices, but there is one objection fatal to them all, the instruments are borrowed. . . . . . To dismiss from India these foreign instruments would not be to check the natural, but to prune away an unnatural growth." Music of Hindostan, p. 16, Fox Strangways.

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানগুলিতে (লক্ষ্ণৌ, বরোদা ও গোয়ালিয়ার) হার্মোনিয়ামের প্রবেশ নিষিদ্ধ। গানের সঙ্গে বা বাজাবার জন্যে কোনভাবেই তার ব্যবহার নেই। Fox Strangways সাহেবের কাছে ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক কিছুই অবোধ্য ঠেকেছিল, কিন্তু তাঁর স্বদেশীযন্ত্রের সম্বন্ধে বলতে বাধেনি "Hence the serious menace to Indian music of the harmonium, which has penetrated already to the remotest parts of India. It dominates the theatre, and desolates the hearth; and before long it will, if it does not already, desecrate the temple. Besides its deadening effect on a living art, it falsifies it by being out of tune with itself" Ibid p. 164.

এতে প্রথমে কোন কোন দিকে সামান্য সুফল দেখা গেলেও, হারমোনিয়ম, আলাপ, তান, হিন্দুস্থানী খোঁচ ইত্যাদি মিশ্রিত হ'য়ে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড উপস্থিত হয়েচে। অনেকে এর প্রতিবাদ করচেন কিন্তু বর্ত্তমানে রেডিয়োর প্রোগ্রাম যে কোন রাত্রে শুনলে মনে হয়না তাতে বিশেষ কোনো ফল হচ্চে। সঙ্গীত-রচয়িতাদের নিজের বিশিষ্টতা যেতে বসেচে এবং এর যদি গতিরোধ না হয়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলা গান নানাবিধ বিভিন্ন প্রকৃতির সমন্বয়ে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে পরিণত হ'বে। গতিরোধের ভার আমার হাতে নয়, আমার কাজ শুধু অবস্থা-বর্ণনা। গায়করা বলতে পারেন, ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষত্ব হ'ল তার স্বাধীনতা। হিন্দুস্থানী গানে সঙ্গীত-রচয়িতার স্থান খুব উর্দ্ধে নয়। অতএব বাংলা গানের রচয়িতার উচ্চস্থান না স্বীকার করলে, আমাদের প্রাচ্য সঙ্গীত-বিধানের বিরুদ্ধে কিছু করা হ'ল তাও মনে হয় না। যাঁরা গায়কের স্বাধীনতা দাবী করেন, তাঁরা বলতে পারেন যে, আজ যেটি কৃত্রিম বলে মনে হচ্চে, দশদিন পরে তাই স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে। আদিম মানুষ পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে বিস্তর বদলেচে, সে বৃক্ষতল ছেড়ে দরবারেও পৌঁছিয়েচে। খাপ খাইয়ে নেবার তার যথেষ্ট শক্তি আছে। গানের বেলায় চলার দিকে প্রবণতা যে শুধু শাসনে স্থগিত থাকবে এমন মনে হয় না। এর শেষ সীমায় পৌঁছাবার সময় আতিশয্যটুকু সৌষ্ঠবের অভাবে ঝরে যাবে, এইটুকু ভরসাই আমরা করতে পারি। এটা অস্বীকার করা চলে না, হিন্দুস্থানী ঢং সামান্য পরিমাণে বাংলা গানে আনলে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়। অতুল সেন ও কাজী নজরুলের গানই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু সফলতা যখন সামান্য থেকে অসামান্য হ'তে চায়, অর্থাৎ বাংলা গান যখন পূরোপূরি 'হিন্দুস্থানী বেশ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে এবং তার ঢেউ যখন রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গীতে গিয়ে লাগে, তখন স্বতঃই মনে হয় "কোথা! কতদূর!" কিন্তু হারমোনিয়ম ছাড়া আরও কয়েকটী কারণ আছে যার জন্যে হিন্দুস্থানী ঢং বাংলা গানে আনা শক্ত।

হিন্দুস্থানী ও বাংলা সঙ্গীতে স্বরবর্ণের প্রয়োগে তারতম্য আছে। স্বরবর্ণের সাঙ্গীতিক মূল্য খুব বেশী, কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের মত তারা কণ্ঠ দিয়ে আসবার সময় জিহ্বা, তালু ইত্যাদি দ্বারা ব্যহত হয় না এবং তারা মুখে দুটি স্বরকক্ষের সৃষ্টি করে। এই স্বরকক্ষগুলিতে কণ্ঠের স্বর ছাড়া অন্য স্বরের অনুরণণ হয় এবং ঠোঁট গোলাকার ক'রে গালে অল্প জোরে আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করলেই সহজে সে-অনুরণণ শোনা যায়।* এই কারণে স্বরবর্ণের ব্যবহারে গানে খানিকটা অভিনবত্ব আসে। হিন্দুস্থানী গানে স্বরবর্ণগুলিকে

* এই প্রসঙ্গে Marris Music College, Lucknow থেকে প্রকাশিত Sangeeta-র দ্বিতীয় সংখ্যায় Nature of Hindustani Raga-melody দ্রষ্টব্য।

দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক ভাগই 'সা'তে গিয়ে শেষ হয়—

ই (মোরি)	উ (ঝুম)
এ (কহে)	অ (যব, ইংরাজীর Cup-এর u-এর ন্যায়)
আ (যাবো)	আ——

'ই'-তে ওষ্ঠ দুইপার্শ্বে বিস্তৃত হ'য়ে প্রায় মিলিত হয় এবং 'এ' হ'য়ে 'আ'-তে যাবার পথে ক্রমেই গোলাকার হয়। 'উ'-তে মুখ ক্ষুদ্র গোলাকার হয় এবং 'অ' হ'য়ে 'আ'-তে যাবার পথে ক্রমেই বিস্তারিত হ'তে থাকে। হিন্দুস্থানী গানে স্বরবর্ণের উচ্চারণ বাংলার মত স্থির থাকে না, একের থেকে অন্যতে যেতে চেষ্টা ক'রে,—যে কথা 'উ'-তে আরম্ভ হ'ল, সে 'উ' ছাড়িয়ে 'ও'-তে যেতে চায়। বাংলাতে স্বরবর্ণ প্রায় খাড়াখাড়া ভাবে থাকে। হিন্দী 'মোসে' ও বাংলা 'মোর' কথাটি পাশাপাশি গানে ব্যবহার করলে অর্থ পরিস্ফুট হ'বে। মুসলমান গাইয়েরা বিশেষ ক'রে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য (modulation) দেখান। বাংলা গানে স্বরবর্ণের অচল অবস্থা গায়কের কল্যাণে সামান্য সচল হয়েচে,—গানে খানিকটা হয়ই। কিন্তু ঠিক হিন্দুস্থানী-কথার গোচড় তাতে দিতে গেলে, নমনীয়তার বদলে বিকৃতিরই সম্ভাবনা। এটা অবশ্য নির্ভর করে গায়কের ও শ্রোতার কানের উপরে। কোথায় তার সীমা ও কোথায় সেটা অতিক্রান্ত হ'য়ে অত্যাচারে দাঁড়িয়েছে, এটা তাঁদের বিচার্য্য।

স্বরবর্ণ নিয়ে বলা হ'য়েছে, এবার শব্দতে উত্তীর্ণ হওয়া যাক্। হিন্দী গানে দরকার হ'লে উল্টেপাল্টে একই কথা বারবার গাওয়া যায় আর একটী শব্দকে টুকরো ক'রে বাড়ানরও রীতি আছে। অতুল সেনের 'আমার বাগানে এত ফুল, সে ত নাহি ফিরে চায়' গানটী নেওয়া যাক্। হিন্দী ঠুংরীর ছাপ অতি স্পষ্ট, গানের ঢঙেও সহজেই তা' চোখে পড়ে 'সে ত নাহি ফিরে চায়' স্থানটী একটি ঠুংরীর 'তোসে নাহি বলু রে'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে গায়কের স্বতঃই চেষ্টা হ'বে 'সেত' কথাটী 'তোসে'র মত ভেঙ্গে 'সেত——', 'সে——ত , ইত্যাদি নানা প্রকারে হিন্দী কথার অনুকরণে বারবার বলা ও ভাঙ্গা। আজকাল শ্রুতিকটু লাগলেও কে জানে পরে এটা সহ্য হ'য়ে যাবে কি-না। পুরোনো ঢঙের টপ্পা শুনলে দেখা যায়, বাংলা গানে তান প্রায় শব্দের শেষ অক্ষর টেনে করা হ'ত। স্বর্গীয়া বিনোদিনীর 'এমন যে হবে প্রেম যাবে এ ত কভু মনে ছিল না' গানটীতে আরম্ভতে 'হবে', 'মনে', 'ছিল না' শব্দের শেষ অক্ষর টেনে তান নেওয়া হয়েচে। তানেতে বাংলা শব্দকে যে কখন ভাঙ্গা হয় না, এমন কথা নয়,—তবে সে তত সাধারণ নয়।

হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানের মধ্যে কতকটা মিল থাকলেও তাদের প্রকৃতি সর্ব্বাংশে এক যে নয়, সেটা বোঝা যায় দুই বিভিন্ন প্রকৃতির দরুণে (emotional element)। এটা কথায় বোঝান শক্ত। দুটো যে এক নয়, তা' তীব্রভাবে কানে আসে যখন এক অন্যকে স্বস্থানভ্রষ্ট করে, বেমানান ও অশোভন হচ্ছে, এ-ছাড়া অন্য কিছু তখন মনে আসে না। এর সীমারেখার নির্দ্দেশ কঠিন, তবু দুই সঙ্গীতে কথার স্থান বিচার করলে খানিকটা পরিষ্কার হ'তে পারে। বাংলা গানে কথার একটা গুরুতর অংশ থাকেই, হিন্দুস্থানী গানে যার বিশেষ কোন অর্থ নেই। নিছক গানের ভাব বাংলা গানে কথাকে একেবারে অবহেলা করতে পারে না, যা' হিন্দুস্থানী গানে সম্পূর্ণ সম্ভব ও শোভন। বাংলায় অর্থের জটিলতা সুরের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলে এমন বলি না, তবু গায়ককে অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়ই। কথার নড়চড় কোথাও একটু হ'লে, শ্রোতার বিরক্তির অবধি থাকে না। বাংলা গান এর কারণে দোষার্হ নয়, তার প্রকৃতিই এ রকম। হিন্দুস্থানী গানে শক্ত ও সূক্ষ্ম ভাব নেই বল্লেই হয়, এবং একই গানের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ হ'লেও তাতে রসসৃষ্টির অসুবিধা হয় না। লক্ষ্ণৌতে এক ওস্তাদ ও বাইজীকে একটি ঠুংরীর শুধু 'ওরি ননদিয়া' কথাটী নিয়ে গাইতে শুনেছিলাম, মজলিসে শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও সজল চক্ষু দেখে মনে হয় নি কেউ তাতে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন। এতটা সংক্ষেপ অবশ্য সাধারণ নয়, তবে এক লাইন গেয়ে গান শেষ করা অনেকবারই শুনেছি।

কেউ কেউ বলবেন, বাংলা গানকে যে হিন্দুস্থানী ঢং-এ ঢেলে সাজবার চেষ্টা হচ্ছে, এ কেন? যাঁদের নির্জ্জলা হিন্দুস্থানী ঢং ভাল লাগে, তাঁদের জন্য হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরীর অভাব নেই। তাঁদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কৃতিত্ব প্রদর্শনের পূর্ণ অবকাশ আছে। হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীত বাংলায় বিদেশী নয়। কতদিন থেকে বাঙ্গালী গায়কেরা তার চর্চ্চা রেখেচেন, তাতে উত্তর ভারতের সকলেরই দাবী আছে। হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান এতদিন স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি থাকল, আজ তাদের সংঘর্ষের নতুন কিছু communal কারণ ঘটেনি। বাংলা গান হিন্দুস্থানীর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে না ব'লে তার প্রতিষ্ঠা, সম্মান সব চলে যাবে, এমন কোন কথা নেই। আদান-প্রদান কাছাকাছি থাকলে হয়ই, কিন্তু সেটা উগ্র হ'য়ে যদি বাঙ্গালীর নিজস্ব স্বরূপ-প্রকাশের পথ রুদ্ধ ক'রে ফেলে, তবে তা' বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী কারুর পক্ষে শুভ হ'বে কি-না ভাববার সময় এসেচে।

পশ্চিম থেকে এল হারমোনিয়ম, তা'ও আবার বিদেশীয় স্বরসঙ্গত নিয়ে, আমরা তাকে যোগ করলুম প্রাচ্য সঙ্গীতের সঙ্গে। ফলে দাঁড়াল

এই যে বাংলা গান পূর্ব্বে যা ছিল তার লোপ হ'ল, যা কিছু সহরের বাইরে বাঁচল তাও যেতে বসেচে। বিদেশী সবই খারাপ নয়, কিন্তু গ্রহণেও সৌষ্ঠব জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাচ্য সঙ্গীতে বিদেশী ছাপ পড়েচে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত যে প্রাচ্যের কাছে কিছু নেয়নি এমন নয়। আন্তর্জাতিক পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-রক্ষার দোহাই দিয়ে কোন আর্টকে বাঁচাবার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি নেই। কিন্তু নেওয়ারও একটা রীতি আছে, আহৃতকে যদি আমরা নিজস্ব ক'রে না নিতে পারি, অর্থাৎ তাতে যদি ভারতীয় বিশেষত্বগুলি অটুট না থাকে, তবে সেটা ত্যাগ করতে হ'বে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে jazz আফ্রিকার নিগ্রো ছাপ নিয়ে এল, সেখানে লোকের তাই ভাল লাগে, কিন্তু মূল সূত্র তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু যেখানে হারমোনিয়ম রাগের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করে, সেখানে আপোষে মীমাংসা করা দুষ্কর। বাংলা রচয়িতাদের মধ্যে কারুর কারুর উপরে বিদেশীর ছাপ সুস্পষ্ট, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তারা পূর্ণতা ও সুসংহতি লাভ করতে পারে। বাইজীদের ঠুংরীতে য়ুরোপীয় melody-র দু-একটা টুকরো কখনও কখনও শোনা যায়, কিন্তু সারেঙ্গির সঙ্গে তা' কিছু বেমানান লাগেনা। কিন্তু হারমোনিয়াম ছাড়া যদি তাকে গাওয়া না চলে, তবে তাকে নিয়ে ঘর করা মুস্কিল। সমাজের নিম্নস্তরের দিকে তাকালে ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট হ'বে। সমস্ত উত্তর ভারতে বিলিতীর অনুকরণে কর্ণেট, ড্রাম, ক্লারিওনেট ইত্যাদির সহযোগে একরকম ব্যাণ্ড তৈরি হয়েচে। এদের গৎএর ১২ আনা ধাঁচ হ'ল বিদেশী। এরা উৎসবে ও ব্যসনে বাজায় এবং থিয়েটার ও সিনেমার হ্যাণ্ডবিল বিলি করে। পশ্চিমে কোন কোন সিনেমায় হারমোনিয়ম ও তবলা নিয়ে যে সুরসঙ্গতের সৃষ্টি হয়, তাতে বিজাতীয় অংশই বেশী। বাংলাতে ঘরে ঘরে অর্গ্যানে chord দিয়ে যে বাজনা হয় তাও প্রাচ্য নয়। এরা হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতে এসে না পড়লেও অবহেলার বস্তু নয়। ভারতীয় চিত্রকলায় একদিন য়ুরোপীয় অতি নিকৃষ্ট চিত্রের অনুকরণ আরম্ভ হ'য়েছিল, লোকে তা' বুঝেছিল আর তার প্রতিকারও হ'য়েচে। উচ্চ সঙ্গীতকে রেডিয়ো ও গ্রামোফোন কোম্পানীরা ব্যবসাদারির খাতাতে আমল দিতে চান না। প্রথম প্রথম ক্ষতিস্বীকার ক'রে কখনও দেখা হ'লনা সাধারণের কি ভাল লাগে। উচ্চ সঙ্গীতের প্রসার বাড়লে একদিন রুচির উন্নতি হ'বে কি-না তা বলা শক্ত। হিন্দুস্থানীর প্রভাব বাংলা গানে আমরা সইতে পারব, কারণ সে যাই হোক্ ভারতীয়, কিন্তু হারমোনিয়মের ধাক্কার জের কাটিয়ে বাংলা গান কতটা প্রাচ্য থাকবে, আজকাল তাই ভাববার বিষয় হয়েচে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়
লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত কলেজ

কবিতাগুচ্ছ

ভিক্ষা-উৎসব

গগনে মেঘেরা গরজায়,
বরষা তিমির-বরণী,
সুন্দর, মম দরজায়
অতিথি আজিকে ধরণী।
নিদাঘ-সায়র বাহিয়া
এসেছে সে মোরে চাহিয়া,
কি কাতর গীতি গাহিয়া
হৃদয়ে ভিড়াল তরণী!

তিমিরে নাহিয়া পরিল
মেঘ-ডুম্বুর প্রাবরণ,
সকল অঙ্গে ধরিল
ইন্দ্রনীলের আভরণ,
বিদ্যুৎ তার ঝলকে
স্নিগ্ধ সজল অলকে,
গাগরী ভরিয়া ছলকে
তীর্থ-সলিল আহরণ।

গগনে মেঘেরা গরজায়,
বরষা তিমির-বরণী,
সুন্দর, মম দরজায়
অতিথি আজিকে ধরণী।
কথা ছিল, তার লাগিয়া
বাতায়নে র'ব জাগিয়া
এ-হৃদয় অনুরাগিয়া
উজলিব তার সরণি।

হায় গো আমার হৃদয়ে
নিবেছে প্রদীপ-সলিতা;
তুমি জানো তাহা নিদয়ে,—
কেমনে তাহারে বলি তা'!
কথা ছিল, যবে আসিবে
জ্যোতিঃর জোয়ারে ভাসিবে,
উৎসব-রাতি হাসিবে
বিহগ-কাকলী-কলিতা।

সব গান মোর থেমেছে,
সুন্দর, তাহা জানো ত?
নিবিড় আঁধার নেমেছে
ভরি' আঁখি-দুটি আনত।
তবুও সাহস নাহিরে
অতিথিরে রাখি বাহিরে,
এসেছে সে মোরে চাহিরে,
এ লজ্জা মোর মানো ত?

ডেকেছিনু করি' দেয়ালা
বসন্ত নাহি ফুরাতে,
তখনো হৃদয়-পেয়ালা
ভরা ছিল মধু-সুরাতে।
তখনো দীপক বাজিছে,
দীপালিতে-গৃহ সাজিছে,
সব-শেষে এল আজি সে
শূন্য হৃদয় কুড়াতে!

হায়, আমি মধু-ঋতুরে
পারিনি ধরিয়া রাখিতে,
এ কোন্ আলোক-ভীতুরে
বহে' ফিরি আজ আঁখিতে!
মন-দেওয়া-নেওয়া ফুরাল,
শিরাতে শোণিত জুড়াল,
দুহাতে কে পুঁজি উড়াল
বেসাতির বেলা থাকিতে!

গগনে মেঘেরা গরজায়,
বরষা তিমির-বরণী,
সুন্দর, মোর দরজায়
অতিথি আজিকে ধরণী !
এসেছে সে কত আশাতে,
কি গাহিব কোন্ ভাষাতে,
পারি যে কাঁদাতে হাসাতে
কোথা গীতি সুধাক্ষরণী।

তুমি যদি শুধু আসিতেঁ,
আপনি দীপালি জ্বলিত।
না হয় ভালো না বাসিতে,
ফুলের ফসল ফলিত।
যদি ঐ দুটি চরণে
আঁকিতে শোণিতবরণে
পারিতাম, সুধাক্ষরণে
বিশুষ্ক হিয়া গলিত।

নব বরষার এ তিথি,
বন্ধু গো, তব দোষ নাই।
তোমারও কুটীরে অতিথি,
সেথা আজি তাই রোশনাই।
তাই ভালো, দাও ভুলায়ে,
উৎসব-দোলে দুলায়ে,
দুনয়নে আনি বুলায়ে
তব নয়নের জ্যোৎস্নাই।

বন্ধু, ও রূপ-রাশিতে
মোর রাত হবে রূপালী,
বাজিবে তোমার বাঁশীতে
আমারই ইমন-ভূপালি।
তোমারই উৎসবে গো
উৎসব মোর হবে গো,
তব দীপদানে র'বে গো
জ্বালা আমারই দীপালি।

সুন্দর, মোর কুটীরে
থাক্ থাক্ তুমি এসো না।
অশ্রু-নয়ন-দুটিরে
কৃপা করে' ভালো বেসো না।
অতিথিরে ল'য়ে সাথে আজ,
তব উৎসব-রাতে আজ
যদি এসে জুটি, তাতে আজ
শ্লেষ ভরে শুধু হেসো না।

গগনে মেঘেরা গরজায়,
নব-বরষার এ তিথি,
সুন্দর, মোর দরজায়
ধরণী আজিকে অতিথি।
ভুলাও ঝলসি' চোখ তার
ভেদ ভিক্ষুক-ভোক্তার,
তব উৎসবে হোক্ তার
মম উৎসব প্রতীতি !

গগনে মেঘেরা গরজায়,
বরষা তিমির-বরণী,
সুন্দর, তব দরজায়
অতিথি আমার ধরণী।
ভুলে যেও কাল প্রভাতে
এসেছিল তব সভাতে,
আজিকে ভিখারী লোভাতে
সাজো গো হৃদয়-হরণী !

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

সমাপ্তি

আমাদের প্রেমে ফুরালো কথার পালা,
মন জানাজানি কিছু না রহিলো বাকী।
বাসনার দীপে নিবিলো নিবিড় জ্বালা,
বাসর-শয়নে নীরবে নমিলো আঁখি।
এবার কেবল আঁখিতে আঁখিতে লাগা,
দুটিতে মিলিয়া একটি স্বপনে জাগা।

এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা,
অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা।
এবার প্রেমেরে মনের আড়ালে মানা,
চির চেতনার চির বেদনারে ভোলা।
আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি,
এতখনে হলো উদ্দামতার ক্ষান্তি।

চুম্বনতাপ হিম হয়ে আসে ধীরে,
চুম্বনছাপ জাগিবে যামিনী ভোর।
ক'টি নিমেষের চকিত সুখস্মৃতিরে
জননীর মতো আবরিবে ঘুম ঘোর।
আমাদের প্রেমে এলো মরণের বেলা,
তারপরে, প্রিয়ে, আজি জনমের খেলা। ন

নবীন প্রেমের স্বপ্নে পোহাক রাত্রি,
মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে রও গো মনের পাছে।
অচির মরণে চির জনমের সাথী,
এখনো তোমারে চিত্ত আমার যাচে।
প্রভাতে হেরিবো তোমারি অচেনা মুখ
আমার পাশের উপাধানে জাগরূক।

আজিকার মতো ফুরালো হিয়ার দ্বন্দ্ব,
জানি ভালোবাসো, জানালাম ভালোবাসি।
মৃদু হয়ে এলো অধীর আবেগ অন্ধ,
মুদিত নেত্রে ভাতিলো তৃপ্ত হাসি।
আমাদের প্রেম এতই মধুর হলো,
আজিকার মতো তাই নিঃশেষে ম'লো ॥*

বাণীহারা

আমার দিন যায় কাজে অকাজে,
আমার নিশি যায় নিগূঢ় লাজে।
কেন যে আসা মোর, কেন যে থাকা
কালিও ঢাকা ছিলো আজিও ঢাকা।
হিয়ার হায়-হায় থামিলো না যে
জীবন বহে' গেল ফাঁকিতে ফাঁকা।

বীর সে করে' যায় পরাণ পণ,
মরণে মরে না রে তার স্মরণ।
কবি সে ছবি লেখে গানের ছাঁদে,
শতেক যুগ তার ক্রৌঞ্চী কাঁদে।
আমার আজ যদি আসে মরণ
কিছু কি বাঁধা রবে কালের বাঁধে?

এ শোভাবতী ধরা কাঁদায় মোরে,
কিছুই রাখি নাই, নয়নে ভরে'।
নূতন লাগে সবি, যতই হেরি,
রূপের পারাবার কূপেরে ঘেরি'।
জনম দিন মম চলে আজো রে
কিছুই চিনি নাই এ ভুবনেরি।

---

* "একটি বসন্তে"র শেষ কবিতা

আকাশ ছুঁড়ে মারে আলোর সোনা,
জমানো সোনা মোর যায় না গোণা।
পাখীরা গান হানে কানের কাছে,
মরমে পশি গান চরণে নাচে।
পাগল করে' দিল সুখ বেদনা,
প্রাণে কি আর মম চেতনা আছে!

জীবন যাবে তবু যাবে না বলা
কী মধুরতা দিলো অপথে চলা।
নয়ন মুদে চলি দিকে বিদিকে,
চুমিয়া যায় কারা নাম না লিখে।
অপথে চলা মোর নয় বিফলা,
সকলে ভালোবাসে ভোলা পথিকে।

"ধন্য করে' দিলে জীবন মম"—
কহিতে কথা রই মূকের সম।
সে বাণী বুক ছাড়ি' মুখের পানে
যখনি পাড়ি দেয়, হারায় মানে।
হে মোর প্রেমিকেরা, ক্ষমো গো ক্ষমো,
দিলে যা রহিলো না এ ক্ষীণ গানে।

যায় রে দিন যায়, যায় রে নিশা,
আমার থেকে যায় দানের তৃষা।
সকল দিতে চাই একটি স্তবে—
"ধন্য এসেছিনু ধনীর ভবে।"
ধনের একে একে পেয়েছি দিশা
দু'হাত খালি করে' বিলাবো কবে?*

* "একটি বসন্তে"র একটি কবিতা

CREDO

মনের কথা মনের মতো ক'রে
কইবো আমার মনের মতনকে
কবি হবার নাই দুরাশা ওরে,
সার মেনেছি সত্য কথনকে।
দৈব যদি হয় রে অনুকূল,
আয়ুস্ যদি আশার মতো হয়,
প্রিয়ার কেশে পরিয়ে হিয়ার ফুল
জানিয়ে যাবো পূর্ণ পরিচয়।
যশ অপযশ এখন হতে কেন?
হয় নি আজো চরম দানের দিন,
কীর্ত্তিরে ভাই ভুলতে পারি যেন,
নইলে আমার কীর্ত্তি হবে ক্ষীণ।
মিথ্যা করিস্ শক্তি পরিমাপ,
মোর তুলনা খুঁজিস্ বৃথা রে,
একটি প্রাণে রইলে প্রাণের ছাপ—
ঐ তো আমার সার্থকতা রে।
সবার মাঝে না যদি হই বড়
একটি হিয়ার শ্রদ্ধা যেন লভি,
প্রিয়ার কাছে হইলে প্রিয়তর
হলেম আমি যা হতে চাই সবি।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

অর্দ্ধনারীশ্বর

সম্মুখেতে দুঃস্বপ্নের মতো রুক্ষ কঠিন আকাশ,
পদতলে ষ্টীল্‌-নীল পারহীন গভীর সাগর,
—দোলরাত্রি নহে, নহে কোজাগরী যামিনী জাগর,
খরসূর্য্য চক্ষে মোর, রসহীন শাণিত বাতাস
পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি' চলি' পর্ব্বতের 'পর।
কৃষ্ণ পর্ব্বতের স্থূল অঙ্গে নাই সবুজের বাস—
উলঙ্গ পর্ব্বতে কভু উর্ব্বশীর পড়ে নাই শ্বাস।
চলিয়াছি পূজিবারে মন্দিরের অর্দ্ধনারীশ্বর।

উঠিলাম ক্লান্তদেহ শান্তমনে সর্ব্বোচ্চ শিখর—
কোথায় মন্দির হায়! বর্ণহীন মরুভূ আকাশ,
আর শুধু তৃণশ্যাম সূচ্যাগ্র এ-কোমল প্রান্তর
আর শুধু বহুদূরে অন্তহীন উদার সাগর—
অকস্মাৎ হেরিলাম মূর্ত্তি তার ক্লান্ত গতভাষ।
ভাষাহীন দেঁহে মোরা পূজিলাম অর্দ্ধনারীশ্বর।

বজ্রপাণি

কাল রজনীতে এসেছিল যবে বৈশাখীপূর্ণিমা,
আকাশের গায়ে লেগেছিল যবে শ্বেতচন্দনলেপ,
বাতাস দেখাল স্নিগ্ধ মধুর কুমারীর ভঙ্গিমা—
তোমার দূতেরে পাঠাইলে হায় রুদ্র বজ্রপাণি!

ফুলেরা শয়ান ডাঙ্গাইয়ের মতো প্রতীক্ষদেহমনে,
নিঃশ্বাসে মোর গন্ধে আতুর ভারাক্রান্ত মোহে,
রাধিকা চাঁদের আবেশ ঝরিছে সবুজ কুঞ্জবনে—
মুছে' দিলে হায় পিঙ্গলিমায় সোমপ বজ্রপাণি!

সুঠাম সুশ্রী মেদসুকোমল প্রিয়ারে বক্ষে ধরি'
গলিতেছিলাম অর্থবিহীন সুমধুর কাকলিতে,
নাগরিকা মোর করুণ কোমল—মোদেরে লক্ষ্য করি'
দধীচিঅস্থি হানিলে কঠোর, কঠিন বজ্রপাণি!

সুগঠিত প্রেম, বাসনাবিলাস, উপবনপূর্ণিমা
দূর করে' দিলে ঘোর ঝঞ্ঝায় চূর্ণ চূর্ণ করি',
যে ভুবনে মোরে নিয়ে' এলে—কোথা নারীদেহরঙ্গিমা?
তোমারে আমার বন্ধু করিয়া কি লাভ, বজ্রপাণি?

শ্রীবিষ্ণু দে

কবিতা

(রসেটির Troy Town পঠিতব্য)

আজ মাঝ-রাতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুট্‌বে যখন,
ঘুম ফেলে' দিয়ে তুমি চলে' এসো এখানে ;—কেমন ?
মুখোমুখি বসে' কবিতা পড়্‌বো আমরা দু'জন।
(হেলেনের বুকে মনের বাসনা বেঁধেছে বাসা,
মনের বাসনা সকল কালের সব পুরুষের—
ভেঙে গুঁড়ো হ'লো ট্রয় !)

ছুট্‌বে বাতাস, শুক্‌নো বাতাস, কাঁপ্‌বে আকাশ ;
পূবের সবুজে দেখা যাবে লাল চাঁদের আভাস।
চুল খুলে' দিয়ে তুমি চলে' এসো এখানে ;—কেমন ?
(হেলেনের বুক নিখুঁত, নিটোল, নরম, সাদা,
ফলেছে সেখানে মনের বাসনা সব পুরুষের—
পুড়ে' ছাই হ'লো ট্রয় !)

পূবের রেখায় গাছের সবুজ হয়েছে গভীর,
সেখানে ফুট্‌বে ছোট, একমুঠো চাঁদের আবীর।
মুখোমুখি বসে' কবিতা পড়্‌বো আমরা দু'জন।
(হেলেনের বুকে দু'টি পাকা ফল ভরেছে রসে,
বাসনার রসে সকল কালের সব পুরুষের—
পুড়ে' খাক্ হ'লো ট্রয় !)

আকাশের মাঠে ফুটে র'বে তারা ফুলের মতন,
উদার আকাশে হাজার তারার হাজার নয়ন—
মুখোমুখি বসে' কবিতা আমরা পড়্‌বো যখন।
(আফ্রোদিতের মন্দিরে গেলো অর্ঘ্য দিতে
স্পার্টার রাণী হেলেন—বাসনা সব পুরুষের।
—ভেঙে গুঁড়ো হ'লো ট্রয় !)

ঘুম ফেলে' দিয়ে তুমি চলে' এসো, খুলে' ফেলে' চুল,
এলোচুল তব হাল্‌কা হাওয়ায় উড়্‌বে আকুল—
শুক্‌নো বাতাস, ঠাণ্ডা বাতাস ছুট্‌বে যখন।
(হেলেন রচেছে অর্ঘ্য নিজের বুকের ছাঁচে—
সোনার বাটি সে—মনের বাসনা সব পুরুষের।
—চুরমার হ'লো ট্রয় !)

নড়্‌বে হাওয়ায় ঢিলে ব্লাউজের চওড়া কিনার,
চুলগুলি সব চোখে আর বুকে, চিবুকে তোমার
ঝর্‌বে হাওয়ায় ;—কবিতা আমরা পড়্‌বো যখন।
(স্পার্টার রাণী ভিনাসের পায়ে আনতজানু—
সোনার সে-বাটি মধুর দুরাশা সব পুরুষের।
—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয় !)

মেঝের ওপর মেঘের মতন শাড়ির আঁচল
লোটাবে তোমার ;—আঁচল, ঘুমের মতন শীতল,
পুরোনো কবির পুরোনো কবিতা পড়্‌বো যখন।
(আফ্রোদিতেকে অর্ঘ্য দিয়েছে সোনার বাটি
স্বর্গ-দুহিতা হেলেন—দুরাশা সব পুরুষের।
—পুড়ে' খাক্ হ'লো ট্রয় !)

টেবিলের আলো হাতের বইতে, হাতে আমাদের ;
চুলে আর চোখে ঘুম-ভাঙা, রাঙা আধেক চাঁদের
মলিন জ্যোছ্‌না—কবিতা আমরা পড়্‌বো যখন।
(সোনার সে-বাটি গড়া হেলেনের বুকের ছাঁচে
স্বাদে আর সাধে, বিষাদে ভরেছে সব পুরুষের—
ছারখার হ'লো ট্রয় !)

পৃথিবী নীরব, আকাশ নীরব, সব চুপচাপ,
কেবল বাতাস পাতায়-পাতায় বক্‌বে বিলাপ,
কেবল আমরা কবিতা পড়্‌বো—আমরা দু'জন।
(ভিনাসের পায়ে নতজানু হ'য়ে কহিছে কথা
দেবতা-দুহিতা হেলেন—কবিতা সব পুরুষের।
—চুরমার হ'লো ট্রয়!)

উতল বাতাস, মাতাল বাতাস, রাতের বাতাস,
বাতাসের ভাষা শুন্‌বে পাতারা, শুন্‌বে আকাশ ;
পুরোনো প্রেমের কবিতা পড়্‌বো আমরা দু'জন।
('আমার বুকের ছাঁচে গড়া এই সোনার বাটি
বাসনার রসে আনিয়াছি ভরে' সব পুরুষের।'
—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয়!)

বিশাল সাগর পার হ'য়ে এসে বাতাস পাগল
জানালার কাছে চীৎকার করে' আবোল-তাবোল
বক্‌তে থাক্‌বে—আমরা কবিতা পড়্‌বো যখন।
('চেয়ে দ্যাখো, দেবী, মোর দুই স্তন উঠেছে ফুলে',
স্বপ্ন—স্বর্গ—মৃত্যু—মহিমা সব পুরুষের।'
—পুড়ে' ঝুরি হ'লো ট্রয়!)

সারা পৃথিবীরে ঘুরে' ঘুরে' যাবে বাতাস পাগল,
সারা রাত ভরে' সকল পৃথিবী দেবে সে টহল ;
আমরা দু'জন প্রেমের কবিতা পড়্‌বো যখন।
('এই নাও, দেবী, মোর উপহার—বুকের বাটি,
দাও তা'র মনে মনের বাসনা সব পুরুষের।'
—ঝুরি-ঝুরি হ'লো ট্রয়!)

বাতাসের মুখে নৌকোর মত আধখানা চাঁদ
আকাশের বুকে ছুটতে থাক্‌বে—চাঁদ উন্মাদ!
উন্মাদ চাঁদ—উন্মন-মন আমরা দু'জন।
('দাও তা'র মুখে স্বাদ আর সাধ আর বিষাদ
আমার মুখের ;— সুদূর দুরাশা সব পুরুষের।'
—ছারখার হ'লো ট্রয়!)

এলো তব চুলে ঝিকিমিকি-আলো নাচ্‌বে চাঁদের,
মোরা মুখোমুখি, মেলি হাতে বই, মাঝে আমাদের
টেবিলের 'পরে ঘন-নীল আলো জ্বল্‌বে ;—কেমন?
('আমার বুকের দিকে চেয়ে দ্যাখো, আফ্রোদিতে,
তাহার স্বপ্নে দাও এ-স্বপ্ন সব পুরুষের।'
—চুরমার হ'লো ট্রয়!)

বই থেকে চোখ তুলে' মাঝে-মাঝে তাকাবো তোমার
আলো-ছায়া ভরা চুলে আর চোখে—চোখের তারার
গভীর কালোয় ; তুমি মুখ তুলে' হাস্‌বে—কেমন?
('দ্যাখো, মোর বুকে দু'টি পাকা ফল ভরেছে রসে—
বাসনার রসে সকল কালের সব পুরুষের।'
—পুড়ে' খাক্ হ'লো ট্রয়!)

পুরোনো প্রেমের পুরোনো কবিতা পুরোনো কবির
গভীর প্রহরে মোদের হৃদয়ে বাজ্‌বে গভীর,
ঘুমের সময়ে প্রেমের লেখন পড়্‌বো যখন।
('জ্বালো তা'র মনে বিশাল বাসনা, দুরাশা জ্বালো—
আমার চুলের স্বাদে ঘুম ভেঙে দাও প্যারিসের।'
—দাউ-দাউ জ্বলে ট্রয়!)

জানালার কাছে চীৎকার করে' মর্‌বে বাতাস,
জানালার কাচে মূরছি' পড়িবে ভোরের আকাশ।
মলিন আলোয় কবিতা পড়্‌বো আমরা দু'জন।
(স্পার্টার রাণী ভিনাসের পায়ে আনতজানু—
নরম চুলের স্বাদে ভেঙে গেলো ঘুম প্যারিসের।
—ছারখার হ'লো ট্রয়!)

* * *

পূবের সবুজে সাদা হ'য়ে ফোটে ভোরের আকাশ,
রাতের, দিনের মাঝখানে এসে ঝিমায় বাতাস।
বই শেষ করে' চুপচাপ বসে' আমরা দু'জন।
(কোথায় ভিনাস! কোথায় বা সেই বুকের বাটি!
বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের—
পোড়ে লাখো-লাখো ট্রয়!)

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

অনুবাদ

বিচ্ছেদ

[প্রুস্তের আট ভাগে প্রকাশিত 'অতীতের অন্বেষণে'-নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড থেকে এ-কয় পৃষ্ঠা নেওয়া। প্রথমভাগে যে-সোয়ান্ ও ওদেতের প্রেম ও বিবাহের কাহিনী আছে, তাদেরই মেয়ে হ'ল জিল্‌বের্ত সোয়ান্। গল্পের নায়ক ও লেখক তাকে শিশুকালেই ভালোবেসেছিল—প্রায় জন্মের পর থেকে বল্লেই হয়। এখানে সে জিল্‌বের্ত-প্রেম শেষ হ'ল।]

সে বছর জানুয়ারির পয়লা আমার ভারি কষ্টে কেটেছিল। অবশ্য দুঃখের সময়ে বিশেষ স্মরণীয় তারিখমাত্রেই আমাদের পক্ষে কষ্টকর লাগে। যখন বন্ধু বিচ্ছেদ আমাদের দুঃখের কারণ হয়, তখন সে কষ্ট বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতের তফাৎটা বিশেষ স্পষ্ট করেই ক্ষান্ত হয়। আমার বেলায়, কিন্তু, এ-বেদনার সঙ্গে গোপন একটা আশাও ছিল। আমি ভেবেছিলুম জিল্‌বের্ত বোধহয় ভেবেছে আমাদের মনোমালিন্যের পরে পুনর্সন্ধির চেষ্টাটা আমার তরফ থেকেই হবে ও আমি সে-চেষ্টা করলুম না দেখে নিজেই নব বৎসরের সুযোগ পেয়ে চিঠি লিখবে। লিখবে: "কি হ'ল বলো ত? উন্মাদের মতো প্রেমে পড়ে রয়েছি, জানো? শীগ্‌গীর এসো। সব বোঝাপড়া করা যাবে। তোমায় না দেখে কষ্ট পাচ্ছি।" গত বৎসরের শেষ দিনগুলো যখন কেটে যেতে লাগ্‌ল, তখন এ-রকম একটা চিঠি পাওয়া আমার সম্ভব মনে হ'য়েছিল। সম্ভাবনা হয়ত কিছুই ছিল না, কিন্তু কোনো কিছু সম্ভব মনে করতে ত আমাদের যুক্তির দরকার হয় না, আমাদের ইচ্ছায়, আমাদের প্রয়োজনেই আমরা তা' মনে করি। তাই ত যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক মনে করে যে শত্রুর গুলি তার উপর এসে পড়তে অনির্দ্দিষ্ট কাল বিলম্ব আছে, ধরা পঁড়বার আগে চোরও দেরি আছে মনে করে, মৃত্যুকালে মানুষও সেই রকম ভাবে। এই মনে করার রক্ষাকবচই লোককে বাঁচিয়ে রাখে,—অনেক সময়ে একটা জাতিকেও,—এবং বিপদ থেকে যে বাঁচায়, তা' নয়, বিপদের ভয় থেকে বাঁচায়, বিপদ যে আছে, সে-ধারণা থেকেই বাঁচায়। এই রকম মনে করতে পারে ব'লেই মানুষের সাহস আসে, এবং বীরত্ব বিনাও সে বিপদটা জয় করতে পারে। এই রকম ভিত্তিহীন বিশ্বাসেই ঝগড়ার পরে প্রেমিক চিঠির আশা করে। আমি যদি চিঠি পাবার ইচ্ছা না করতুম ত নিশ্চয়ই চিঠি পাব ভাবতুম না। যাকে ভালোবাসি তার কাছে আমার কী সামান্য মূল্য জানলেও আমরা এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে, সে ত আমার কথাই ভাব্‌ছে (যদিচ তার ফল হয়ত ঔদাসীন্যই), আর সে এই ভাব্‌নাগুলো ত প্রকাশ করবে। মনে

করি যে, তার চিন্তায় আমার প্রতি প্রেম না থাকুক্, তার চিন্তাধারা ত আমাকে নিয়েই ; আমাকে নিয়েই ত তার জীবনের পাক জটিল হ'ল। কিন্তু জিল্‌বের্তের মনে কি হচ্ছিল, তা' ঠিক জান্‌তে হ'লে, কিছুকাল পরে যখন জিল্‌বের্তের মনোযোগ বা ঔদাসীন্য, স্নিগ্ধতা বা কঠিনতা কিছু লক্ষ্যই করব না, সেই ভবিষ্যতের ঔদাসীন্য আমার থাকা দরকার ছিল। কিন্তু সে ঔদাসীন্য থাকলে নববর্ষের এ-সব সমস্যা আমার মনে উঠত না ও তার সমাধান করবার চেষ্টাও করতুম না, করবার কথা ভাবতুমই না। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে থাকে, তখন তার প্রেমের বিপুলতা তাকে ছাপিয়ে যায়। তার প্রেম রশ্মির মতো প্রেম-পাত্রের দিকে ধায় এবং সেখানে লেগে যেখান থেকে বেরিয়েছিল, সেখানেই আবার ফিরে আসে। আমাদের আবেগের এই ফিরে আসার ঢেউ আমাদের মনে এসে" লাগে এবং একেই আমরা প্রিয়ার দরদ ব'লে ভেবে থাকি। আর নির্গমের অবস্থাটীর চেয়ে—অর্থাৎ আমাদের প্রেমের প্রসারের চেয়ে তার প্রত্যাগমনই আমাদের বেশি ভালো লাগে, কারণ তার সূত্রপাত যে আমাদের মধ্যে থেকে, সে-কথা ইতিমধ্যে আমরা ভুলে যাই। নববর্ষের প্রথমদিন জিল্‌বের্তের চিঠি না পেয়ে কেটে গেল। সেবার আবার ডাকঘরের কাজ বেশি হওয়াতেই হোক্ বা লেখার দেরিতেই হোক্, শুভেচ্ছাবহ অন্যান্য চিঠি জানুয়ারির ৩রা ৪ঠা অবধি আমি পেয়েছিলুম। সেই জন্যে পয়লার পরেও আমার আশা ছিল, যদিও সে-আশা প্রতি ঘণ্টায় শুকিয়ে যাচ্ছিল। পরের কদিন আমার কান্নার কুয়াসায় কাট্‌ল। স্পষ্টই বুঝলুম যে, জিল্‌বের্তকে আমি ছেড়েছি বলে আমার যে-ধারণা হ'য়েছিল, তাতে আন্তরিকতা কমই ছিল। আর তাই এ-চিঠির আশা। সে আশা যখন আমি অন্য কোনো আশার আশ্রয় নেবার আগেই চলে গেল, তখন আমার অবস্থা হ'ল মর্ফিয়ার একমাত্র শিশিটী ফুরিয়ে যাওয়ার পরে রোগীর মতো। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বোধহয় এর উপর (এবং এ-দুই ব্যাথার মধ্যে যোগ আছে—একটী মনোভাবও বিরুদ্ধ রসের সমন্বয়ে ঘটে) এই চিঠির আশা আমার মনে জিল্‌বের্তের মূর্ত্তি আবার তুলে ধরছিল ও আগে যে-রস তার সাম্‌নে গেলে, তাকে দেখলে, তার ব্যবহারে মনে উচ্ছ্বলিত হ'ত, সেই সব রস আবার আমার মনে কষ্টকরভাবে জেগে উঠছিল। পুনর্মিলনের আপাত সম্ভাবনায় একটী অত্যন্ত মূল্যবান শক্তি আমার মধ্যে ফুটতে পায় নি—সে হচ্ছে যা' আসে তা' মেনে নেওয়ার, স্বীকার করে নেওয়ার শক্তি। স্নায়ুবিক রোগীদের যখন আত্মীয়-বন্ধুরা আশ্বাস দেয় যে, সর্ব্বদাই বিছানায় শুয়ে থাকলে ও চিঠিপত্র বা বই পড়া বন্ধ রাখলে তারা সহজেই সেরে যাবে, তখন তাদের সে-কথা বিশ্বাস হয় না। তাদের সত্যিই মনে হয় যে, ওরকম সম্পূর্ণ বিশ্রামে তাদের স্নায়ু আরো অস্থির হয়ে উঠবে। প্রেমিকরাও তেম্‌নি আসক্তির গণ্ডি

থেকে প্রেমের কথা ভাব্‌তে গিয়ে ত্যাগের শুভকরতায় বিশ্বাস করতে পারে না।

সেই সময়ে আমার হৃদ্‌স্পন্দনরোগ বেড়ে উঠ্‌ল, ক্যাফিনের মাত্রা কমাতে বুক ধড়ফড়ও থাম্‌ল। এই দেখে আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, জিল্‌বের্তের সঙ্গে ঝগড়ার সময় থেকে যে-বেদনা বোধ করছিলুম, এই ওষুধই হয়ত তা'র আসল কারণ। তখন অবশ্য সে-বেদনা আমি যখনই বোধ করেছি, সব সময়েই মনে করেছি যে, এ-দুঃখ বোধ করছি তাকে আর দেখতে পাব না ব'লেই বা দেখতে পেলে সেই ঝগ্‌ড়াটে মেজাজেই দেখতে পাব ব'লেই। কিন্তু যদি এই ওষুধই সে-দুঃখভোগের কারণ হ'য়ে থাকে, তবে সে-দুঃখ আমি ভুল বুঝেছিলুম বল্‌তে হবে (আর তাতে আশ্চর্য্য কি ? প্রায়ই ত দেখা যায়, প্রেমিকের সব চেয়ে কষ্টকর দুঃখযন্ত্রণা, যে নারীর সঙ্গে সে বাস করছে, তার মূর্ত্তি ধরে আসে।) এবং এ-হিসাবে বল্‌তে হবে যে, আমার ওষুধ সেই কামৌষধের মতো, যা খেয়ে ট্রেষ্টান্ ইসোল্‌ডের কাছে বাঁধা পড়ে গেল। কারণ ক্যাফিন কমিয়ে আমার শারীরিক কষ্টের যতটুকু লাঘব হ'ল, তাতে আমার দুঃখ শেষ হ'ল না—সে-দুঃখ, আমার শরীরের টক্‌সিন্ সৃষ্টি না করুক্, অন্তত তীব্রতর করে তুলেছিল।

ক্রমে জানুয়ারির মাঝামাঝি এল, নববর্ষের চিঠি পাবার আশা গেছে, তার ব্যথাও শান্ত হয়েছে। কিন্তু আমার সে পুরানো বেদনা—সেই "ছুটীর" আগের বেদনা আবার স্থুরু হ'ল। আর নিষ্ঠুরতা তাতে এই ছিল যে, আমিই এ-বেদনা গড়ে তুলছিলুম—অজ্ঞাতসারে অবশ্য, কিন্তু গড়ে তুলছিলুম—আপন খেয়ালে, একাগ্র ধৈর্য্যে। আসল ব্যাপার ছিল জিল্‌বের্তের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। আর আমিই সে-সম্বন্ধ বজায় রাখা অসম্ভব করে তুলছিলুম—এই দীর্ঘকালের বিচ্ছেদে—জিলবের্তের ঔদাসীন্য জাগিয়ে নয়, আমারই ঔদাসীন্য জাগিয়ে। এবং ঔদাসীন্য, তা সে তারই হোক্ বা আমারই হোক্, শেষে গিয়ে দাঁড়ায় একই জায়গায়। আমার মধ্যে জিলবের্তের যে প্রেমিকটী ছিল, তাকে অক্লান্তভাবে মন্থর ও কষ্টকর আত্মহত্যার পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলুম—কি করছি এবং কি পরিণাম তা' ভালো করে বুঝেও। কিছুকাল পরে আমি যে জিল্‌বের্তকে আর ভালোবাস্‌ব না তা' ত জানতুমই, এও জানতুম যে, জিলবের্ত নিজেও পরে অনুতাপ করবে এবং তখন সে আমার সঙ্গে দেখা করবার যে চেষ্টা করবে, তা' এখনকার মতোই ব্যর্থ হবে। তার কারণ, তখন আর তার প্রতি আমার এ-ভালোবাসা থাক্‌বে না। তার কারণ, তখন আমার প্রেম হ'বে অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে—যার জন্য আমার বাসনা হ'বে গভীর, যার জন্য আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করব। তখন এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশও আমি

জিল্‌বের্তকে দিতে পারব না। তার কারণ, জিল্‌বের্ত তখন আমার কেউই নয়। সে-সময়ে কিন্তু (যে-সময়ে জিল্‌বের্ত একটা বোঝাপড়ার অনুরোধ বা তার প্রেমস্বীকার করে না লিখ্‌লে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব না ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলুম, ও তারও লেখবার কোনো সম্ভাবনা নেই জেনে তাকে হারিয়েছি বলেই ধরে নিয়েছি ও তাই আগের চেয়ে ভালোবেসেছি এবং তার মূল্য যে আমার কাছে কত, সে কথা, আগের বছরের চেয়ে—যখন প্রায় প্রতিটী বিকাল, অন্তত যে-বিকাল আমার খুসি, তার সঙ্গে কাটাতুম ও যখন আমাদের বন্ধুত্বের যে কখনো শেষ হ'বে, তা' জানতুম না—সে আগের বছরের চেয়ে ঢের বেশি বুঝ্‌তে পেরেছি) সে-সময়ে কিন্তু জিল্‌বের্তের প্রতি আমার যে হৃদয়ভাব ছিল, সে-হৃদ্যতা পরে অন্যের প্রতি সম্ভব হবে, এ-কথা ভাবতেও বিশ্রী লেগেছিল। কারণ, এ কথা ভাব্‌তে গেলে আমায় জিল্‌-বের্তের পরিধির বাইরে, তার প্রতি আমার প্রেম ও তৎঘটিত দুঃখবেদনার বাইরে চলে যেতে হচ্ছিল। আমার এ-প্রেম ও বেদনার মধ্যে জিল্‌বের্তের স্থানটী ঠিক কোথায়, চোখের জলের ভিতর তা' বিচার করতে লাগলুম এবং মানতেই হ'ল যে, এ-দুই বস্তু বিশেষ করে তারই জন্য নয়, কিছুকাল পরে এ-দুটি অন্য কোনো নারীর হাতেই যাবে। সেই জন্যই ত—অন্তত তখন আমি তাই ভেবেছি—আমরা মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ একতা বোধ করতে পারি না। কাউকে যখন মানুষ ভালোবাসে, তখন মনে হয় যে, এ-প্রেম তাদের দুটীকে নিয়েই শেষ নয়, এ-প্রেম আবার ভবিষ্যতে ফুটতে পারে, কিম্বা হয়ত আগেই ফুটেছিল—এই মেয়েটীর জন্য নয়, আরেকটির জন্য। যে-সময়টীতে মানুষ প্রেম থেকে মুক্ত থাকে, সে-সময়ে যদি সে দার্শনিকের মতো বিচার করতে যায়—কি সে বস্তু যার জন্য প্রেমে এ বিরুদ্ধতা এসে পড়ে, তবে সে দেখতে পাবে যে, দার্শনিকের ধীরতায় যে প্রেমের কথা সে বিচার করছে, সে-প্রেম বিচারকালে সে বোধ করছে না এবং তাই সে প্রেমের তত্ত্বটী ধরতেও পারছে না। কারণ হৃদয়ব্যাপারের জ্ঞান ক্ষণে ক্ষণে আসে এবং বিচার্য্য রসটী বিচারকের মনে না থাক্‌লে সে-বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকাও অসম্ভব। যে ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যতে আমি জিল্‌বের্তকে আর ভালোবাসব না, যে ভবিষ্যৎ আমি তখনও কল্পনায় সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু আমার বেদনা দিয়ে আন্দাজ করছিলুম, সেই ভবিষ্যৎ যে আস্তে আস্তে মূর্ত্তি নিচ্ছে, জিল্‌বের্তকে সে-কথা জানাবার সময় তখনও ছিল। তাকে জানাতে পারতুম যে, সে ভবিষ্যৎ আসন্ন না হোক্‌, অবশ্যম্ভাবী—যদি জিল্‌বের্ত আমাকে উদ্ধার করতে না আসে ও 'জায়মান আমার ঔদাসিন্যকে বীজাবস্থাতেই নষ্ট না করে। কতবারই না জিল্‌বের্তকে লিখ্‌তে বসলুম, তার কাছে যেতেও উঠ্‌ছিলুম—তাকে বলতে—"তোমার

জানা উচিত। আমার ত মন স্থির হয়ে গেছে। এই আমার শেষ চেষ্টা—তোমার সঙ্গে শেষবার দেখা। অল্পদিনেই আমার প্রেমে ছেদ পড়বে।" কিন্তু কি লাভ? জিল্‌বের্ত ছাড়া আর সকলের প্রতিও যখন আমার ঔদাসীন্য গভীর, তখন আমার প্রতি তার এ ঔদাসীন্য-সম্বন্ধে—আমার মনোভাব অন্যরকম হ'লেও—তাকে আঘাত দেবার আমার অধিকারই বা কি? শেষবার! জেল্‌বের্তের প্রেমে পড়ে আছি ব'লে আমার কাছে কথাটার মানে খুব গভীর অবশ্য। কিন্তু তার কাছে এ-কথা নিশ্চয়ই আত্মীয়-বন্ধুরা বিদেশ যাবার আগে দেখা করতে আসবে ব'লে যে-চিঠি লেখে, সেই চিঠির মতো, প্রেমেপড়া মেয়েদের এবং আমাদের তরফ থেকে সময়াভাবে প্রত্যাখ্যাত বিরক্তিকর আহ্বানের মতো কাজে লাগবে। সময় জিনিষটা আমাদের হাতে ত কমে বাড়ে; আমরা নিজেরা যখন হৃদয়-ব্যাপারে বিচলিত হই, তখন সময় খুবই বেশি থাকে, আমাদের জন্য অন্যের মনে আন্দোলনের বেলায় সময় কমে যায় এবং বাকিটুকু ত অভ্যাস ভরিয়ে দেয়।

তা' ছাড়া, জিল্‌বের্তের সঙ্গে এ-কথা আলাপ করে কিছু লাভ হ'ত না—সে আমায় বুঝ্‌ত না। আমরা যখন অন্যের সঙ্গে কথা বলি, তখনও মনে মনে ভাবি শ্রোতাটীর কান ও মন আমাদেরই কান ও মনের মতো। আমার কথা জিল্‌বের্তের কাছে বিকৃত হয়ে পৌছাত যেন জলপ্রপাতের শব্দের সচল পর্দ্দার ভিতর দিয়ে—এতটা বদলে গিয়ে যে চেনাই যেত না, অদ্ভুত অর্থহীন একটা শব্দের মতো। যে-সত্যটী কথায় আমরা বল্‌তে যাই, সেই সত্যের অনিবার্য্য শক্তি সে-কথায় আপনাআপনি ত আসে না। সে-কথাতে সত্যটীর রূপ সম্পূর্ণ হ'তে সময় লাগে। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, একপক্ষের মুখপাত্র বিপক্ষদলকে দেশের শত্রুপ্রমাণ করতে গিয়ে নিজেরই শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কাল পরে সেই বিপক্ষের মতটীকেই বিশ্বাস করে বসে, যদিচ সেই বিরুদ্ধ মতটী তখন বিপক্ষ দলের নেতা ত্যাগ করেছে। সাহিত্যের কোনো উৎকৃষ্ট সৃষ্টি যখন অনুরাগী পাঠকেরা চেঁচিয়ে পড়ে যায় এবং তার স্বতঃসিদ্ধ উৎকর্ষের প্রমাণ পেতে পেতে মুগ্ধ হয়ে যায়, তখন যে-শ্রোতারা রচনাটী ব্যর্থ ও বাজে মনে করে, তারাও কালে রচনাটী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব'লে মানে—যদিচ তখন লেখকের এ স্বীকারোক্তি শোনবার উপায় থাকে না। সেই রকম, প্রেমের ব্যাপারে বেড়াজালের বাইরে যে আছে, সে বাইরে থেকে প্রাণপণ করেও সে জাল ভাঙ্‌তে পারে না। তারপরে যখন আর এ-জালের বাধায় তা'র কিছুই আসে যায় না, তখন হঠাৎ অন্য জায়গা থেকে চাপ এসে বেড়া ভেঙে দেয়। যে-মেয়েটীর মনের বেড়া আগে অত চেষ্টা সত্ত্বেও ভাঙ্‌ল না, এখন সে বাধা বৃথাই চলে গেল। আমি যদি জিল্‌বের্তের কাছে আমার আগামী ঔদাসীন্য ও তার প্রতিরোধকের

কথা বল্‌তে যেতুম, ত সে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করে বস্‌ত যে, আমি তাকে যতটা ভালোবাসি আমার বিশ্বাস, আসলে তা'র চেয়ে বেশিই ভালোবাসি এবং এই মনে করে তার বিরাগ বেড়েই যেত। আর এ-কথাও বল্‌তে হ'বে যে আমার এই প্রেমের জন্য আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে যে নব নব অসম্বদ্ধ ভাবান্তর চল্‌ছিল, তার দ্বারা আমি আমার প্রেমের শেষ জিল্‌বের্তর চেয়ে স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম। অবশ্য তবুও আমি জিল্‌বের্তকে চিঠি লিখে বা নিজের মুখে এই পূর্ব্বাভাস জানাতে পারতুম—যা হোক্‌, বিরহকাল ত যথেষ্ট দীর্ঘ হ'য়েছিল এবং জানালে বা জানাতে গিয়ে তার বিরহসুখবোধ থেকে আমি বঞ্চিত হ'লেও, জিল্‌বের্ত্‌ যে সত্যিই অতটা অপরিহার্য্য নয়, কথাটা সেও ত জান্‌তে পেত। দুর্ভাগ্যবশত কয়েকটী লোক সে-সময়ে— ভালো করতে বা মন্দ করতে, যে উদ্দেশ্যেই হোক্‌, এমন ভাবে তার কাছে আমার কথা বল্‌তেন যে, সে নিশ্চয়ই মনে করছিল তাঁরা আমার অনুরোধেই সে-সব কথা বল্‌ছেন। তাই যখন জান্‌তে পারলুম যে, কোতার্‌, আমার মা, এমন কি মঁসিয় দ-নোর্‌পোয়াও কয়েকটা অযথা অপ্রয়োজনীয় কথায় আমার এত আত্মত্যাগ ব্যর্থ করে দিলেন, তখন আমার সংযমে যা' লাভ হ'ত তা' নষ্ট করে' দিলেন—যেন আমি সে আত্মসংযমের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছি, জিল্‌বের্তের মনে এ-রকম একটা ভুল ধারণা করে দিয়ে,—তখন আমার মেজাজ বেজায় খারাপ হয়ে উঠ্‌ল। প্রথমত, আমার কষ্টকর কিন্তু কার্য্যকর এই প্রেম করা থেকে বিরতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেওয়ায়, কবে থেকে যে সত্যিই আমি জিল্‌বের্ত সম্বন্ধে নিবৃত্তিমার্গ ধরেছি (জিল্‌-বের্তের কাছে তাঁরা আমার সম্বন্ধে উপরোক্তভাবে কথা বলায়) আমার সে-হিসেব গুলিয়ে গেল।

শুধু তাই নয়। এর পরে জিল্‌বের্তের কাছে যাওয়ার সে-আনন্দও আমার পক্ষে কমে গেল। এর পরে গেলে, সে স্বভাবতই ভাবতে পারে যে, আমি ভদ্রলোকের মতো যা' গেল, তার দাবী ছেড়ে দিয়ে থাক্‌তে না পেরে আড়ালে পাঁচজনের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এই সাক্ষাৎকার ঘটালুম—যে সাক্ষাৎকারের জন্য জিল্‌বের্তের কোনোই আগ্রহ নেই। রাগে আমি এই সব লোকের অকারণে কথা বলার অভ্যাসকে গাল দিতে লাগলুম। অবশ্য এ-কথা সবাই জানে যে, ক্ষতি করবার জন্য বা কোনো উপকারে আস্‌বার জন্য এরা কথা বলে না, কথা বলা স্বভাব ব'লেই বলে,—অনেক সময়ে তাদের সামনে আমরা সে-প্রসঙ্গ তুলেছি ব'লেও বটে। কিন্তু তাদের (আমাদেরই মতো) এই বিবেচনার অভাব ঠিক চরম সময়টীতে প্রকাশ পেয়ে আমাদের কী ক্ষতিই না করে! অবশ্য এ-কথা সত্য যে, আমাদের প্রেমের মৃত্যু নিয়ে যে নিরানন্দ নাটক অভিনীত হয়, তা'তে যে দুটী মানুষ—একজন বেজায়

ভালোমানুষ ও আরেকজন মোটেই তা' নয় ব'লে—ঠিক শেষ বোঝাপড়ার সময়টীতে সব গোলমাল করে দেয়, সে-দুটি মানুষের মতো এ-সব লোকদের ভূমিকা বিশিষ্ট নয়। আমাদের রাগটা তবুও দুজনের উপরে না প'ড়ে পড়ে বেশি এই সব স্থানকালজ্ঞানহীন সংসারের যত কোতার্‌দের উপরেই—ও-দুজনের উপর যে পড়ে না, তার কারণ আর কিছুই না—তার কারণ ও-দুটীর দ্বিতীয়টী আমরা যাকে ভালোবাসি সে এবং প্রথমটী আমরা নিজেরাই

অনুবাদক—শ্রীবিষ্ণু দে

———

পুস্তক-পরিচয়

শেষ প্রশ্ন—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্‌স্)

'শেষ প্রশ্ন' শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটী প্রশ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রশ্নটী করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে। কোন এক ওস্তাদের গান শুনিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, গুড়গুড়ির নল ছাড়িয়া উঠিতে একান্ত নারাজ শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"গায় ত ভালো, কিন্তু থামে ত?" শরৎচন্দ্র যে কত বড় শিল্পী, তা' এই একটা ছোট্ট টিপ্পনী হইতে বোঝা যায়। প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি করিতে হইলে—শিল্পকলার যে কোন প্রকারেই হোক্ না কেন—শুধু ভাল গাহিলেই চলে না, থামিতে জানা চাই। শিল্পীমাত্রেই জানেন, বলার চেয়ে, এমন-কি ভাল বলার চেয়েও, না-বলা কত বেশী কঠিন। বলার একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে, একবার বলিতে আরম্ভ করিলে থামিতে ইচ্ছা করে না। ক্রমাগতই বলিয়া যাইতে লোভ হয়, যে-সূক্ষ্ম সীমা রেখায় আসিয়া কলমকে নির্ম্মমভাবে চাপিয়া ধরিতে হয়, তাহা কখন পার হইয়া যায়, খেয়াল থাকে না, ফলে এত সাধের রূপসৃষ্টি শ্রীহীন বিকারে পরিণত হয়। একমাত্র শিল্পীই জানেন, কত প্রলোভন জয়, কত অবান্তর আকর্ষণকে জোর করিয়া প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে করিতে হয়—এ-বিষয়ে তাঁহার সংযম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সংযমের চেয়ে কম নয়। শরৎচন্দ্রের লেখায় এই সাধন-সুকঠিন সংযমের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। পদের সুমিতপ্রয়োগে, বাক্যের সুবিন্যস্ত গতিতে, বক্তব্যের সুসীম নিশ্চয়তায়, চিত্রিত চরিত্রের সুনির্দ্দিষ্ট স্পষ্টতায় তাঁর রচনা বাংলা কথাসাহিত্যের একদিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু চারিশত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গল্পটী পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হইল—শরৎবাবু কি থামিতে ভুলিলেন? তিনি কি ভুলিয়া গেলেন শিল্পসৃষ্টি হয় শুধু সৃজনেরই তাড়নায়, অন্য যে-কোন উদ্দেশ্য সৃজনের পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, অন্তরায়? কারণ, 'শেষ প্রশ্নে' তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহার মধ্যে এমন একটি চরিত্র বা ঘটনা নাই, যাহা তাঁহার শিল্পী-মনকে উদ্বোধিত করিয়াছে। ঘটনা ত সংক্ষেপে এই যে, আশুবাবুর কন্যা মনোরমাকে কমলের তথাকথিত স্বামী শিবনাথ ভুলাইয়া লইলেন, আর মনোরমার দয়িত অজিতকে শিবনাথের "শিবানী" ছিনাইয়া লইলেন—একান্ত বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সুপরিচিত অদল-বদলের কাহিনী। আশুবাবু, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন, অজিত, সতীশ, রাজেন, মনোরমা, নীলিমা, বেলা ইত্যাদি আর যে-সকল চরিত্র এই গল্পে স্থান পাইয়াছে, তাহাদের অনুরূপ চরিত্র আমরা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থে বহুবার পাইয়াছি। কমলকে 'চরিত্র' বলা কোনক্রমেই চলে না—সে কতকগুলা কথার সমষ্টি মাত্র, যে কথাগুলির মধ্যে পূর্ব্বাপর চরিত্রগত সুসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। এই কমলই হইতেছে 'শেষ-প্রশ্নের' মুকুটিত কীর্ত্তি—অথবা অপকীর্ত্তি। সমস্ত আখ্যায়িকাটা তাহারই চারিপাশে ঘুরিতেছে,—আগ্রার প্রবাসী-বাঙ্গালী-পতঙ্গের দল তাহার বিজাতীয় রূপবহ্নির চারিপাশে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইত। ঘটনাগুলি ঘটান হইতেছে এমনভাবে যাহাতে কমলের সুযোগ হয়, হয় কড়াকড়া কথা কহিবার, না-হয় অভাবিত চমকপ্রদ কোনকিছু করিবার। অধিকাংশ

ঘটনাই আকস্মিক, অসুস্থ আকস্মিকতার অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত গল্পটাকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে। গল্পটী প্রথমতঃ মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ্যভাবে বাহির হইয়াছিল। মনে হয় যেন লোকপ্রিয়তা বজায় রাখিবার জন্য গ্রন্থকার প্রতি সংখ্যায় কিছু কিছু 'শক্' দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। একই দেহে বিভিন্ন অবয়বের মত, একই গল্পে বিভিন্ন ঘটনা, প্রত্যেকে, বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া পরস্পরকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে—ইহাই হইল কথাশিল্পীর আদর্শ। সে-আদর্শকে তুচ্ছ করিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এক কদাকার monstrosity-র জননী হইয়া বসিয়াছে।

কথা উঠিবে, গল্প-রচনার এই কি একমাত্র আদর্শ? অন্য আদর্শ কি নাই? রোলাঁ কি বলেন নাই, মানুষের জীবন নদীর মত, নিজের পথ কাটিয়া চলে, আর গল্প-সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ, তাহাও কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় আবদ্ধ নয়, তাহাও পথ কাটিয়া চলে? জয়স্, প্রুস্ত্, এঁরা কি কোন প্লট্ মানিয়া চলেন? আকস্মিকতার ছড়াছড়ি কি তাঁহাদের রচনায় পাওয়া যায় না?

কথাগুলি নিছক সত্য—কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। চেতনার ধারা বাহিয়া যে-নূতন ধরণের উপন্যাস ইউরোপে লিখিত হইতেছে, শরৎচন্দ্র সে-পথের পথিক নন্। 'শ্রীকান্ত'কে অবশ্য রোঁলাবর্ণিত নদীর সহিত তুলনা করা যায়—এবং কোন রসিকপাঠকই তাহাতে প্লটের বাঁধুনি খোঁজে না। কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন' ত সে-শ্রেণীর উপন্যাস নয়। সনাতন আরিষ্টোট্‌ল্-এর সূত্র-অনুযায়ী এ-গল্পের আরম্ভ, মধ্য ও শেষ আছে। কাজেই ইহাতে ঘটনা-গ্রন্থন সুসংবদ্ধ ও চরিত্র-চিত্রন সুসঙ্গত হওয়া দরকার। বাঁদর গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ হয় না কিন্তু শিব গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ না দিয়া চলে কি?

শোনা যায়, শরৎচন্দ্র নাকি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ষাটবার—অথবা একশ ষাটবার?—পড়িয়াছেন। শুনিবার প্রয়োজন হয় না, 'শেষ প্রশ্নের' প্রতি পৃষ্ঠায়—শুধু কমলের জন্মবৃত্তান্তে নয়—'গোরা'র প্রভাব ধরা যায়। দুটী বইতেই দেশের ও জাতির—তথা মানবজাতির—নানা সমস্যাকে নানা দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে। দু'জনেই শক্তিমান লেখক—অথচ কী বিরাট পার্থক্য। 'গোরা'য় বিতর্কগুলি কাঁটার মত উঁচাইয়া নাই, লতা-পাতা-ফুলের সহিত মিশিয়া একটী অখণ্ড সম্পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। তর্কের জন্য গল্পের স্রোত কোথাও ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—তাহার প্রধান কারণ তাহার তর্কের পাত্রগুলির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কাজেই তাহাদের বক্তব্য শুধু তর্ককেই জটিল করিয়া তোলে না, তাহাদের চরিত্রকেও ফুট করিয়া দেয়। আমাদের মস্তিষ্কও যেমন তুষ্ট হয়, রসবোধও তেমনই তৃপ্ত হয়। কিন্তু 'শেষ প্রশ্নে' কমলের সহিত যাহারা তর্ক করে তাহাদের যেন কোন আন্তরিক স্বকীয় বিশ্বাস নাই, তাহারা কথা কয় শুধু কমলকে কথা কহাইবার জন্য—কমলের বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশীলতার প্রাখর্য্যকে জাহির করিবার জন্য। সাহিত্যেই হোক্ বা জীবনেই হোক্, জাহির করিবার প্রয়াস সর্ব্বদাই অশোভন—আর এই অশোভনতাই 'শেষ প্রশ্নের' প্রধান কলঙ্ক।

অনেকের মতে, আধুনিক উপন্যাসে এ-দোষ দোষই নয়। আধুনিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য লঘু নয়, গুরু; চিত্তরঞ্জন নয়, সত্যানুসন্ধান। কাজেই কোন গভীর তথ্য বা জটিল সমস্যার অনুধাবনে গল্পের গতি নিরুদ্ধ হইলেও আপত্তি করা ছেলেমানুষি

গল্প-প্রিয়তার পরিচায়ক। হয়ত কথাটা সত্য, হয়ত আমাদের মর্ম্মের নিভৃত কন্দরে যে-শিশুমন নিরন্তর গল্প শুনিবার জন্য বায়না করে, তাহাকে তর্কের চড় মারিয়া শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। তবু মনে হয় ইহাকে কি বলা চলে না—রুটির বদলে পাথর দেওয়া? একথা নিশ্চিত যে, গভীর সত্যের মধ্যে যে-রস আছে, গল্পপ্রিয় শিশুমন সে-রস উপভোগের উপযুক্ত অধিকারী নয়। কিন্তু 'শেষ প্রশ্নে' যে-সকল তথ্যকে বড় গলায় প্রচার করা হইয়াছে তাহা ত ইউরোপীয় সাহিত্যের হাটে বাসি মাল, প্রায় বস্তাপচা হইতে চলিল। এই ভাবের হাটের দালাদালিই কি তবে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব? পাঠকের মনে চিন্তার উদ্রেক, উপন্যাসকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও জিজ্ঞাসা করা যায়, দীর্ঘায়িত তর্কালোচনাই কি তাহার শ্রেষ্ঠ পন্থা? সংযত মিতভাষী 'অভয়া'র পাঁচটী কথায় যে-তেজ, যে-দীপ্তি, যে-শক্তি আছে বক্তৃতাময় কমলের বাগাড়ম্বরে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় কি? 'চতুরঙ্গে'র মধ্যে তর্কের অংশ কতটুকু, অথচ বিশ্বসাহিত্যে কটা বই আছে যা' তার চেয়ে বেশী করিয়া মানুষকে ভাবিতে শেখায়?

আসল কথা, আমাদের দেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণ অন্তরকে পীড়িত করিয়াছে—'শেষ প্রশ্ন' এই পীড়নের তীব্র প্রতিঘাত; শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় ইহা রচিত নহে। তাই শরৎচন্দ্রের দেশপ্রীতিকে শ্রদ্ধা করিয়াও বলা যায়, যে-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্রষ্টা না হইয়া সংস্কারক হইয়া ওঠেন, সৃজনের অপেক্ষা লোকশিক্ষাকে বড় করিয়া দেখেন, রূপকারের বৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া উপকারে প্রবৃত্ত হন, হে ভগবান, সে-সাহিত্যের ভবিষ্যতের প্রতি তুমি দৃষ্টি রাখিয়ো!

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প—শ্রীবুদ্ধদেব বসু (চতুরঙ্গ)

বন্দীর বন্দনা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু (ডি, এম্, লাইব্রেরী)

"অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প" বুদ্ধদেব বসুর প্রথম প্রকাশিত গল্পের বই। গল্পগুলি আগে নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল, সুতরাং বাঙালী পাঠক পূর্ব্ব হ'তেই এগুলির সঙ্গে স্বল্পাধিক পরিচিত। এখন আবার গল্পগুলিকে এক সঙ্গে পেয়ে, ভাল ক'রে তাদের রসাস্বাদনের সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। বুদ্ধদেবের গল্প যে বাঙলা সাহিত্যে নূতন মালের আমদানী করেছে একথা বলাই বাহুল্য। আমার কাছে এঁর গল্পগুলি বিশেষ ক'রে মূল্যবান, কেনন। এরা আমার অনেকদিনের বাঙলা গল্প পড়ার অতৃপ্তি দূর করেছে। কিন্তু এ সকল কথা আলোচনার আগেই প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। বইখানির মলাট-পরিচয়ে এই দাবী উপস্থিত করা হ'য়েছে যে, বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমি রোমান্টিসিজ্ম্-এর জোয়ার এতদিনে মন্দীভূত

হ'বার পর যে-নবীন রিয়ালিজ্ম্-এর স্রোত গ্রন্থকার—ও আর কয়েকজন—আনয়ন করেছেন, তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হ'ল এই বইখানি। আর এও বলা হ'য়েছে,—যে-রবীন্দ্র প্রভাবে সাহিত্যে এতদিন রঙিন স্বপ্নের বেসাতি চলছিল, গ্রন্থকার আপনাকে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত করেছেন। কথা দু'টি ঘুরে ফিরে একই, কিন্তু ঠিক যেন এর জাজ্বল্যমান প্রতিবাদ-স্বরূপই দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রথম গল্পটি "প্রথম ও শেষ"। এ গল্পটি অন্ততঃ রবীন্দ্র-প্রভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন। দু'টি বালা সখীর পত্র বিনিময় সূত্রে গল্পটি গাঁথা। উভয়েই বাল্যকাল থেকে পণবদ্ধা যে, যতদিন না প্রকৃত-প্রণয়ী এসে হৃদয়দুয়ারে আঘাত করছেন, ততদিন প্রত্যেকে আপনার কুমারী জীবন অক্ষুণ্ণ রাখবেন। একজন কিন্তু পণ ভঙ্গ ক'রে মামুলি প্রথায় বিবাহ করলেন, অপরটি তাকে ধিক্কার দিয়ে আপনার প্রেম-প্রতীক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্পা রইলেন—এই থেকে গল্পের সুরু। তাঁর প্রেম-প্রতীক্ষা সার্থক হ'ল,—কিন্তু ট্রাজিক্ সমাপ্তিতে। প্রণয়ী তাঁর কাছে এসে ধরা দিলেন কিন্তু প্রণয়জ্ঞাপন হ'ল এক গভীর রাত্রে ঘোর ঝঞ্ঝা ও বর্ষা মাথায় ক'রে। ফলে প্রণয়ীর হ'ল নিউমোনিয়া ও তাতেই মৃত্যু। এই প্রেম-প্রতীক্ষারতার বেদনা ঝঙ্কৃত হ'য়েছে গল্পটির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। সে-বেদনাকে নিবিড় করেছে লেখকের অনন্যসাধারণ লিপি-দক্ষতা। গল্পটি প'ড়ে একেবারে মুগ্ধ হ'তে হয়, কিন্তু এর ওপর রবীন্দ্র-প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই। এর ভাষার বিন্যাসে, এর জল, নদী, বর্ষার বর্ণনায়, এর পরিত্যক্ত পুরাতন বাড়ীর রহস্যগভীর চিত্রাঙ্কনে, সর্ব্বত্র রবীন্দ্র-প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে, মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের কলম তুলে নিয়ে লেখক রচনা করেছেন এই গল্পটি। এটা কোন অগৌরবের কথা নয় বরং গৌরবেরই, কেননা লেখক রবীন্দ্র-প্রভাবকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ক'রে আপন বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা সমুজ্জ্বল করেছেন। অন্যের হাতে এটা হয়ত হ'ত শুধু অনুকরণ কিন্তু এক্ষেত্রে হ'য়েছে লেখকের স্বকীয়তার পরিচায়ক।

মিছে এ কথা বলা যে, এ গল্প রিয়ালিষ্টিক্। তা' যদি হয় তবে বঙ্কিমকে রোমান্টিসিজ্ম্-এর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, অন্ততঃ তাঁর "বিষবৃক্ষ"কে নয়। কেননা সুন্দরী যুবতী প্রেমপরায়ণা স্ত্রী থাকতে বিধবা পরস্ত্রীর প্রতি ধাবমান হওয়ার চেয়ে সেরা রিয়ালিজ্ম্ আর কি আছে? গল্পটির শেষে উপসংহার ক'রে লেখক বলেছেন, যে নায়কের মৃত্যুর পর নায়িকা তাঁর সখীর মত বাল্যপণ ত্যাগ ক'রে অত্যন্ত সাংসারিকভাবে একজন রোজকারী ব্যক্তিকে বিবাহ করলেন। এতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়েছে, গল্পটি রিয়ালিষ্টিক্ ত হয়ই নি বরং খুব বিসদৃশ হ'য়েছে। বেশীদিন আগের কথা নয়, আমাদের সাহিত্য-রসিক বন্ধু-মহলে শরৎবাবুকে নিয়ে ঠিক এই তর্কই উঠত; একপক্ষ বলতেন শরৎবাবু বাঙলা সাহিত্যে রিয়ালিজ্ম্-এর প্রবর্ত্তক, প্রতিপক্ষ বলতেন কখনই না। এখন সে তর্ক আর ওঠে না, এখন সকলেই স্বীকার করেন, শরৎবাবু রবীন্দ্রযুগেরই অন্তর্গত। বুদ্ধদেবও এই যুগেরই অন্তর্গত, নূতন যুগকার বাঙলা সাহিত্যে এখনও আবির্ভূত হন নি।

পূর্ব্বোক্ত গল্পটি সম্বন্ধে আমার এই আপত্তি যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'লেও এতে একটা শরৎচন্দ্র-সুলভ মস্তামার্কা রোমান্টিসিজ্ম্ আছে যার লক্ষণ হচ্ছে নায়ক বিদ্যায় সাগরপার হ'য়েও বুদ্ধিতে হবে হনুমান, এবং নায়িকা অতি কোমলপ্রাণা হ'য়েও বুদ্ধিতে হবে হিমাদ্রির মত কঠিন, অভ্রভেদী। আর নায়ক-নায়িকার মিলন হবে অনুকম্পা,

কৃতজ্ঞতা বা মাতৃত্বের আশ্রয় নিয়ে—তাতে অসঙ্গতি বা অপ্রাসঙ্গিকতা থাকলেও। তাই শরৎবাবুর লেখায় নায়িকার কাছে বাঁধা রাখার জন্য নায়কের হাতে হঠাৎ এসে জোটে এক উৎকৃষ্ট দামী মাইক্রস্কোপ। বুদ্ধদেবের লেখায় এসে জুটেছে অতি অপ্রত্যাশিত একগাছা ছিপ—ভদ্রতাবিরুদ্ধ বিনানুমতিতে নায়িকারই পিতার পুকুরে মাছ ধরবার জন্য; সে মাছ আবার নিজের খাবার জন্য নয়! যিনি সাহিত্যে যুগ পরিবর্ত্তন সংঘটনের যশঃপ্রার্থী তাঁর পক্ষে এ ছেলেমানুষি অশোভন।

এর পরের গল্পগুলিতেই গ্রন্থকারের লেখার বৈশিষ্ট্য বিশেষ ক'রে ফুটেছে। তাঁর হাতে গল্পের বাঙলা এক অভিনব রূপলাভ করেছে। ভাষায় ও গল্প লেখবার রীতিতে তাঁর দখল অসামান্য। তিনি জানেন, কি নিয়ে গল্প তৈরী করতে হয়, কোথায় তার সুরু, কোথায় বা শেষ, কোথায় কতখানি প্রত্যাহার করতে হয় কোন ওজনে, কোন ছন্দে, কোন তালে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হয়। তবু এ-সকল গল্পের রসোপলব্ধিতে একটা বাধা লাগে, বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথকে বা রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর পথকে পরিহার করবার সযত্ন চেষ্টায়, অধিকাংশ স্থলেই মূল প্লট হ'য়ে পড়েছে বেজায় সৌখিনি রকমের। একটি গল্পের নায়িকা তাঁর বাল্য প্রণয়ীকে অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখতে পেয়ে একেবারে ৪৪০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক খেয়ে ব'লে উঠলেন—যাও যাও সামনে থেকে, স'রে গিয়ে ধুয়ে-মুছে চিরদিনের জন্য একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যাও। অতঃপর তিনি বাড়ীতে স্বামীপুত্রকে ভুলিয়ে রাখবার বেশ সুব্যবস্থা ক'রে সেই প্রণয়ীকে ডেকে তাঁর সাধ মেটাতে দ্বিপ্রহরে স্বৈরবিহারে বা'র হ'য়ে গেলেন। আর একটি গল্পে একজন সুশিক্ষিত কাব্যসাহিত্যরসিক নায়ক কিছুদিন দারিদ্র্য ও অগ্রজের স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে রণে ভঙ্গ দিয়ে উচ্ছন্নের পথে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। স্বীকার করি, লেখার গুণে এ সমস্ত গল্পই হ'য়েছে রম্য, উপভোগ্য। কিন্তু শুধু মানুষের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তগুলির উপর কটাক্ষ ক'রেই সাহিত্য সৃষ্টি হবে না, চাই বহুদর্শিতা, চাই বিচিত্র পরিবেষ্টনে মানুষের বিচিত্র ভাবোন্মেষের চিত্রাঙ্কণ। আর একটি জিনিষ এই গল্পগুলিতে বড়ই কর্কশ হ'য়ে উঠেছে, সে হচ্ছে লেখকের বিষম নারীবিদ্বেষ। বুদ্ধদেবের নারী কামের কাছে মূঢ়, শক্তিহীন। বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে পতঙ্গের মত এরা পোড়ে না, কামের সামান্য স্পর্শেই এরা হয় ধরাশায়ী। স্পর্শও নয়, এদের দ্বিধা-সঙ্কোচ জয় করতে প্রয়োজন মাত্র সামান্য একটু ইঙ্গিত, সামান্য একটু "অভিনয়"। নারীর এ-দশা দেখে লেখক যে মর্ম্মাহত হ'য়েছেন তা' নয় বরং তাঁর শ্লেষ ভীষণ নির্ম্মম হ'য়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, এ-নারীবিদ্বেষ লেখকের ক্ষণিকের ঠমকমাত্র, যাকে তিনি তাঁর পরিণত সাহিত্য-জীবনে অতিক্রম ক'রে যাবেন। নতুবা তাঁর লেখা-সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ থাকবে।

শেষের গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এটি এক নূতন রীতিতে লেখা। বিষয় "কাব্যের উপেক্ষিতা" উর্ম্মিলার কাহিনী, স্থান কাল কিন্তু আধুনিক। এ-রীতিতে লেখবার জন্য লেখক নিজেই বইটির মুখবন্ধে বহু ভূমিকা ক'রেছেন, সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। গল্পের উর্ম্মিলা আধুনিক জগতে বিচরণ ক'রে যে নিরবচ্ছিন্ন ও নৈরাশ্যময় উপেক্ষার ভার প্রতিনিয়ত বহন করেছেন তা' লেখায় অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক হ'য়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে পড়লাম বুদ্ধদেবের নব প্রকাশিত কবিতার বই "বন্দীর বন্দনা"। এতে তাঁর দশটি কবিতা একসঙ্গে গাঁথা, কিন্তু প্রত্যেকটিই কাব্য-গৌরবে দীপ্যমান।

তাঁর গল্পের বই-প্রসঙ্গে আমি তাঁর যে-ক্ষমতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি সেই ক্ষমতার প্রকৃষ্টতর পরিচয় পাই এই কবিতা-দশকে। লেখক বয়সে নবীন ও কবিতা লেখায় নব প্রয়াসী কিন্তু কে বলবে তাঁর রচনা নবীনের বা প্রথম প্রয়াসের? তাঁর গল্পে কোন কোন ত্রুটী বা দুর্ব্বলতা থাকলেও তাঁর কবিতাগুলি সুপরিণতি লাভ করেছে। বাংলায় প্রকাশিত কবিতার কোনটিকেই এদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, এরা স্বকীয়তায় এমন এক শ্রেণী গড়ে তুলেছে। এরা কল্পনায় দৃঢ়, ভাষায় পরিস্ফুট প্রকাশ ভঙ্গীতে স্বাবলম্বিত। এদের ছন্দটি "অমিল ছন্দ", এক রকম নূতন বল্লেই চলে, কেননা এ-ছন্দ পূর্ব্বে বেশী ব্যবহৃত হয় নি। শুধু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দু'একটি কবিতায় এ-ছন্দের ব্যবহার করেছেন আর গিরীশ ঘোষ তাঁর নাটকের জন্য এ-ছন্দটিকে বরণ করেছিলেন। বুদ্ধদেবের ছন্দেও নাটকীয় উক্তির একটা ঝোঁক আছে। যা' হ'ক এঁর লেখনীতে ছন্দটি রূপলাভ করেছে।

কবিতাগুলিতে দুটি প্রধান সুর বেজেছে। একটি হচ্ছে সন্ধানের, কবির কাব্যলোকের, অমৃতলোকের সন্ধানের। সন্ধানে বাহির হয়েই কবি প্রথমেই চেয়েছেন মুক্তি। সমস্ত বন্ধন হ'তে মুক্তি, রূপের বন্ধন, যৌবনের বন্ধন, বাসনার বন্ধন, ক্ষোভের বন্ধন ও প্রেমের বন্ধন। তাই তিনি "বন্দীর বন্দনা" গেয়েছেন। এক দিব্যালোকে, যৌবনের সিন্ধুতটে বসে, তিনি নিজের আত্মপরিচয় পেয়েছেন; দেখেছেন যে, এ-ধরণীর তিনি সন্তান ন'ন, তিনি শাপভ্রষ্ট দেবশিশু। তখন তাঁর কি আনন্দ, কি অভয়, কি মুক্তি! কে এনে দিল সেই বাণী? গগনের স্নিগ্ধ সোনার কমল ওই উষার আলোখানি, রাত্রির রাজ্ঞী ওই পূর্ণচন্দ্র, প্রেমগুঞ্জনতুল্য বনের ওই মর্ম্মরধ্বনি, প্রণয়িণীর নেত্র-মুকুরে প্রতিবিম্বিত কবির আপনারই ওই নিষ্কলঙ্ক ভাস্বরকান্তি রূপ। তখন সামান্য ক্ষোভ ঘুচে গিয়ে কবির মনে হ'য়েছে সার্থক "সুন্দর তনু" এই দিনগুলি, ক্লান্ত উদার উদাস এই অপরাহ্ণ, স্নিগ্ধ শান্ত এই রাত্রি, যাদের সকলকে কবি একটি একটি ক'রে কালের বিশাল স্রোতে প্রতিনিয়ত ভাসিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু মুক্তি চাই এ-সকলের প্রিয় বন্ধন থেকে, কারণ এদের মোহ তাঁর কল্পলোকে পৌছবার পথ যে রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষুধিত যৌবন, তার দুর্দ্দম বাসনা, তার কুৎসিৎ কামনা আর অতৃপ্ত প্রেম নিয়ে সর্ব্বদা সম্মুখাসীন। কবির সুন্দর এতে অসম্মানিত। মুক্তি চাই এ-সব থেকে। কোথায় ধরণীর সে অপরিমিত সৌন্দর্য্য, কোথায় সেই সুচরিতা সুন্দরী নারী—সে বিম্বাধরা কৃশকটি করভোরু পীনজঘনা নারী—যারা কবির তপস্যা ভঙ্গ করতে সমর্থ? কোথায় সে সম্ভোগ যা' কবিকে বিচলিত করবার শক্তি রাখে? না, না, মধুরাত্রে রতিক্রীড়া-পারগ সুন্দরী ললনা নয়, কবির প্রিয়তমা "অশরীরিণী প্রাণ উদ্বোধিনী অগ্নিকল্পা কবিতা-কল্পনা"। ধরণী কবির কাছে মৃতা, কবি তার জন্য চিতা সাজিয়েছেন। যে-ধরণীর প্রেমে কত শত কবি আকুল ও ধন্য হ'য়েছেন, আমাদের কবি তার প্রেম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তিনি বিধাতার কাছে বর চেয়েছেন "সবিতার দীপ্তিসম" তাঁর "কবিতার স্বপ্ন" যেন অক্ষয় হয়। প্রচণ্ড তীব্র সুরে বেজেছে ধরণীর প্রতি এই উপেক্ষাগীতি; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, ধরণীকে উপেক্ষা ক'রে কবি কোন কল্পলোকে উত্তীর্ণ হ'তে চান? আমার মনে হয়, এ-প্রত্যাখ্যান কবির ধরণী-প্রেমেরই নামান্তর।

কবিতার দ্বিতীয় সুর বেজেছে নারীর প্রতি তীক্ষ্ণ নির্ম্মমতায়। গল্পগুলিতে আগেই এই নারীবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কবির কাছে নারী শুধু চর্ম্মের

আবরণে ঢাকা রক্তমাংসময় মদনানলের ইন্ধন মাত্র। তাঁর আপন চোখে আছে স্বর্গের দীপ্তি, হৃদয়ে আছে অনন্তের ক্ষুধা কিন্তু তাঁর নারীর হৃদয়ে নেই "অমৃত পরশ", নয়নে নেই "দিব্য বিভা।" তাঁর নারী তাঁকে "উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধালোকে আরও উর্দ্ধালোকে" নিয়ে যায় না। তাই কঙ্কাবতীকে তিনি চেয়েছেন শুধু তার ননীর মত তনুর স্পর্শের বিলাসে। তাঁর "অমিতার" কাছে চেয়েছেন ভালবাসা নয়, ভালবাসার ভানমাত্র। "অপর্ণা"কে প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে তিনি বলেছেন এইবার থেকে তিনি হ'বেন তার স্বামীশয্যায় চিরকণ্টক।......আশা করি, কবির লেখায়, এই নারী-বিদ্বেষের পালা একদিন কেটে যাবে, ধরণী ও তাঁর কবিতার বিষয়গুলির প্রতি কঠিন তীব্র স্বর নম্র হ'বে, বহু ও বিচিত্রতর বিষয়ে তাঁর কবিতার দ্যুতি ন্যস্ত হ'বে, সে দিন কবিমণ্ডলীর মধ্যে আপনা হ'তেই তাঁর জন্য একখানি অতিসম্মানের আসন বিরচিত হ'বে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

অদ্বৈতসিদ্ধি—প্রথম ভাগ। অনুবাদক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ। সম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ—৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

অদ্বৈতবেদান্ত-সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে তিন বিভিন্ন যুগ ও দেশের তিন জন লোকোত্তর প্রতিভাবান্ মহাপুরুষের নাম মনে পড়ে। প্রাচীন যুগে—দাক্ষিণাত্যে বৈদান্তজ্ঞানের পূর্ণাবতার ভগবৎ পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশঙ্কর। মধ্যযুগে—মধ্যভারতে শস্ত্র ও শাস্ত্রে তুল্যরূপ অধিকারী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী (মাধবাচার্য্য)। আর নব্যযুগে—বাঙ্‌লায় নব্য বেদান্তের প্রধান পরিপোষক বাগ্‌দেবীর বরপুত্র শ্রীমধুসূদন সরস্বতী। যাঁহার দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী প্রশস্তিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন—

"বেত্তি পারং সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী।
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী"॥

বাঙালী মধুসূদনের জন্ম ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার উনসিয়া গ্রামে। গ্রন্থপ্রকাশক রাজেন্দ্রবাবু বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নানাবিধ প্রমাণ দেখাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মধুসূদনের জন্মকাল খৃঃ ১৫২৫ হইতে ১৫৩০ অব্দের মধ্যে। এ-সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই। মধুসূদন বাল্যেই সংসার বিরাগী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পরম অনুরাগী হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন; কিন্তু মহাপ্রভুর দর্শন মিলিল না বলিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হইলেন। গৌড়ীয় মতানুযায়ী একখানি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছায়, তাঁহার অন্যান্য দর্শন আলোচনা করিবার কৌতূহল জন্মে। তদনুসারে তিনি বারাণসীধামে অদ্বৈতবেদান্ত ও মীমাংসা প্রভৃতি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অদ্বৈতবেদান্ত শিক্ষার সময়ে তাঁহার গৌড়ীয় মতের প্রতি অনুরাগ অন্তর্হিত হয়। সেজন্য তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক অদ্বৈত সম্প্রদায়ভুক্ত

হন্। সেই সময়ে মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য ব্যাসতীর্থ অদ্বৈতবাদখণ্ডনমানসে 'ন্যায়ামৃত'-নামক কূটতর্কময় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মধুসূদনও স্বমতরক্ষার্থ তাঁহার সহিত মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন্। তাহার ফলেই 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র আবির্ভাব। ইহা ন্যায়ামৃতের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ। শ্রদ্ধাস্পদ রাজেন্দ্রবাবু গ্রন্থকার-পরিচয়ে ইহাই সবিস্তারে দেখাইয়াছেন। তবে প্রায় একশত-কুড়ি-পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনী না লিখিলেও চলিত বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে গ্রন্থপরিচয়ে রাজেন্দ্রবাবু অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের যে ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্যই নূতন। গবেষণার বিষয়ও ইহাতে যথেষ্ট আছে। অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তাধারায় অদ্বৈতসিদ্ধির প্রকৃত স্থান কোথায়, তাহা রাজেন্দ্রবাবু আমাদিগকে অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। এজন্য বাঙালীমাত্রেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। রাজেন্দ্রবাবু ভূমিকামধ্যে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী "ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়" দিয়াছেন। ইহা সুচিন্তিত, সুলিখিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সম্পূর্ণ অবান্তর বিষয়রূপেই গ্রন্থকলেবরে স্থান পাইয়াছে। রাজেন্দ্রবাবু এই অংশটি পৃথক্ গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করিলে গ্রন্থের ভার কিছু লাঘব হইতে পারিত। অথচ গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না। আর সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র বাঙালীকে মূল্যও কিছু কম দিতে হইত। রাজেন্দ্রবাবুর নিকট আরও একটি অনুযোগ আমাদের আছে। যে মাধ্বমতের সহিত অদ্বৈতসিদ্ধির এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই মাধ্বমতের আরও একটু বিস্তৃত পরিচয়—বিশেষতঃ মাধ্ব-চিন্তাধারার একটি ইতিহাস ভূমিকা-মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে রাজেন্দ্রবাবু আমাদের অনুরোধগুলির বিষয় একটু বিবেচনা করিবেন।

অদ্বৈতসিদ্ধির উপর তিনটি প্রাচীন টীকা আছে—বলভদ্রের সিদ্ধিব্যাখ্যা ও ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকা বা গৌড়ব্রহ্মানন্দী এবং বৃহচ্চন্দ্রিকা। ইহার মধ্যে লঘুচন্দ্রিকাখানিই সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। এই লঘুচন্দ্রিকার উপর আবার একটি টীকা আছে। উহার নাম "বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী"। এই সকল টীকাকারগণের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরমত খণ্ডন। সেইজন্য ইঁহাদের টীকা হইতে মূল গ্রন্থের আশয় ভালরূপ বুঝা যাইত না। সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তমীমাংসাদি শাস্ত্রের অধ্যাপক ঋষিকল্প পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয় "বাল্যবোধিনী" নামে অদ্বৈতসিদ্ধির একটি নূতন টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকাটির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মূলের আশয় অতি সহজেই বুঝা যায়। অথচ পক্ষ-প্রতিপক্ষের যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারও ইহাতে বিশ্লেষিত করিয়া দেখান হইয়াছে। এজন্য এ টীকাটিকে একরূপ অমূল্য বলা চলে। বোধ হয়, বাঙালী মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির উপর ইহাই প্রথম বাঙালীরচিত টীকা।* বাঙালীর রচিত অদ্বৈতসিদ্ধি যেমন একদিন বেদান্তবিদ্যায় বাঙালীকে ভারতের পণ্ডিত সমাজে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল, আজ বাঙালী রচিত টীকাও তেমনি বাঙালীর সে পূর্ব্ব গৌরব অটুট রাখিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থের মূল ও টীকাটি নাগর অক্ষরে প্রকাশ করিলে, গ্রন্থখানি সমগ্র ভারতে প্রচার লাভ করিত। তাহা যখন ঘটিয়া উঠে নাই, তখন

* কেহ কেহ বলভদ্রকে বাঙালী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

গ্রন্থের মূল ও টীকাটি মাত্র নাগরাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিদ্যার্থিবৃন্দ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

মূল গ্রন্থের অনুবাদ ও তাৎপর্য্য অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে। দুরূহ সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়াই মনে হয় না। অনুবাদ-সাহিত্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এ পর্য্যন্ত বাঙ্‌লার এরূপ অনুবাদগ্রন্থ সর্ব্বশুদ্ধ তিন-চারিখানির অধিক প্রকাশিত হইয়াছে কি-না সন্দেহ।

রাজেন্দ্রবাবুর এ অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা সফল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

শ্রীঅশোকনাথ বেদান্ততীর্থ

Impressions of Soviet Russia and the Revolutionary World—DEWEY.
Dreiser looks at Russia—DREISER.
One looks at Russia—BARBUSSE.
রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ।

রাশিয়া সম্বন্ধে লম্বা লম্বা সংখ্যার তালিকা প'ড়ে মন যখন বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে, তখন খানকয়েক ভদ্রলোকের পাঠোপযোগী বইএর সন্ধান পাওয়া গেল। প্রত্যেক বইখানি প্রতিভাশালী ব্যক্তির লেখা। বিখ্যাত দার্শনিক Dewey দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নতুন শিক্ষাপদ্ধতি শিখতে ও শেখাতে। চীন, মেক্‌সিকো, নব্যতুর্ক ও রাশিয়াতে শিক্ষা নিয়ে প্রধানত যে-সব পরীক্ষা চলছে তারই আলোচনা ক'রে তিনি নিজের দেশের সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলি, সস্তা-দামে পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। রাশিয়া-সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বেশ বড়। Dewey-র লেখা অনেকেই পড়েছেন, দর্শন-সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্ব্বজনবিদিত। তার মূল্য যাই হোক না কেন, ভাষার প্রাঞ্জলতা, forthrightness এবং মতামতে একটা সাধারণ-বুদ্ধির পরিচয় থাকার দরুণ তার সব লেখাই ভারী উপভোগ্য হ'য়ে উঠে। কোন উপজীবিকার সাহায্যে দেহ ও মনের গঠনকেই তিনি শিক্ষা বলেন; তাঁর মত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে জীবজগতের নিয়মানুসারে ব্যক্তিকে খাপ খাওয়ানই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজকে যখন উন্নত করতে হবে, তখন জীবনের সাফল্যকে বাদ দিলে চলবেই না। আজকালকার সমাজ গণতন্ত্রমূলক হয়েছে, অতএব ভাববিলাসী সাহিত্যিক কিম্বা দার্শনিকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা দুষ্কর; বিজ্ঞান-শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা, এবং এই বিজ্ঞান-শিক্ষার দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে মিলিত করা যাবে। Naturalistic মনোভাবই শিক্ষিতের একমাত্র উপযুক্ত মনোভাব। প্রত্যেক ভাবকে ব্যবহৃত করলে যতদূর টেঁকে ততদূর পর্য্যন্ত তার মূল্য দেওয়াই প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র মানসিক কর্ত্তব্য। ব্যবহারিক জগতের বাধাবিপত্তিকে স্বীকার ক'রে জয় করাই চিন্তার ধর্ম্ম। এই ধরণের গোটাকয়েক মূলকথা সোজা ভাষায় বলার জন্যই Dewey-র এত প্রতিপত্তি। পলিটিক্সে তাঁর মতগুলি আমেরিকাবাসীরই উপযুক্ত—তিনি voluntary

association-এর ভক্ত, সবজান্তা, সর্ব্বময় কর্ত্তা একটা State-কে বিশ্বাস করেন না, কেননা তার সাহায্যে কোন মানুষ যথার্থভাবে শিক্ষিত হ'তে পারে না, তার নিজের ধর্ম্ম-অনুসারে ফুটে উঠতে পারে না। এক ওষুধে সব রোগ সারতে পারে, তিনি বিশ্বাস করেন না—প্রত্যেক সমস্যার ভিন্ন নিরাকরণ হওয়া উচিত, কেননা প্রত্যেকটির social milieu আলাদা আলাদা। এ হেন মন ও মত নিয়ে Dewey সাহেব রাশিয়া গিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং আদান-প্রদানে যে মতগুলি বইএতে ফুটেছে সেগুলির সঙ্গে অন্য একটি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের—আমাদের কবির মতেরও মিল রয়েছে। দুজনেই শিক্ষক, দুজনেরই অনুরাগ এক, দুজনেরই সিদ্ধান্ত এক।

অন্য দুজন নভেলিষ্ট রাশিয়া বেড়াতে যান। একজন আমেরিকান Theodore Dreiser যিনি আজ নয় কাল নোবেল্ প্রাইজ পাবেন, অন্যজন Henri Barbusse, ফ্রান্সের নামজাদা লেখক, ও Communist, একটু ভদ্র হ'লে ইতিপূর্ব্বেই তিনি নোবেল প্রাইজ পেতেন। বই দুখানার নামেই লেখকদের চরিত্রগত পার্থক্য ধরা পড়ে—Dreiser looks at Russia এবং One looks at Russia। একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন, অন্য ব্যক্তি সাধারণেরই একজন হ'য়েই দেখেছেন। দুজনেই সাহিত্যিক ব'লে রাশিয়ার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ছবিগুলি চমৎকার হ'য়েছে। গ্রামের লোকে কি করছে, মজুরের দল কারখানার ভেতরে ও বাইরে কি ভাবছে, কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করছে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাট ঘটনার মধ্য দিয়ে একটা বড় আদর্শ কি ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, এই সবের খুঁটি-নাটি বর্ণনা বই দু'খানিকে সাহিত্যের কোটায় তুলে ধ'রেছে। Barbusse আগে থেকেই Communist, অতএব হয়ত অনেকে তাঁর মন্তব্যগুলি গ্রহণ করবেন না। কিন্তু তাঁর লেখা এত convincing যে, অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। কোন স্থানেই তাঁর পূর্ব্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস নেই। রাশিয়া তাঁর কাছে earthly paradise হ'লেও, সে স্বর্গের বর্ণনা একজন ফরাসী সাহিত্যিকের। ড্রাইসারের চোখে রঙীন চস্‌মা ছিল না, সাদা চোখেই তিনি দেখেছেন—এবং যা প্রত্যক্ষ দেখেছেন তাই লিখেছেন। তাঁর নভেলের যা গুণ ও দোষ সবই এই বইখানিতে বর্ত্তেছে—তিনি সবই একটু epically দেখেন—তাঁর পটটি প্রকাণ্ড, দৃষ্টি সূক্ষ্ম নয়, প্রসারিত, ভাষা অমার্জ্জিত বরঞ্চ হয়। কি ক'রে মানুষের ভাগ্যচক্র ধীরেঅথচ নিষ্ঠুরভাবে ওঠে পড়ে তিনি ভাল ক'রেই জানেন। একজনের বুদ্ধি ক্ষুরধার, অন্যের প্রাণ মস্ত বড়, একজনের কলম ভোঁতা, অন্যের কলমে ইস্পাতের নিব্—একজন Latin, অন্যজন American, —একজনের চিত্রে অবকাশ বেশী, অন্যের পটভূমি খুঁটিনাটি দিয়ে ভর্ত্তি, একজনের বর্ণে আছে উজ্জ্বলতা, অন্যের বর্ণে আছে জ্বালা, দাহকতা, তবু তাঁদের সিদ্ধান্ত এক।

শেষে গেলেন কবি। তিনি আবার সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে জন্মেছিলেন। পরাধীন দেশে, দুঃখী দেশে জন্মালে যে আশা নিয়ে বিদেশ-ভ্রমণে, বিশেষ ক'রে, বিশ্বের তীর্থভূমি রাশিয়ায় লোকে যায়, তাঁরও সেই আশা ছিল। তার ওপর কবির চোখ হিন্দু দার্শনিকের, তাঁর অন্তরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা বাইরের আবরণ ভেদ করবার ক্ষমতার চেয়ে বেশী। স্বভাবত তিনি অবসরের মহিমা উপলব্ধি করেছেন, কীর্ত্তনও করেছেন। তিনি আবার বড় জমিদার, পরশ্রমজীবির একজন। কিন্তু

অন্ত জমিদারের মতন তিনি জমিকে শোষণ না ক'রে জমিতেই জমির টাকা বপন করেছেন। আমাদের চাষীর কল্যাণ কিসে হবে, কিসে তাদের অভাব মোচন হবে, কিসে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হবে, তাদের ঋণের মাত্রা কিসে কমবে, দেহের ওজন, মনের ফুর্ত্তি কিসে বাড়বে তিনি যত ভেবেছেন আমাদের দেশে আর কেউ অত ভেবেছেন কি না জানি না। শুধু ভাবা নয়, কাজও করা, প্রজাদের দিয়েই কাজ করান, সমবায়-পদ্ধতির দ্বারা, স্কুল-পাঠশালা, হাঁসপাতাল, ব্যাঙ্ক-স্থাপনের দ্বারা। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ, ক্ষমতা ছিল অল্প, সাহায্য করবার লোক ছিল কম, বাধা-বিপত্তিও ছিল বিস্তর। কবি আবার শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মার্কা শিক্ষার দোষ কোথায় বুঝেই তিনি শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন— সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে, বিদ্যালয়কে ভৌগলিক পরিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থানীয় ক'রে, ব্যবহারিকজীবনের কার্য্যকুশলতাকে আশ্রয় ক'রে, প্রত্যেক মানুষের সৌন্দর্য্যলিপ্সা স্বাভাবিক উপায়ে জাগিয়ে দিয়ে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আশার অনুরূপ ফললাভ হয় নি। তিনি জীবনে কেবল অন্যের মুখে 'ডিফিকাল্টিসে'র দোহাই শুনেই এলেন। শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে পারছেনা, রাজত্ব চালাতে হবে, অতএব "ল ও অর্ডারে"র জন্য, পুলিশ ও সৈন্য-বিভাগের জন্য সব টাকা চাই, বড় সাহেবদের জন্য মোটা টাকা চাই, দেশের লোকে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, তবু শোষণ-কার্য্যের বিরাম নেই, দেশের লোকের আত্মশ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, পেটে অন্ন নেই, মগজে শিক্ষা নেই, লোকের হাত পা বাঁধা, তার পর লাঠি চার্জ্জ, আবার তার চেয়েও কঠিন অসহ্য অপমান, সাইমন সাহেব ও পাদ্রীদের হাত থেকে—এই সব দেখে শুনে কবির প্রাণে, দেশের সত্যকারের দায়িত্বজ্ঞানী জমিদারের প্রাণে, দেশের প্রকৃত শিক্ষকের প্রাণে বড় বেজেছে। তারই সুর এই চিঠিগুলিতে বাজছে। আর একবার এই রকমই বেজেছিল—জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর পেয়ে। অন্য লোক হ'লে চিঠিগুলো নেহাৎ পেট্রিয়টিক্ হ'ত, কিন্তু তিনি ব'লে তাঁর চিঠির মধ্যে অন্য জিনিষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধান আছে, স্থিরসন্ধান আছে, এই চিঠির মধ্যে রাশিয়ার পাঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের, একত্রিক কৃষিপদ্ধতির, তার ললিতকলার, তার শিক্ষা-পদ্ধতির, তার কল্যাণ-সমিতির, শিশু-সমিতির, স্বাস্থ্য-সমিতির, তার যন্ত্রশালার, তার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, কম্যুনিষ্টদলের একাধিপত্যের দোষ-গুণের, তার ধর্ম্মের, তার কর্ম্মকুশলতার, তার প্রচণ্ড সমবেত চেষ্টার, পিছিয়ে পড়া জাতের জন্য সমবেদনার, এক কথায় সন্ধান আছে, আমাদেরই মত ধর্ম্মান্ধ অশিক্ষিত বন্ধন-জর্জ্জর জাতিকে মুক্তি দেবার ইতিহাসের। রাশিয়ায় যে ঘটনাটি ঘটেছে তার মর্ম্ম কথাটি এত স্পষ্ট ক'রে আর বোধহয় কেউ বলেনি। হয়ত Dewey, Dreiser, Barbusse-এর মর্ম্মগ্রহণ করবার প্রয়োজন ও তাগিদ কবির চেয়ে কম ছিল, তাঁরা স্ববশ-জাতির লোক, আমাদের মতন অপমানজর্জ্জরিত দীন-হীন জাতের লোক নন্। হয়ত তাঁদের ফিলসফি নেহাতই এই জগতের। তাঁদের সমাজ জীবিত, তাঁরা সাহস ক'রে আশা-ভরসা ক'রতে পারেন, দাবী ক'রতে পারেন, ভারতবাসী কিছুই পারে না, সেই জন্যে হয়ত কবির প্রাণে বেশী বেজেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য সাহস এই ব্যক্তির! সত্তর বৎসর বয়সে কী শেখবার ক্ষমতা! কী বিনয়! কোথায় গেল তাঁর Philosophy of Leisure? কোথায় গেল তাঁর সেই Green-এর idealistic notions

of property? কোথায় গেল তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ? কোথায় গেল তাঁর স্বর্গীয় তুলনা—সমাজটা প্রদীপের মতন, ওপরে আলো, নীচে অন্ধকার? কোথায় গেল তাঁর aristocratic isolation? তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে কি সব দিয়ে আসতে হয়? সত্য কথা তা নয় কিন্তু। তীর্থস্থানে কাউকে কিছু দিতে হয় না— শুধু বাইরের আবরণ ছাড়তে হয়, তবেই মানুষের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে। দেশের প্রতি এত টান, শিক্ষার জন্য এত ব্যাকুলতা, যারা জমি চাষ ক'রে সেই জনসাধারণের প্রতি এত সমবেদনা, দেশের কল্যাণের জন্য এত ব্যগ্রতা তাঁর অন্য কোন লেখায় আছে কি-না স্মরণ হচ্ছে না। রাশিয়ার সোভিয়েট-তন্ত্র জানতে গিয়ে কবির সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'ল, এইটাই প্রধান লাভ।

অন্য লাভ যথেষ্টই হয়েছে। যে লেখকদের নাম করেছি তাঁদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কবির সিদ্ধান্তের যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রধান মিল হ'ল এই যে, মানুষের মন ব'লে কোন একটা অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু নেই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মন ত বদলে যায়ই। কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাতের হাতে মানুষের সুখ-দুঃখকে ছেড়ে দেওয়া মূর্খতা, সময়ের ও শক্তির অপব্যবহার। অতএব rational control-এর প্রয়োজন রয়েছে। এতদিন যে চালনা-পদ্ধতি চল্‌ছিল তার প্রধান দোষ এই যে, তার মূলে ছিল একটি কোন শ্রেণীর স্বার্থ, সমগ্র সমাজের কল্যাণ তার পিছনে কাজ ক'রত না। অথচ বিপদ এই যে, সাধারণের হাতে কল্যাণের ভার দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নিজেদের কল্যাণ কি তাই তারা জানে না ব'লে কার্য্যত তারা সেই শক্তিশালী শ্রেণীর হাতে গিয়েই পড়ত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কল্যাণ-সাধনের এক উপায় সাধারণের শিক্ষা। সে শিক্ষা কেরাণীতৈরী করবার যন্ত্র নয়। তার সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ নিবিড়, সমাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, সে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন এবং মনকে জাগিয়ে দেয়, ভাবতে শেখায়, কাজ করতে বলে; তার দ্বারা মূঢ়তা লোপ পায়, ধর্ম্মান্ধতা ঘুচে যায়, মনে বল আসে, মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ব্যক্তির মন যুক্ত হয়। সে শিক্ষা concrete বটে, কিন্তু শুধুই practical নয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তৃত ক'রবে কে? জার নয়, পুরোহিত-পাণ্ডার দল নয়, পরশ্রমজীবি মধ্যস্থ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নয়, ক'রবে এমন একটি রাষ্ট্র যেটি সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বসাধারণের প্রতিভূ। কারা সর্ব্বসাধারণ? যারা হাত দিয়েই হোক, আর মাথা দিয়েই হোক জগন্নাথের ভাঁড়ারে কিছু এনে হাজির ক'রেছে। যারা কিছু না এনে ভোগের প্রত্যাশা করে, তাদের সাধারণের মধ্যে স্থান নেই। সমাজের উদ্দেশ্য ঠিক হ'ল, উপায় পাওয়া গেল, বাধা-বিপত্তি সরান হ'ল, যন্ত্র এল, বাকি রইল শিক্ষা বিস্তারের পন্থা, এবং শেখবার জন্য উদ্যম। পন্থা অনেক রকমের হ'তে পারে এই বিংশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞানের দৌলতে আছে, সিনেমা, ভ্রমণ, ল্যাবরেটরী, ম্যুজিয়ম, খবরের কাগজ, রেডিও। সবগুলিকে কাজে খাটান হ'ল। এখন, লোকের মধ্যে উদ্যম আনা যায় কিসে? উদ্যম আসে না কিসে? মানুষ ত স্বার্থপর হ'য়েই জন্মায় সকলে বলেন, তবু মানুষ শিক্ষিত হ'তে চায় না কেন? এক কারণ মানুষ স্বার্থ-সম্বন্ধে সচেতন নয়। অতএব স্বার্থ-সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রতে হবে। তার স্বার্থ ভোলাতে হবে স্বার্থের দ্বারা। ছোট জমি চাষ ক'রে লাভ হয় না দেখাতে হবে, একত্রিক সমবেত চাষই লাভের ব্যবসা দেখাতে হবে—তবেই তারা ছোট জমি ছাড়বে। কার্ল মার্কস্ বলেছিলেন যে মজুররাই, চাষীরাই, জিনিষের দাম তৈরী করে, অতএব জিনিষের ওপর অধিকার একমাত্র তাদেরই। তৈরী মত

পাওয়া গেল, তারই সাহায্যে হতাশ মনকে আশান্বিত করা হ'ল। ইতিহাসই, তাদের দিন আগত ঐ, ব'লে দিলে। প্রোপাগাণ্ডা চল্‌ল খুব জোরেই। হয়ত সব লোকে একটি মতের ছাঁচে ঢালাই হ'ল, তাতে হয়ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রইল না, কিন্তু সাধারণের উপকারে সে অপকারটুকু ঢাকা পড়ল। আশা করা যায়, যখন সমগ্র দেশটা আত্মস্থ হবে, তখন যে শিক্ষা স্বাধীন-চিন্তা শিখিয়েছে তারই দ্বারা মনের বৈচিত্র্য পুনরভিষিক্ত হবে। যতদিন না হয়, ততদিন প্রোপাগাণ্ডার, একটি দলের একাধিপত্যের ও অধিনায়কত্বের প্রয়োজন রয়েছে, এবং ততদিন সে প্রয়োজনের মূল্য স্বার্থান্ধ ব্যক্তির মতবৈচিত্র্যের প্রয়োজনের মূল্য অপেক্ষা বেশী। অতএব নিঃসহায়তার, দৈন্যের, দুঃখের অবসান হয় শিক্ষায়। কিন্তু আবার স্বজাতির সমস্যা সমগ্র মানবজাতির সমস্যার অন্তর্গত। বিশ্ব-ইতিহাসের ভৌগলিক পর্দ্দা উঠে গিয়েছে। "দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট ক'রে দেখতে পাচ্ছে, এইটেই মস্ত কথা"। তাই রাশিয়া জগতের তীর্থভূমি। তাই কবির "রাশিয়ার চিঠি" একটা মস্ত কীর্ত্তি।

আর একটি কথা মনে ওঠে। ভারতবর্ষে কম্যুনিজম সম্ভব কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিষী দিতে পারেন, অন্যে পারে না। তবে রাশিয়া-সম্বন্ধে কোন ভাল বই পড়লে মনে হয়, 'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ'?

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

———

পথে-প্রবাসে—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত। কলিকাতা ১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে এম, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দুগ্ধশুভ্র এণ্টিক কাগজে ডবল-ক্রাউন ষোলপেজী ১৫ ফর্ম্মার বই, পরিচ্ছন্ন ছাপা, বাঁধাই ভালো, কিন্তু অন্যান্য প্রায় সমস্ত বাংলা বইয়েরই মতো বাঁধা ভালো নয়। কয়েকটি আলোকচিত্রের প্রতিলিপি আছে, সেগুলি ছাপা সুন্দর হয় নাই, এবং একাধিক প্রকারের কালি ব্যবহার করায় সেগুলির শিল্পোৎকর্ষ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করেরই একটি কবিতায় পড়িয়াছিলাম মনে আছে,
"দিনে থাকি আনমনা, রাত্রে অচেতন"

কিন্তু আলোচ্য বইটি পড়িতে পড়িতে বারম্বার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, এই তরুণ লেখকের মনটি আশ্চর্য্যরকমের সজাগ। ইঁহার বুদ্ধির উপর জড়তা বা সংস্কারের আবরণ অল্প। নিজের পরিপূর্ণ চেতনার আলোয় সবকিছুকে আলোকিত করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, এবং যতখানিকে দেখিয়াছেন; তরুণ-মনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন; প্রকাশভঙ্গীতেও কোনো জড়তা নাই।—এইটুকু বলিলে বইটির দোষগুণ দুইই প্রায় একসঙ্গে বলা হইয়া যায়।

কিন্তু আগেই বলিয়া রাখি, যে-জিনিষ প্রাণবান্ তাহার দোষ-গুণ সত্যসত্যই আলাদা করিয়া দেখিতে যাওয়া ভুল। প্রাণধর্ম্মের আনুষঙ্গিক যে-বৈচিত্র্য, তাহার কোনও অংশটিকে বাদ দিয়া কোনও অংশের অস্তিত্ব কল্পনা করা সুকঠিন। অন্নদাশঙ্করের লেখার যে-দিক্‌টাকে দোষ মনে হইতেছে, সেটাকে ছাড়িয়া শুদ্ধমাত্র তাহার

গুণের দিক্‌টাকে পাইতে চাহিলেই পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। এই বইটির আলোপান্ত সমস্তটিতে সমস্ত দোষগুণাতিরিক্ত সেই প্রাণ-লক্ষণ বিদ্যমান আছে। ইহাই বইটির প্রথম এবং প্রধান পরিচয়।

প্রথমেই তাই দেখিতেছি, বইটি Plan করিয়া, কাঠামো বাঁধিয়া, প্রতিপদে, একজন প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া, সাজাইয়া গোছাইয়া লেখা নহে। উন্মুক্ত দুইটি চোখের এবং উন্মুখ একটি মানব দৃষ্টিতে দুই বৎসরের প্রবাস-পরিক্রমায় ইউরোপীয় পৃথিবীকে তাঁহার যখন যেমন লাগিয়াছে এবং তাহা হইতে যখন যেভাব মনে জাগিয়াছে শুদ্ধমাত্র প্রকাশের প্রেরণায় তাহা তখন প্রকাশ করিয়াছেন। সেই-হেতু বইটির গোত্র নির্দ্দেশ করাও সহজ নয়। ইংরেজীতে impressions বলিলে যাহা বোঝায়, কতকটা তাহার আদল আসে। কিন্তু তাহা বলিয়াও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, প্রশ্ন হইবে, কিসের impressions? যদি বলি, ইউরোপের, ভুল বলা হইবে। প্রথমতঃ সমগ্র ইউরোপ তাঁহার মনে রেখাপাত করে নাই। Teuton ইউরোপ তাঁহাকে যেভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, যেভাবে তাহার মনকে নাড়া দিয়াছে, Latin ইউরোপ সে-তুলনায় কিছুই করে নাই। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয় impressions লইয়াই তাঁহার মন কারবার করে নাই। তাঁহার আশ্চর্য্য গতিশীল মনকে ইউরোপ কেবল দোলা দিয়া সজাগ করিয়া দিয়াছে, তারপর তাঁহার চিত্তবৃত্তি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবলীলায় বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছে।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পৌর্ব্বাপর্য্যের কোনও হিসাব নাই। বইটির যেখানে সুরু সেখানে যে কেন সুরু এবং যেখানে শেষ সেখানে যে কেন শেষ, তাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ সেই কারণেই প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠার বইটি পড়িয়া শেষ করিতে একবারও ক্লান্তি বোধ হয় না। লেখক ত জমাখরচের হিসাব লেখেন নাই, তিনি সাহিত্য-রচনা করিয়াছেন। যখন যেকথা মনে জাগিয়াছে, সুন্দর করিয়া তাহা বলিয়াছেন।—জোরের সঙ্গে অনুভব করিয়াছেন বলিয়া বলা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহার কিছুই গোপন করেন নাই, যাহা অনুভব করেন নাই, কেবলমাত্র effect-এর খাতিরে তাহা বলিতে যাওয়ার মিথ্যাচারও কোথাও করেন নাই। এই সাহিত্যিক sincerity বা সত্যনিষ্ঠা বইটির দ্বিতীয় প্রধান পরিচয়।

তরুণ মনের যাহা যাহা লক্ষণ তাহার সাক্ষাৎকার এই বইটির প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই প্রায় পাওয়া যায়। মানব-জীবন-সম্পর্কিত এমন কোনও বিষয় প্রায় নাই, যাহাতে লেখকের মনের রুচি নাই, বা যাহা লইয়া তিনি চিন্তা করেন নাই। পথঘাট, বাড়ীঘর, শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, নাগরিক জীবন, পারিবারিক জীবন-যাত্রা, অতীতের ইতিহাস, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, সব কিছুর মধ্যেই তাঁহার চিত্ত রসের সন্ধান জানিয়াছে এবং সবকিছু লইয়াই তিনি সাহিত্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনো একটি জিনিষ লইয়া ধ্যান করিতে বসিয়া যাওয়া তরুণ-মনের স্বভাব নয়, তাই অন্নদাশঙ্করের লেখাতেও কোনও গভীর উপলব্ধির কথা নাই। গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, এমন কথা বলিব না, বুঝিতে পারি সে অবসর তাঁহার ছিল না। যদি থাকিত, হয়ত, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণবস্তু কোথায়, তাহার আসল স্বরূপটি কি, সে-পরিচয় তাঁহার লেখায় পাওয়া যাইত। হয়ত তাঁহার মুখে এমন কথা শুনিতে

হইত না, "সাত্ত্বিকতার চর্চ্চা ইউরোপে নেই, কোনোকালে ছিল না।" শুদ্ধমাত্র রাজসিকতার ভিত্তির উপরে এতবড় একটা সভ্যতা এত দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, ইহা অনুভব করি বলিয়াই সন্দেহ হয়, ইউরোপকে তেমনভাবে তলাইয়া বুঝিবার মতো সময় এবং মনোবৃত্তি লইয়া অন্নদাশঙ্কর ইউরোপে যান নাই। ইউরোপকে তিনি চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, সে দেখা সত্য দেখা, বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়াছেন, সে বোঝা সত্য বোঝা ; হৃদয় দিয়া ভালোবাসিয়াছেন, সে ভালোবাসা সত্য ভালোবাসা। কিন্তু সব-কটাই দিশাহারা ভাবে করিয়াছেন। ইউরোপের কোনও বিশেষ একটি রূপকে তিনি দেখেন নাই, ইউরোপীয় সভ্যতার কোনও বিশেষ একটি প্রকাশকে তিনি বোঝেন নাই, ইউরোপের কোনও বিশেষ একটি ইউরোপীয়ত্বকে তিনি ভালোবাসেন নাই। সব কিছুর উপরে ছাড়াছাড়া ভাবে তাঁহার দেহমনবুদ্ধি বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছে, সেখানেও পৌর্ব্বাপর্য্যের হিসাব থাকে নাই।

ইহা স্বাভাবিকই হইয়াছে এবং ভালোই হইয়াছে, তাহাই বলিতে চাই। "গভীর ভাবে গভীর কথা" অনেকের মুখে অনেক রকম করিয়াই ত শোনা যায়। কিন্তু এই যে বাহির হইতে সমগ্রতায় ভাসা ভাসা করিয়া কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে দেখা, ইহার মূল্য বোঝে ক'জন? কোনও দেশের গভীরতার রূপটাই ত তাহার একমাত্র রূপ নয়। অন্নদাশঙ্করের বই পড়িয়া যে ইউরোপকে দেখিতেছি, তাহার মর্ম্মস্থানটির পরিচয় না পাইয়াও তাহাকে পরমাত্মীয়ের মতো লাগিতেছে, তাহাকে ভালোবাসিতেছি। যাহা কিছু এই লেখকের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার চিন্তাকে নাড়া দিয়াছে, তাঁহার হৃদয় জয় করিয়াছে ; তাহা সামান্য নয়।

বইটিকে লেখক বাইশটি পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়াছেন। পাঠকের কাছে এই পরিচ্ছেদ-বিভাগের বিশেষ-কিছু মূল্য নাই, লেখকের কাছে নিশ্চয় কিছু ছিল। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ ইউরোপীয় কোনও একটি বিশেষ নিসর্গ-রূপ লইয়া সুরু হইয়াছে, দেখিতে পাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারি, লেখকের রচনার আসল inspiration-এর মূলটি কোন্‌খানে। অন্নদাশঙ্কর কবি, সৌন্দর্য্য যেমন করিয়া তাঁহার মনোমুগ্ধ করে, এমন আর কিছুতে করে না। সৌন্দর্য্যরসে মনকে অভিষিক্ত করিয়া লইয়া তার পর তিনি লিখিতে বসেন, তখন তাহার মন দেখিতে, বুঝিতে, ভাবিতে উৎসাহ পায়, এইটুকু মনে রাখিলে তাঁহার রচনারীতিকে বোঝা সহজ হইবে। বর্ষার নদীর মতো মনও একবার পরিপূর্ণ হইলে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাহার গতি হয়, সাবলীল সুন্দর, অব্যাহত। অন্নদাশঙ্করের প্রকাশভঙ্গী সাবলীল, সুন্দর, অব্যাহত। এমন সুন্দর গদ্য-রচনা খুব বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

কিন্তু দোষগুণ নির্দ্দেশ না করিয়াও একথা বলা যায় যে, অন্নদাশঙ্করের গদ্য-রচনা কবির গদ্য-রচনা। কবিত্বময়, উপমা-বহুল। কিন্তু উপমাগুলি সুসঙ্গতিতে সুন্দর, কষ্ট-কল্পিত নয়। রবীন্দ্র-যুগে যেমনটি হওয়া উচিত তাহাই। কিছু কিছু তুলিয়া দিবার লোভ হইয়াছিল, কিন্তু সে-লোভ সম্বরণ করিতেছি। অমন সুন্দর জিনিষকে কাটা-ছেঁড়া করা বর্ব্বরতা হইবে।

দুটি-তিনটি কথায় একটি সমগ্র ভাবকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ। ভাষাকে অনাবশ্যক ফেনাইয়া তোলা, অনুপ্রাস-অলঙ্কারের বাহুল্য, বক্তব্য বিষয়কে অনাবশ্যক ঘোরালো বা অনাবশ্যক জোরালো করিয়া বলা, এসব কিছুই

তাঁহার লেখাতে নাই। প্রকাশভঙ্গীতেও তাঁহার সাহিত্যিক sincerity লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধিমান মানুষ কবিতা লিখিতে বসিলেও নিজের মতামত সকলকে শোনাইয়া দিতে চেষ্টা করে, সুতরাং ইউরোপ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া অন্নদাশঙ্কর যে নানাবিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ বইটির বিষয়-বস্তু হইতে তাঁহার মতামতগুলিকে বাদ দিলে, বিশেষ কিছু অল্পর অবশিষ্টও থাকে না। বিচার-বিতর্কের দিক দিয়া, মতামতগুলির মূল্য সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার ক্ষেত্র এ নয়, এবং না বলিলেও আসে যায় না কিছু। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বইটির ভূমিকাতে ঠিকই বলিয়াছেন, "মতামতের বিশেষ কোনও মূল্য নেই, যদি না সে মতামতের পিছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।" অন্নদাশঙ্করের মতামতের সবগুলিই সুপরিণত নয়, কোথাও কোথাও আত্মবিরোধ-দোষ ঘটিয়াছে, এমনকি একই পৃষ্ঠাতেও ঘটিয়াছে ; অন্ততঃ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি অসার হইয়াছে, এবং ফ্রান্সের এশিয়া-মহাদেশস্থিত উপনিবেশগুলির শাসনরীতি-সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মারাত্মক অভাব তাঁহার ফ্রান্স সম্বন্ধীয় একটি উক্তিতে সূচিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও তাঁহার মতামতের পশ্চাতে যে-একটি সুন্দর সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুসন্ধিৎসু, জীবন্ত এবং জাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাই এগুলিকে মূল্যবান্ করিয়াছে।

বিশেষ করিয়া আমাদের ভাল লাগিয়াছে, নারীজাতি-সম্বন্ধে লেখকের সহজ প্রাণবান্ সহানুভূতি।—ইহা নিতান্তই সহজ-সংস্কারের-ব্যাপার, বিচার-নিরপেক্ষ ; মতামতের বিষয় হইয়াও বাহিরের জিনিষ। এই একটা জায়গাতে লেখক কতবার যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই, অথচ একবারও ভুল করেন নাই। নারীজাতি-সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার একেবারে মর্ম্মস্থানটিতে তাঁহার দৃষ্টির আলোক সহজে গিয়া পৌছিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা নারীদের sexless করিয়া তুলিতেছে কি-না, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন :

"নারীর নারীত্ব যে সাগরতলের চেয়েও অতল ; পরিবর্ত্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বুদ্‌বুদ, কোনকালেই তা' অতলস্পর্শী হ'তে পারে না ; বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মন্থন ক'রেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না, কেবল কাড়তে পারা যায় তার সুধা আর তার বিষ।"

ইউরোপীয় জীবন-যাত্রার মধ্যে নর-নারীর সম্পর্কটিই যে বিশেষ করিয়া তাঁহার মনোহরণ করিয়াছে, এ-স্বীকারোক্তি বইটির প্রায় প্রারম্ভেই অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি করিয়াছেন :

"সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতিকাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা। নারী-সম্বন্ধে এদেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে মুমূর্ষুর মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য্য তার দেহকে ও মনকে তুল্যরূপ সক্রিয় ক'রে তোলে। কেবল চোখে দেখবারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা' ঐশ্বর্য্যান্বিত ক'রে দেয়। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিকে নিজের হাতে নিভিয়েছেন।"

স্ত্রীপুরুষের মিলিত নাচের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছে :

"আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন। নিজের নিকট আত্মীয়-আত্মীয়া ছাড়া এত বড় সমাজের যত পুরুষ, যত নারী সকলেই পরস্পরের

কাছে অলক্ষ্য অস্পর্শ্য। তার ফলে নীতির দিক্ থেকে অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম কৌতূহলের সৃষ্টি ও রুচির দিক্ থেকে জন্মান্ধতার উদ্ভব। আমাদের রূপবোধের একদেশদর্শিতা, স্পর্শবোধের অস্বাভাবিক বুভুক্ষা আমাদের সমাজকে ত ক্লীবত্বের অচলায়তন করেছেই, আমাদের সাহিত্যিকেও খণ্ডিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাগার ক'রে তুলেছে। ....বল্‌রুমের নাচ উঁচুদরের কেন, কোন দরেরই আর্ট নয়। ওটা হচ্ছে সামাজিকতার একটা অঙ্গ। সমাজের দশজন পুরুষের সঙ্গে দশজন নারীকে পরিচিত ক'রে দেবার একটা উপায়। যে-সমাজে নিজের স্বামী বা নিজের স্ত্রী নিজেকে অর্জ্জন কর্‌তে হয়, সে-সমাজে এইপ্রকার পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যক। এমন সমাজে প্রতি পুরুষের পৌরুষের উপর সর্ব্বনারীর নারীত্বের দাবী যেমন প্রতি পুরুষকে বলবান্, প্রিয়দর্শন ও সুগঠিত দেহ হ'তে প্রেরণা দেয়, প্রতি নারীর নারীত্বের উপর সর্ব্বপুরুষের পৌরুষের দাবী তেমনি প্রতি নারীকে রূপবতী, স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হ'তে প্রেরণা দেয়। সর্ব্বপুরুষের ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি পুরুষের দাবী এবং সর্ব্বনারীর ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি নারীর দাবী বলবান্‌কে করে প্রেমবান্ ও রূপবতীকে করে প্রেমবতী।"

সর্ব্বপুরুষের দাবী প্রতি নারীর এবং সর্ব্বনারীর দাবী প্রতি পুরুষের কেবলমাত্র দৈহিক সৌষ্ঠব এবং স্বাস্থ্যের উপরেই, লেখক তাহা বলিতে চান না ধরিয়া নিলে, স্ত্রীপুরুষের অবাধ সামাজিক মিলনের স্বপক্ষে উপরোক্ত যুক্তিগুলি অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

ইউরোপের পারিবারিক জীবনের simplicity বা গ্রন্থিস্বল্পতার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন:

"আমাদের স্ত্রীলোকদের মতো প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদের আর নেই। তারা যে এদের স্ত্রীলোকদের চেয়ে স্নেহময়ী, এমন মনে কর্‌লে দেশকালনিরপেক্ষ নারীপ্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তারা এদের স্ত্রীলোকদের তুলনায় স্নেহান্ধ, তারা আমাদের রেখেছে 'বাঙালী ক'রে, মানুষ করেনি।' কোনো দুঃসাহসিক ব্রতে তারা আমাদের নিষ্ঠুর আনুকূল্য করে না, তাই সে হতভাগিনীদের আমরা 'পথি বিবর্জ্জিতা' ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাওয়াটাকেই মনে করি চরম দুঃসাহসিকতা। এবং যখন সন্ন্যাসী হ'য়ে যাই, তখন কুলবনিতার বারবনিতার ভেদ রাখিনে।"

এমনই করিয়া নারীজাতির কথা নানাপ্রসঙ্গে বারম্বার উঠিয়া পড়িয়াছে, এবং যখনই উঠিয়াছে, লেখকের সহজবুদ্ধি তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো সমস্ত সংশয়-সমস্যা এবং মিথ্যাসংস্কারের জাল অনায়াসে ছেদন করিয়াছে। সহজ-সাবলীল ভাষা সাবলীলতর হইয়াছে, তেজোময় প্রকাশভঙ্গীতে দ্বিগুণ তেজ সঞ্চারিত হইয়াছে, বিচারবুদ্ধি একবার ভুলিয়াও তাঁহাকে ভুল পথে লইয়া যায় নাই।

বাংলা দেশে আজিকার দিনে এমন মানুষের অভাব নাই, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষকে ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,—নারীত্বের একটি নূতন আদর্শ, এবং সেই আদর্শে তৈরী নূতন এক type-এর নারী। অন্নদাশঙ্করের বইটির সেই-দিক্‌টিকে লইয়া আলোচনা করিয়াই, এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও মনে হইতেছে যে, যদি তিনি ইউরোপে গিয়া আর কিছুই না দেখিতেন, আর কিছুই তাঁহার মনে মুগ্ধতা না জাগাইত, এবং ফিরিয়া আসিয়া আর কিছুরই

কথা আমাদিগকে না বলিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার এই গ্রন্থরচনা সার্থক হইত।

ইউরোপকে চাক্ষুষ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই অথচ ইউরোপকে অন্তরে অন্তরে যাঁহারা ভালোবাসেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

GRAND HOTEL—VICKI BAUM (GEOFFREY BLES).

জার্ম্মাণ লেখক Vicki Baum-এর লেখা Menschen Im Hotel নামক বিখ্যাত গল্পের ইংরাজী অনুবাদ Grand Hotel। মানুষের জীবনে যখন সুখের অভাব হয়, তখন সে সুখের খোঁজে নিজের গণ্ডির বাইরে চলে যেতে চায়,—মনে করে যে, বাইরে কোথাও বাস্তব সুখ আছে যা' চেষ্টা করলে আয়ত্তের মধ্যে আসতে পারে। ভাবে যে, আমার জীবনটাই বৃথায় গেল, কিন্তু অন্যান্য লোক কি সুখেই না আছে। আমার অবস্থা যদি অমুকের মতন হ'তো তা' হ'লে হয়তো আমার জীবন সার্থক হ'তো। কিন্তু এ-সব চিন্তা মানুষের মনে মনেই থাকে, কারো এমন সাধ্য নেই যে, নিজের পারিপার্শ্বিকের গণ্ডি কাটিয়ে বাইরে যায়। এমন কোনো সুযোগ মেলে না, যাতে তার অবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রে যেমনটি চায় তেমনটি ঘটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু দৈবাৎ যদি কেউ সুযোগ পেয়ে যায় এবং সুখ পেতেই চাই ব'লে দড়ি-দড়া ছিঁড়ে মরিয়া হ'য়ে বেরিয়ে পড়ে, তা' হ'লে তার কি অবস্থা দাঁড়ায়, তার উদ্দাম বাসনা কোন পথ দিয়ে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, কোথায় তার তৃপ্তি মেলে, সেই বিষয় নিয়েই গল্পটির অবতারণা।

জার্ম্মাণির এক ছোট সহরে সূতার কলে এক মধ্যবিত্ত কেরাণী, নাম ক্রিঙ্গলাইন, সপরিবারে বাস করতো। তার শরীর চিররুগ্ন, আর সংসারেও তার সুখ ছিল না। কারণ যাকে নিয়ে সংসার, সেই স্ত্রীর সঙ্গে তার মতে মিলতো না। স্বামী রোগা, কবে আছে কবে নেই, তাই স্ত্রীর একটু হাতটান ছিল, ভবিষ্যতের জন্য কিছু পয়সা সঞ্চয়ের চেষ্টা করতো। লোকটার একটু সৌখিন হবার ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীর জন্য তা' হ'তে পারতো না। তার গান-বাজনার সখ, একটি পিয়ানো কেনার বড় ইচ্ছা, কিন্তু তার সুযোগ পায় না। একটি কুকুর পুষেছিল, ট্যাক্স দিতে হ'বে ব'লে স্ত্রী তাকে বিদায় ক'রে দিলে। সমস্ত দিন খাটুনির পর সন্ধ্যার সময় হয়তো একটু বই পড়বে, স্ত্রী ডাকলে তার রান্নার কাঠগুলো কেটে দিতে। লোকটা সাধারণের চেয়ে একটু অন্য রকমের ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী তাকে তেমন ভাবে বুঝতো না, কাজেই তাকে সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকতে হ'তো। তবু খুঁটি-নাটির মধ্য দিয়ে একরকম ক'রে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তার তাকে জানিয়ে দিলে যে, তার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। তার যে অসুখটা থেকে থেকে দেখা দেয় সেটা শীঘ্রই একদিন এমন বেড়ে উঠবে যে, তার থেকে সে আর রক্ষা পাবে না। ডাক্তারের কাছে এই নোটিস পাবার পর সে ভেবে দেখলে যে, তার একঘেয়ে কেরাণী-জীবন ঘরে এবং বাইরে কেবল বকুনি খেয়ে খেয়ে বৃথাই কেটে যায়, জীবনের সুখ কিছুই ভোগ করা হয় না। তার কলের মনিব তারই মত মানুষ হ'য়ে জন্মেছে,

অথচ পৃথিবীর কত আনন্দই ভোগ করছে, আর সে তার কোনোই আস্বাদ পাবে না, এমনি এমনিই মরে যাবে? সে স্থির করলে যে, মরবার আগে জীবনের যত কিছু সুখ আছে সব একবার ভাল ক'রে ভোগ ক'রে নেবে। এই ভেবে তার যা' কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, সব বেচে কিছু মোটা টাকা হাতে নিয়ে চিকিৎসা করাবার ভান ক'রে ছিয়াচল্লিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ ক'রে বার্লিন সহরে পালিয়ে গেল। সেখানে যে-হোটেলে তার মনিব গিয়ে ওঠে, সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্র্যাণ্ড হোটেল, সেখানে গিয়ে সব চেয়ে ভাল একখানা কামরা ভাড়া নিলে। এই গ্র্যাণ্ড হোটেল গল্পের প্রধান ক্ষেত্র। গল্পের যা' কিছু ঘটনা তা' এই হোটেলের মধ্যেই এবং নায়ক-নায়িকা সকলেই এই হোটেলের আগন্তুক ও অধিবাসী। কেউই এখানে চিরকাল থাকে না; দুদিনের জন্য আসে, আবার দুদিন বাদে কে কোথায় চলে যায়। হোটেলের প্রবেশ-পথে কাঁচের ঘূর্ণি-দরজা ক্রমাগতই ঘুরছে, আর কত রকমের কত লোক কখন আসছে, কখন যাচ্ছে তার কোনো ঠিকানাই নেই। দরজাটা অবিরাম ঘুরে ঘুরেই চলেছে, গতিবিধির বিরাম নেই। হোটেলটি যেন এই বড় পৃথিবীর একটি খাটো সংস্করণ, যেখানে নিত্যই নানারকম লীলাখেলা চলছে, কিন্তু কেউই এবং কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এই হোটেল-সম্বন্ধে লেখক গল্পটির মাঝে মাঝে অনেকবার এক-একটি চমৎকার দার্শনিক ইঙ্গিত করেছেন।

হোটেলে এসে অনেক লোকের সঙ্গে এবং অনেক কিছুর সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটলো। কিন্তু সে খুঁজে বেড়াচ্ছে আসল আনন্দ কোথায়,—Where is real life? মনে হচ্ছে আসল প্রাণ-প্রবাহ কোথায় যেন বেয়ে চলেছে,—কিন্তু সে কই? একজন pessimist বন্ধু বল্লেন,—"Does life exist at all as you imagine it? The real thing is always going on somewhere else।" সুখ-সম্বন্ধে চিরকাল এমনিই মনে হবে,—এখানে তা' নেই, যেন আর কোথাও আছে। কিন্তু ক্রিঙ্গলাইন কেবলই মনে ভাবছে যে, শীঘ্র তাকে মরতে হবে, সে মরিয়া হ'য়ে একধার থেকে সব সুখের বস্তুর আস্বাদ নিতে লাগলো। ভাল পোষাক পরলে, ভাল খাবার খেলে, মোটর-এরোপ্লেনে সখ মিটিয়ে চড়লে, নাচলে, গাইলে, জুয়া খেল্‌লে, মদ খেলে এবং বিলাসের যা' কিছু চরম তা' সমস্তই ভোগ ক'রে নিলে। এমন কি, তার পুরানো মনিবের উপস্থিতিতে গায়ে প'ড়ে তাকে তার পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য মনের ঝাল মিটিয়ে দুকথা শুনিয়ে দিলে। যথেষ্ট আমোদ পেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু তৃপ্তি তবুও মিল্‌লো না। একদিন ঘটনাচক্রে হঠাৎ এক সুন্দরী যুবতী অত্যন্ত ভয় পেয়ে নগ্ন অবস্থাতেই আশ্রয় নিতে তার ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো। তাকে সে আশ্রয়ও দিলে, যথেষ্ট শুশ্রূষাও কর্‌লে, কিন্তু সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য আর নগ্ন দেহের গঠন দেখতে দেখতে তার প্রাণে কি এক অনুভূতি, কি বিস্ময় ও পুলক জেগে উঠলো,—"this buoyancy and moltenness and transparency and release was known to him only in dreams।" সে ভাবলে,—এতটা সৌন্দর্য্য তবে পৃথিবীতে সত্যই তো আছে,—আর সত্যই আমি তা' দেখলুম। "It can really happen that a girl is so wonderfully beautiful, so utterly beautiful।" এবং অবশেষে এখন সে জীবনের স্বাদ প্রথম অনুভব কর্‌লে,—এখন সে সত্য সত্য বাঁচার মতন বেঁচে উঠ্‌লো,—at this moment he truly, actually and utterly lived। সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন সার্থক হ'য়ে উঠলো। মরতে আর তার দুঃখ রইলো না।

বইখানির আসল আখ্যান-বস্তু এইটুকু,—কিন্তু এতে আরো অনেক জিনিষ আছে। এক হিসাবে একে sensational বলা যায়। এতে চুরী আছে, খুন জখম আছে, লুকোচুরী আছে, তা' ছাড়া কুস্তির লড়াই, জুয়ার আড্ডা, থিয়েটারের ষ্টেজ, বিলাস গৃহের ছবি প্রভৃতি অনেক কিছুই আছে। কিন্তু এই সব পার্থিব উপকরণের মধ্য দিয়ে এমন একটি কবিত্বের মিষ্ট-ধারা, এমন একটি দরদের সুর বেয়ে চলে গেছে যা' সচরাচর এই জাতীয় গল্পের মধ্যে দেখা যায় না। বইখানি পড়া হ'য়ে গেলে এই সব ঘটনার কথা শীঘ্রই মন থেকে মুছে যায় কিন্তু সেই মিষ্ট সুরটি গানের রেশের মত অনেক দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে বাজতে থাকে আর স্থানে স্থানে যে চমৎকার কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা' টুক্‌রা টুক্‌রা আকারে মনে প'ড়ে যায়। এর বলবার ভঙ্গী ভালো, ভাষাও খুব ভালো, তাই ঘটনা-বহুল হ'লেও বইখানি এত ভালো।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য।

KARL UND ANNA—LEONARD FRANCK.

ইয়োরোপের শেষে এসিয়ার সীমান্তে রুসিয়ার এক steppe-তে গল্পটির সুরু। দিগন্তপ্রসারিত সুবিস্তীর্ণ শূন্য প্রান্তর মাইলের পর মাইল চ'লে গেছে—দিগন্ত যেন মরীচিকা, যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততই সে দূরে আরও দূরে সরে শ্রান্ত পথিককে ভুলিয়ে নিয়ে চলে—বন্ধ্যা ভূমির ওপর অসীম আকাশ করুণ, উদাস; চারিদিকে কোথাও দিশা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অসীম শূন্য প্রান্তরের একধারে রুসদের কাছে বন্দী দু'টি জার্ম্মাণ সৈনিক মাটি খুঁড়ে লম্বা ট্রেঞ্চ তৈরী ক'রে চলেছে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তারা মাটির তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে—যুদ্ধ-লাইন হ'তে এত দূরে শত্রু আসার সম্ভাবনা খুবই কম, ট্রেঞ্চ খোঁড়ার বিশেষ দরকার নেই, তবু হাতে কাজ চাই ত।

কার্ল ও রিচার্ড দুজনেই শ্রমজীবি, জার্ম্মাণীতে কলে কাজ করত; রিচার্ড বিবাহিত, নতুন ঘরকন্না পেতেছিল, কার্ল কিন্তু গৃহ-হারা, নারীর প্রেম সে জীবনে কখনও জানেনি। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মাঝে মাঝে রিচার্ডের মন উদাস হয়, একটি নারীমূর্ত্তি তার চোখে দিগন্ত ভরে ভেসে ওঠে, কার্লকে সে তার প্রতীক্ষমানা স্ত্রীর কথা বলতে আরম্ভ করে। দিনের পর দিন কার্ল রিচার্ডের কাছে তার সহরের কথা, স্ত্রীর কথা, বিবাহিত জীবনের কথা শুনেছে,—তার স্ত্রী কেমন দেখতে, কেমন ভঙ্গীতে সে দাঁড়ায়, তার দেহে কোথায় কি দাগ আছে; তার ঘরের যে সব আসবাবপত্র কিনেছে তার কত কিস্তি দাম বাকী—এমনি রিচার্ডের সংসারের সব খুঁটিনাটি এ-গৃহহীন কার্লের জানা। রিচার্ড বলে ওঠে, "জানিস কার্ল, যখন সে ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে ওঠে, আমি শুই দেওয়ালের দিকে আর সে--" কার্ল বাধা দিয়ে বলে, "হাঁ, জানি, হাজারবার তোর কাছে শুনেছি।" তবু রিচার্ড ব'লে চলে। একজন তার গৃহের কথা এমনি ক'রে ব'লে একটু তৃপ্তি পায়, বিরহ ব্যথার লাঘব হয়; আর একজন তৃষিতের

মত এ-বর্ণনা শোনে—তার অন্তরে অজানা বেদনা, অরূপ স্বপ্ন; তাদের ঘিরে শূন্য প্রান্তরের উদাস দিন, স্তব্ধতা-ভারাক্রান্ত রাত্রি।

সহসা একদিন দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। কর্ত্তৃপক্ষদের হুকুমে রিচার্ডকে আরও দূরে অন্য জায়গায় পাঠান হ'ল, কার্ল রইল একা। আর সে একা থাকতে পারলে না। আনা, রিচার্ডের স্ত্রী আনা, কোন্ সুদূর থেকে তাকে আকর্ষণ করছে, তার মন চঞ্চল, গৃহের শান্তির জন্য, একটি নারীর প্রেমের জন্য তার হৃদয় তৃষিত—প্রহরীদের অলক্ষ্যে কার্ল একদিন বাহির হ'য়ে পড়ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য—এক জার্ম্মাণ সহরের শ্রমজীবিদের পাড়া। সরু বাঁকা পথ, কালো বড় বাড়ী, চাপা আকাশ, রুসিয়ার প্রান্তরের করুণতা হয়ত আছে কিন্তু অসীমতা নেই। চারমাস পরে কার্ল রিচার্ডের সহরে এসে পৌছাল। রিচার্ডের বর্ণনা শুনে শুনে এ-সহরের ছবি তা'র মনে আঁকা রয়েছে, রিচার্ডের বাড়ীর পথ তা'র জানা; বাড়ীর সামনে এসে তা'র হৃদয় দুলে উঠল,—দ্বিতীয় উঠানে বাঁ দিকে প্রবেশের পথ, দু'সিড়ি উঠে বাঁ দিকে দ্বিতীয় দরজা—রিচার্ডের কথাগুলি তা'র মনে লেখা।

দরজায় এক টোকা দিয়ে ধীরে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করলে—কতদিন কল্পনায় এ-ঘরটির কথা সে ভেবেছে, কত স্বপ্নছবি এঁকেছে; এ-ঘরের কোথায় শোবার খাট, কোথায় টেবিল, কোথায় রাঁধবার উনান, তার সব জানা। কার্ল ডাকলে, "আনা!" জানালার ধারে আনা দাঁড়িয়ে, কার্লের চোখে যেন সুখ-স্বপ্ন; আনা তার প্রিয়া, তার দেহে কোথায় কোন দাগ আছে তা' সে জানে। আবেগের সঙ্গে কার্ল বল্লে "আনা—আনা—আমায় চিনতে পারছোনা?" আনা ঘরের মাঝে এসে দাঁড়াল, আশ্চর্য্যি হ'য়ে বল্লে, "কে আপনি?" হাতের বোঁচকাটা চেয়ারের উপর রেখে কার্ল বল্লে, "চেয়ারটা আবার রং করতে হ'বে দেখছি, আমি ত তোমায় বলেছিলুন, এ রং বেশীদিন থাকবেনা, ফ্যাকাসে হ'য়ে যাবে—জানলায় নতুন পর্দ্দা দেখছি—আমরা সেবার কি সস্তায় সে হলদে পর্দ্দাগুলো কিনেছিলুম—" আনা যেন স্বপ্নে কথা শুনে ব'লে উঠলো, "কে আপনি?" কার্লের মুখ সাদা হ'য়ে গেল, ধীরে বল্লে "আমি রিচার্ড।" হাতটা টেবিলে চেপে আনা, বল্লে, "আমার স্বামী? না, আপনি আমার স্বামী নন।" "আনা—আনা—আমায় বিশ্বাস করছোনা—আর আমি কেবল তোমার কথা ভাবতে ভাবতে এসেছি—"

আনা একটি হল্‌দে পোষ্টকার্ড কার্লের হাতে দিলে। কার্ল পড়লে, তাতে লেখা, ১৯১৪র ৪ঠা সেপ্টেম্বরে রিচার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে। যুদ্ধ-আফিসের চিঠিটা আবার পড়ে রহস্যময় হেসে কার্ল বল্লে, "এ ভুল!" আনার দিকে হাত বাড়িয়ে সে এগিয়ে এল।

আনা বুঝলে, এ সত্যি তার স্বামী নয়। কিন্তু এ প্রেম-ভিখারী অতিথির প্রতি তার অন্তর মমতায় ভরে গেল, এ যেন অসহায় শিশু, মাতৃস্নেহের জন্য কাঁদছে। আনা চেঁচালে না, পাড়ার লোক ডাক্‌লে না, কার্লকে চলে যেতে বলতে পারলে না। সে তবু ধীরে বল্লে, "আপনার বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে।" তার পর টেবিলে খাবার সাজাতে লাগল। কার্ল বলে উঠল, "আচ্ছা পুরানো কাঁটাটা নেই বুঝি, সেই তিন দাঁতওয়ালা কাঁটাটা, তার একটা দাঁত একটু ছোট ছিল—আচ্ছা আসবাবপত্তরের দাম দেওয়ার কত কিস্তি এখনও বাকী আছে?" আনা চমকে উঠল। এ তার

স্বামী? না, এ-তার স্বামী নয়, কিন্তু এ সব কথা সে জানলে কেমন ক'রে! ধীরে আনা বল্লে, "আমি এ চার বছরে সব দাম দিয়েছি।"

কার্ল তার স্বামী নয়, তবু ধীরে ধীরে দিনে দিনে আনা কার্লকে তার অন্তরে স্বামী ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে, তাকে স্বামীর সব অধিকার দিলে, গৃহ-হারা প্রেমার্ত্ত অতিথিকে সে বলতে পারলে না, চলে যাও।

বাড়ীর লোকেরা, পাড়ার লোকেরা জানলে আনার স্বামী ফিরে এসেছে, যুদ্ধে মরে যাবার কথাটা ভুল; সবাই আনাকে শুভকামনা জানালে, আনা ভাগ্যবতী, তার মৃত স্বামী বেঁচে ফিরে এসেছে। পাড়ার ছেলেরা কার্লকে ডাক্‌ত, রিচার্ড। কার্ল এখন হেয়ার রিচার্ড। কলে সে এক কাজ খুঁজে নিলে। তার জীবন প্রেমে আনন্দে ভরে উঠ্‌ল।

কয়েকমাস কেটে গেল। জার্ম্মাণীর সঙ্গে রুসিয়ার যুদ্ধ থেমে গিয়ে সন্ধিসর্ত্ত-অনুসারে দু'পক্ষের সব বন্দীদের বিনিময় হ'ল। রুস কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে রিচার্ড আনার কথা ভাবতে ভাবতে ট্রেনে উঠ্‌ল; কার্ল ও আনার দু'দিনের বাঁধা সুখের ঘরের মধ্যে মূর্ত্তিমান প্রলয়ের মত একদিন সে সহসা হাজির হ'ল।

শেষের দৃশ্যটি বড় করুণ। দরজা খুলে পুরাতন ঘরে ঢুকে রিচার্ড দেখে, কার্ল ঘরে বসে। সে অবাক হ'য়ে বল্লে, 'তুমি? তুমি এখানে? কি আশ্চর্য্য, আমি এই মাত্র আসছি, এসেই তোমার সঙ্গে দেখা।" সে-ঘরে যখন আনা প্রবেশ করলে, সে যেন ভূত দেখ্‌লে, দিশাহারা হ'য়ে অর্দ্ধঅচেতনভাবে মাতালের মত টলে পড়ে গেল, কার্ল তাকে ধরলে। রিচার্ড ব্যথিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "কি হয়েছে আনা? তুমি কি অসুস্থ—আনা—কি হয়েছে তোমার?" আনা কোন উত্তর দিলে না; রিচার্ড তার কাছে এগিয়ে এল; কার্ল বল্লে, "আনা আমার স্ত্রী, আমি সব বলছি।" কিছু বলবার দরকার হলনা, রিচার্ড সব বুঝলে, দেখলে, আনা গর্ভবতী। রিচার্ডের মাথায় খুন চাপ্‌ল, ঘরের যে কোণে কুড়োল থাক্‌ত সে পাগলের মত ছুটে গেল; কিন্তু কুড়োল দিয়ে কার্লকে আঘাত করার আগেই অতি নিষ্ঠুর আঘাতে তার হৃদয় ভেঙ্গে গেল। আনা ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসে বল্লে—"আমি ওর, আমি এখন ওর, আমাকে মেরে ফেল রিচার্ড—এই ছিল নিয়তি—আমাকে মেরে ফেল—" বেদনার সঙ্গে রিচার্ড বল্লে—"তুমি এখন আমার নও? তুমি আমায় চাওনা? আর আমায় চাও না?" কান্নার সুরে আনা বল্লে—"না—না—আর পারি না—"

রিচার্ড চেয়ারে বসে পড়ল; তার চারিদিকে অন্ধকার। সে যেন একটু আলোর জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করছে, চেয়ার থেকে উঠে সে বল্লে, "পার না? কেন পার না আনা? কেন? তুমি এখন—আমি কিছু বুঝতে পারছি না—" আবার সে চেয়ারে বসে পড়ল।

কার্লের কণ্ঠ—"এখন আমাদের চলে যাবার সময় হ'ল—চলে যেতে হবে—চলো—আনা—" তার এক হাতে একটি ছোট ব্যাগ, আর এক হাত আনার হাতে।

কার্ল ও আনা হাতধরাধরি ক'রে বাহির হ'ল, ঘর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠান পার হ'য়ে গেট ছাড়িয়ে সরু পথ দিয়ে চল্ল, তাদের দু'ধারে কালো বাড়ীর সারি। পাড়া ছাড়িয়ে সহরতলী পার হ'য়ে তারা সহরের প্রান্তে খোলা মাঠের পথে গিয়ে

পড়ল, তাদের পেছনে অন্ধকার সহর, সামনে মলিন চাঁদের আলোভরা তুষারঢাকা রাত্রি, দু'ধারে রহস্যঘন গাছের ছায়া, ওপরে তারাগুলি নিষ্প্রভ, শীতল।

কার্ল ও আনা দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে চল্ল। কোন কথা বল্লে না, কিছু ভাবলে না, জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় পথে প্রেমে মিলিত দুই যাত্রী, একমাত্র মৃত্যু তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে।

লেওনার্ড ফ্রাঙ্কের "কার্ল ও আনা" যখন পড়ি, গল্পটি আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে; গল্পের ঘটনা করুণতায় ভরা, লিখনভঙ্গীর সরলতায় বেদনা আরও সুতীব্র হ'য়ে ওঠে, গল্পবলার স্বচ্ছতায় দুঃখের রহস্যময় সৌন্দর্য্য অশ্রুসমুজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়।

আনার চরিত্র কি সুন্দর, করুণ! সে ত জানত তার স্বামী রিচার্ড যুদ্ধের আরম্ভেই মারা গেছে; কিন্তু সেই মৃত স্বামীর স্মৃতি তার কাছে পুণ্যময় ছিল। শ্রমজীবিপাড়ার অনেক সৈনিকদের স্ত্রীরা স্বামীর অবর্ত্তমানে অন্য পুরুষদের সঙ্গে বাস করছিল, কিন্তু আনা ছিল সত্যই সতী। তারপর এল কার্ল তার স্বামীর স্মৃতি বহন ক'রে, স্বামীর অধিকার দাবী ক'রে। কার্লকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না, তার কারণ, প্রতি নারীর মধ্যে যে চিরন্তনী মমতাময়ী রয়েছে তারি চরণে কার্ল তার প্রেমঅর্ঘ্য নিবেদন করলে। যখন আনার মনে স্বামীর স্মৃতি ম্লান হ'য়ে গেছে, কার্ল তার হৃদয়ের সম্রাট্, তখন এল আবার রিচার্ড! হায়! রিচার্ডকে সে তখন কেমন ক'রে গ্রহণ করবে, সে যে সত্যই কার্লকে ভালবাসে। এই দ্বন্দ্বে তার অন্তর মথিত হ'য়ে উঠল, তাই রিচার্ড যখন কুড়োল হাতে কার্লকে মারতে গেল, আনা এগিয়ে এসে বল্লে,—'আমায় মেরে ফেল'। সত্যই সে মরতে চেয়েছিল, জীবনে যেন তার আর সুখ নেই। কার্লকে সে সত্য ভালবাসে ব'লে সে কার্লের হাত ধরে জীবন-পথে বাহির হ'ল বটে, কিন্তু সে ত আনন্দের যাত্রা নয়, বেদনায় তার অন্তর মূক।

লিওনার্ড ফ্রাঙ্ক বিশেষভাবে শ্রমজীবি-জীবনের চিত্রকর। তিনি নিজে ছুতোরের ছেলে, কুলিমজুরদের সুখদুঃখের ইতিহাস পরম সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে লিখেছেন। তাঁর প্রথম বই The Robber Band (১৯১৪) পরিবার হ'তে পলাতক বালকদের নিয়ে এক ডাকাতের দলের গল্প—মজুর-পাড়া, মদের দোকান, হাঁস্পাতাল, বস্তি-জীবন মানবসভ্যতার অন্ধকার দিকের বাস্তব চিত্র। The Cause of the Crime (১৯১৫) উপন্যাসে ফ্রাঙ্কের লেখার রীতির পরিবর্ত্তন হ'ল, তিনি ধীরে এক্সপ্রেসনিজমের দিকে অগ্রসর হ'লেন,—কদর্য্য নগ্ন বাস্তবের নিখুঁত চিত্র আঁকা নয়, অন্তরের বেদনাকে ভাষা দেওয়াই শিল্পীর কাজ। A Middle Class Man (১৯২৪) উপন্যাসখানিতে ফ্রাঙ্কের এক্সপ্রেসনিষ্ট রচনা-রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। গল্পের নায়ক Jurgen যৌবনে শ্রমজীবিদের অধিকার লাভের সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করবে ব'লে ঠিক করেছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে হ'ল কলের মালিক, লক্ষপতি, যার হওয়া উচিত ছিল সোসিয়ালিষ্ট সে হ'ল বুরজোয়া; কিন্তু তার আত্মা শান্তি পেলে না; প্রকৃতি তাকে যে শক্তি দিয়েছিল মানবসভ্যতার উন্নতির, কল্যাণের জন্য সাধনা করতে, সে-শক্তি সে ব্যবহার করলে স্বর্ণস্তূপ পুঞ্জীভূত করবার জন্য, প্রকৃতি প্রতিশোধ নিলে; জীবনে কোথাও

আনন্দ রইল না; গল্পের শেষভাগে বিকৃত-মস্তিষ্ক Jurgen-র অভিশপ্ত আত্মার অসহনীয় দুঃখভোগের চিত্রগুলি গ্রীক্ ট্রাজেডির মত অতুলনীয় শক্তিতে অঙ্কিত।

"কার্ল ও আনা" গল্পটিও দ্বন্দ্বময় কিন্তু এ সমস্যা জীবনের চিরন্তন সমস্যা। এই করুণ সুন্দর গল্পটি লেখকের অন্তরের গভীরতম দুঃখবোধের রহস্যগুহা হতে অশ্রুনদীর মত প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

Henri Fauconnier—Malaisie (Stock), André Malraux—La Voie Royal (Grasset), Maurice Bedel—Philippine (N. R. F), André Maurois—Le Peseur d'Ame (N. R. F.) Roger Martin du Gard—Confidence Africaine (Sans Pareil), Marc Chadourne—Cecile de la Folie (Plon), Georges Limbour—L' Illustre Cheval Blanc (N. R. F.), André Gide—Oedipe (La Pléiade).

এবারকার গঁকুর-পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, "মালেসি"-রচয়িতা আঁরি ফোকো-নিয়েকে। উপন্যাসখানা যখন "নুভেল রেভ্যু ফ্রাঁসেস"-পত্রে ধারাবাহিক ভাবে পড়েছিলুম, তখন খুবই ভালো লেগেছিলো বটে, কিন্তু মনে হয়নি সেখানার অদৃষ্টে এই সম্মান আছে। যুদ্ধের পর থেকে গঁকুর-পরিষদ এতই সাম্প্রতবিদ হ'য়ে উঠেছে যে, এই আড়ম্বরশূন্য, স্বল্পাঙ্গ, সংযত উপাখ্যানটি সে-সুধীসঙ্ঘের চিত্তাকর্ষণ করেছে শুনে প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিলুম। ভয় হয়েছিলো লেখাটা বুঝি ঠিক ক'রে মনে নেই; আলস্য ক'রে পড়েছিলুম ব'লেই হয়তো এই সদ্যোত্থিত প্রতিভার চাকচিক্য চোখে পড়েনি। তাই বইখানাকে আবার নেড়ে চেড়ে দেখলুম; কিন্তু এই নবীন লেখনীর মুখে অভ্যস্ত বিষটুকু কোনো মতেই খুঁজে পেলুম না; সূর্য্যের কলঙ্ক আবিষ্করণে এই তরুণ লেখকের চমৎকার নৈপুণ্য এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কোথাও থেকে আভাস দিলে না; এমন-কি হাল ফেশানের বিশ্বব্যাপী বিরতির সাড়া পাওয়া সুদ্ধ শক্ত হলো। শুধু তাঁর ছলাকলাহীন সরলতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অনুকম্পা, বর্ণনার বিনম্র অনুচ্চতা অবাক্ ক'রে দিলে। এর থেকে যদি কেউ ভাবেন যে, পুস্তকখানার পটভূমিকা সাবেকি আমলের স্থৈর্য্যে ধৈর্য্যে ভরা, তাহলে তিনি হতাশ হবেন। ফোকোনিয়ের মন অত্যন্ত নতুন, এতই নতুন যে, দশ বৎসর আগে পশ্চিমে তার নামগন্ধ ছিলো না। ইনি যে-যুগের লোক, সে-যুগে উত্তর-সামরিক ধ্বংসোন্মাদনার স্থান নেই; সে-যুগ প্রলয়ে পরাঙ্মুখ না-হলেও, বিনাশের চেয়ে সৃষ্টিকেই শ্রেয় ভাবে। কিন্তু সে জানে এই সৃজনব্যাপারে পারিপার্শ্বিক জগৎ তার সহায় হবে না। তার সমাজ, তার পরিবার, তার উত্তরাধিকার য়ুরোপীয় যুদ্ধের ঘূর্ণি হাওয়ায় গুঁড়ো হ'য়ে উড়ে গেছে; চার দিকে যে-ধ্বংসের ধূলি প'ড়ে আছে, তার উপরে কোনো রকমের ধ্রুবতার ভিত্তিস্থাপনা করতে যাওয়া বাতুলতা। তাই তার মন বেরিয়েছে ভদ্রাসন-নির্ম্মাণের জমি খুঁজতে। কিন্তু এমেরিকা, দক্ষিণসাগরের দ্বীপাবলী, চীন, শ্যামরাজ্য মালয়-উপদ্বীপ, আরব, আফ্রিকা, রুশদেশ, কোনোটাই তার মনঃপূত হচ্ছে না। অবশেষে হয়তো তাকে স্বদেশের সর্ব্বনাশের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই নিরুদ্দিষ্ট চক্রচরণ

একেবারে ব্যর্থ না-ও হতে পারে; অজানার অভিসারই হয়তো জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

একটা আখ্যায়িকার এই রকমের ব্যাখ্যাতে, জানি, অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু "মালেসি" উপন্যাস শুধু বাহ্যরূপে। মালয়ের আদিম বনের সাংঘাতিক সংঘাতে একজন শীঘ্রচেতন পাশ্চাত্য যাযাবরের মর্ম্মে মর্ম্মে যে-আশানিরাশার সুর বেজেছিলো, আসলে এটা হচ্ছে তারি প্রত্যক্ষ বিবরণ। কিন্তু তা ব'লে কেউ যেন না-ধ'রে নেন যে, "মালেসি" বিংশ-শতাব্দীর প্রথম বর্গের সমস্যামূলক গল্প-নাটকের বংশধর। একটা বিশেষ মনোভাব প্রকাশ করা এর মূখ্য উদ্দেশ্য হলেও, যে-পাত্রপাত্রীর মারফতে এই মনোভাবের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তারা, যদিও সংখ্যায় অতি অল্প, তবু জীবন্ত, অতিশয় জীবন্ত। তবে এদের জীবনের ওজন বাস্তব জীবনের মতোই হালকা, ঘটনাবলী নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীর মতোই অবিচিত্র। সারা বইখানায় একটিমাত্র অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হলো নায়ক রোলেঁর দেশীয় চাকর স্মাইলের ভূতে পাওয়ার কাহিনীটা,—এ-ঘটনাও ভারতীয় পাঠকের কাছে অত্যাশ্চর্য্য ঠেকবেনা। তবে জায়গাটা বিশেষ ক'রে দ্রষ্টব্য। অলৌকিকের বর্ণনা করা সহজ নয়; একটা অনুপযোগী শব্দের আওয়াজে, একটা অতিরঞ্জিত লাইনের ফলে একশ' পাতার অক্লান্ত চেষ্টা লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাওয়া সাহিত্যে খুব বিরল নয়। কিন্তু এই কঠোর পরীক্ষায় ফোকোনিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সম্ভবত তাঁর অকৃত্রিম লেখনীর গুণে। তাঁর অসাধারণ তুলীর টানে ব্যক্ত অব্যক্ত দুইই সমান পরিস্ফুট, গাছপালা-জন্তুজানোয়ারের পরম সত্তাটুকু নরনারীর পরমাত্মার চেয়ে কম স্পষ্ট নয়, বর্ব্বরতার ছবি সভ্যতার চিত্রের মতই সংযত ও সুবোধ্য। অল্প কথায় এই কাহিনীর ধারা বিরাট নদীর মতো মন্দ, মন্থর, কৌটিল্যহীন; তাতে নির্ঝরের আত্মজ্ঞ দীপ্তি বা কলকোলাহল নেই, আছে শুধু গভীরতা, অবাধ নিরপেক্ষ গভীরতা।

উপন্যাসটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রণয়-সম্বন্ধে চর্ব্বিত চর্ব্বণ নেই। পাত্রী দুটিরই ভূমিকা গৌণ, তারা কথা কয় যেন ভাববাচ্যে। প্রথমটিকে আনা হয়েছে কেবল দেশটার স্বকীয় রঙ ভালো ক'রে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়টির প্রয়োজনীয়তা হয়তো আর একটু বেশি, কিন্তু পুস্তকখানার শোকাবহ পরিণামের জন্যে অলক্ষ্য বনদেবতার দায়িত্ব তার চেয়ে অধিক কিনা, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া শক্ত। বইখানার সম্বন্ধে বস্তুত যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে সে হচ্ছে পদে পদে এই অলৌকিকের অবতারণা। কিন্তু মধ্যবৃত্তের দুর্দ্দান্ত অরণ্যে প্রবেশ করার সুযোগ যাঁর ঘটেছে, তিনিই মানবেন যে, লেখকের উপরে আধিভৌতিকের আধিপত্য অতিরিক্ত হলেও; অমার্জ্জনীয় নয়।

"মালেসি"-র নায়ক রোলেঁ মালয়-উপদ্বীপে বানপ্রস্থে গিয়েছিলো আধুনিক কুরুক্ষেত্রের শোকে; সভ্যতার লঙ্কাকাণ্ড তার বুকে নিষ্ঠুরভাবে বেজেছিলো ব'লেই, সে যবনিকা-পতনের আগে রঙ্গালয় ছেড়ে পালিয়েছিলো। কিন্তু "লা ভোওয়া রোইয়াল"-এর নায়ক পেরকাঁ অন্য ধাতুতে গঠিত। শ্যামরাজ্যের গহন বনে সে প্রবেশ করেছিলো গর্ব্বিতা সভ্যতাকে মারবার অস্ত্রসংগ্রহকল্পে। মালয়ে এসে রোলেঁ তপোবনের শান্তি খুঁজে পেলে, এবং অবশেষে যখন তার দারুণ দুর্দ্দিন এলো, তখন হয়তো সেই বনই তাকে মায়ের মতো নির্ব্বিঘ্ন অঙ্কে তুলে নিলে। কিন্তু পেরকাঁর

ধর্ষণে বন আহত পশুর মতো সংহার মূর্ত্তি ধ'রে, সিদ্ধির সমীপ লগ্নে তাকে গ্রাস ক'রে ফেল্লো। ফোকোনিয়ে আর মালরোর চিত্তবৃত্তির মধ্যে আকাশ-পাতালের তফাৎ; তবু সকল চরমপন্থীর মতো এঁদের দুজনের একটা ঐক্যও দেখা যায়। ফোকোনিয়ের সাধনা হচ্ছে বর্ব্বরতার সাহায্যে নির্বীর্য্য সভ্যতার শক্তিবৃদ্ধি করা; মালরোর চেষ্টা বর্ব্বরতার পৃষ্ঠপোষণে মুমূর্ষু সভ্যতাকে জগৎ থেকে অব্যাহতি দেওয়া। উভয়েরই যাত্রাস্থল এক,—জীবনকে স্বাস্থ্যবান ও সবল ক'রে তোলা; এবং দুজনেই স্থির করেছেন যে সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থা অসহ্য; বর্ব্বরতাই যে এ-রোগের একমাত্র প্রতিকার এ-সম্বন্ধেও দুজনের মতদ্বৈধ নেই। তবে এক পক্ষ বলেন, কানা মামার চেয়ে মামা না-থাকাই ভালো; অন্য পক্ষের বিশ্বাস, মাতুলের অন্ধতা স্বপ্নলব্ধ ঔষধের কল্যাণে সারলেও বা সারতে পারে। এ-দুদলের ঝগড়ায় মধ্যস্থ হওয়া শক্ত, কারণ কারোরি যুক্তির অভাব নেই। তবে আমার নিজের পক্ষপাত মালরোর দিকে। আজকে আমরা যেখানে পৌঁছেছি সেখানে জন্মই সহজ, মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন। কাজেই, বর্ষণের পরে ব্যাঙের ছাতার মতো, সৃষ্টির বীভৎস উর্ব্বরতা যখন নিরঙ্কুর মাটিকেও বাদ দিতে রাজি নয়, তখন স্বাতন্ত্র্যবিলাসী মাত্রেই ধ্বংশের কথা ভাবতে বাধ্য। বাঁচতে হলে এই অনাহূতদেরও স্থান চাই, ফাঁকা চাই, নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ চাই। আধুনিক জগতের সঙ্কীর্ণতা ক্রমশ অসহ্য হ'য়ে আসছে।

কিন্তু কথাসাহিত্যের দার্শনিক টীকা টিপ্পনী সব দিক দিয়েই অসঙ্গত। উপরন্তু মালরো নিজেকে নিছক ঔপন্যাসিক ব'লে সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। এই হিসেবে তাঁর বইখানা ফোকোনিয়ের বইটার মতো তৃপ্তিদায়ক নয়। "লা ভোওয়া রোইয়াল"-এর আখ্যানবস্তু "মালেসি"-র তুলনায় অনেক বেশী ঔৎসুক্যপূর্ণ; কিন্তু ঘটনাবৈচিত্র্যই এর দোষ দাঁড়িয়েছে। গল্পের ধারা যেন অনবচ্ছিন্ন নয়। গাঁথুনিতে যে-ফাঁক র'য়ে গেছে, পাঠকের কল্পনা তার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে উধাও হ'য়ে যায়। কথাপ্রসঙ্গে পেরকাঁর জীবনের অনেকখানি অবান্তর অংশ ফুটে উঠেছে, কিন্তু তবু আমাদের কৌতূহল মিটতে চায় না; মন শুধায়, তার অব্যক্ত বিদ্রোহের কারণ কি? হঠাৎ গারবোকে টেনে আনার সার্থকতাই বা কোথায়? এর পাশে রোলেঁকে বসালেই আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। রোলেঁর অতীত ইতিবৃত্ত আমরা জানি না বল্লেও চলে, তবু তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো জিজ্ঞাসাই অতৃপ্ত থাকে না। কিন্তু পেরকাঁর নাড়ি-নক্ষত্র জানার পরে রহস্য যেন জটিলতর হ'য়ে ওঠে। তবে এমন হতে পারে যে গ্রন্থকার ঠিক এই পিপাসাটুকুই পাঠকের মনে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। "লা ভোওয়া, রোইয়াল" একটা বহুখণ্ডব্যাপী আখ্যায়িকার প্রথম ভাগ; অন্য সর্গগুলি এখনো অপ্রকাশিত, সম্ভবত অলিখিত। কাজেই এখানার যথার্থ বিচার করার সময় এখনো না-এসে থাকতে পারে। এখানে যে-সূত্রগুলোয় গ্রন্থী পড়লো না, হয়তো অন্যত্র সেগুলো বিনুনি পাকিয়ে উঠবে। তবে পেরকাঁ-চরিত্র বোধহয় হেঁয়ালী হ'য়েই থেকে গেলো, কারণ "লা ভোওয়া রইয়ালে"-এর সমাপ্তি পেরকাঁর মৃত্যুতে।*

মুস্কিল এই যে মালরো নাম-করা লেখক; "লে কঁকের'।" বেরুনোর পরে তাঁর কাছ থেকে আমরা এত প্রত্যাশা করি যে, পান থেকে চুন খসলেই মনে হয় ঠকছি। আসলে তাঁর অসামান্য শক্তির হ্রাস হয়নি; ক্লোদের পিতামহের চিত্র "লে

কঁকের‍ঁা"-র কোনো চরিত্রের কাছেই হার মানেনি, এবং ক্লেদের মা যে-অল্প কটি কথায় বর্ণিত হয়েছে, তার জোড়া খুঁজে বার করা দুষ্কর। পেরকাঁও রহস্যময় মাত্র, কিন্তু কলের পুতুল নয়; অখ্যাত জনপদে চিকিৎসাবিহনে মৃত্যুমুখ পেরকার রমনী-সম্ভোগের ছবিতে যে-প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পাই, তার কণামাত্র থাকলে অনেক উপন্যাসই দাঁড়িয়ে যেতো। এই স্থানটা পড়বার পরে, পেরকাঁর মহত্ত্ব-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না; মনে হয় আমরা বুঝি কোনো অসুরের অনন্ত প্রয়াণের সাক্ষী। এই দৃশ্যটা ছাড়া "লা ভোওয়া রোইয়াল"-এর অন্য কোথাও নারীর সংস্পর্শ নেই, যদিও তাদের নাম এখানে ওখানে, নানা জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। "মালেসি"'র সঙ্গে "লা ভোওয়া রোইয়াল"-এর এইখানে আর একটি সাদৃশ্য; আরো একটি হচ্ছে পাত্র-পাত্রীর স্বল্পতায়; এই গুণে মালরো ফোকোনিয়ের উপরেও টেক্কা দিয়েছেন; এক রকম বলতে গেলে পেরকাঁ আর ক্লোদ এই দুটি মাত্র চরিত্র নিয়েই সমস্ত বইখানা বিরচিত।

উপরে বলেছি যে মালরো সম্প্রতি নিজেকে নিখাদ ঔপন্যাসিক ব'লে জাহির করেছেন। এই আত্মপরিচয় বেরিয়েছে এপ্রিল মাসের "নুভেল রেভু ফ্রঁসেস"-পত্রে, ট্রট্স্কির লেখা "লে কঁকের‍ঁা"-র সমালোচনার জবাবে। উক্ত সমালোচনায় ওই বইখানির গুণকীর্ত্তন করার পরে ট্রট্স্কি দেখিয়েছেন, ইতিহাস-হিসেবে "লে কঁকের‍ঁা" কেন অশ্রদ্ধেয়। প্রবন্ধটা অবশ্য-পাঠ্য; তাতে ট্রট্স্কির বিখ্যাত ঝগড়াটে স্বভাব, বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত করার অভ্যাস, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা দোষ থাকা সত্ত্বেও, মোটের উপরে লেখাটা খুবই সারগর্ভ। তাঁর মূল কথাটার সমর্থন না-করে থাকা দুঃসাধ্য। তিনি বলেছেন, বিপ্লব নিয়ে খেলা চলেনা; যে-বিদ্রোহ সময়গতিকে আপনার আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা করেনা, তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। মালরো এর বেশ চোখা চোখা জবাব দিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে হয় পাঠকের দরদ ট্রট্স্কির দিকেই ঝুঁকবে। তবে একটা কথা ভুললে চলবেনা; স্থান-কাল-পাত্রের ষড়যন্ত্রে স্বয়ং লেনিন সুদ্ধ সমষ্টিবাদের মূলসূত্রকে অন্তত আংশিক ভাবে উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ বই দুখানার সঙ্গে "ফিলিপিন"-এর মতো মামুলি উপন্যাসের নাম নিতে সঙ্কোচ লাগছে। তবুও উল্লেখ করছি দুটো কারণে। প্রথমত, এই তিনখানা ছাড়া আর কোনো আধুনিক ফরাসী উপন্যাস সম্প্রতি পড়িনি; দ্বিতীয়ত "ফিলিপিন"-এর জ্যেষ্ঠ "জেরোম, উ সোওয়াসাঁৎ দেগ্রে লাতিতুদ নর" বছর চারেক আগে "মালেসি"-র মতোই সম্মানিত হয়েছিলো। মনে আছে সেবারকার গকুঁর-পারিতোষিকের উপযাচকদলে যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটেনি। কিন্তু "লেসম্ দ লা রুৎ"-এর রচয়িতা অঁদ্রে শাঁস, "ভাস্কো"-লেখক মার্ক্ শাদ্রণ, "মেরলাঁ"-প্রণেতা জাঁ প্রেভো ইত্যাদিকে ডিঙিয়ে মোরিস্ বেদেল্ যখন "জেরোম"-এর জোরে পুরস্কৃত হলেন, তখন দু-এক জন সমালোচক অল্পবিস্তর বিস্ময় প্রকাশ করলেও, হাততালিতে কম পড়েনি। সে-বছরের অন্যান্য উপন্যাসের সমকক্ষ না-হলেও "জেরোম" বইখানা সুখপাঠ্য, অত্যন্ত আধুনিক এবং শ্লেষোক্তির সন্নিপাতে সজারুর মতো কণ্টকিত। সে-গল্পের নায়কও উদ্বাস্তু, তারও সন্ধান বাসাবাঁধার উপযুক্ত শাখা। সেই অন্বেষণের তাড়নায় বেদেল্ সেবারে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার অর্দ্ধসভ্য তরুণীদের উপভোগ্য স্বেচ্ছাচারের দাপটে বেচারা জেরোম স্বদেশের সুকোমল অঙ্কে আশ্রয় নিতে ইতস্তত করেনি। জেরোমের অনুজা ফিলিপিনেরও সেই দশা,

তবে এবারে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে, ফিলিপিনের পটভূমিকা মুসোলিনির পদানত রোম। কিন্তু আর সমস্তই যথাপূর্ব্বম্: নির্ব্বুদ্ধিতায় লাটিনেরাও নর্ডিক্দের সমতুল্য; ইতালীর বুড়োরা মেরুপ্রান্তের বুড়িদের মতোই বাক্সর্ব্বস্ব; এখানকার প্রেমার্ত্ত যুবকেরা, সেখানকার প্রেমার্ত্ত যুবতীদের চেয়ে কম কামপরায়ণ নয়। অল্প কথায় ফরাসীরা সভ্যতায় অদ্বিতীয়, সাধুতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, হৃদয়ব্যাপারে, একদিকে বর্ব্বর পাশবিকতা এবং অন্যদিকে প্রস্তরিত পবিত্রতা, এই উভয়-সঙ্কটের মাঝখান দিয়ে অক্লিষ্ট নৌচালনায় য়ুলিসিকেও হার মানিয়ে দেয়। বইখানার প্রত্যেক শব্দটি আত্মপ্রসাদের চর্ব্বিতে মসৃণ, প্রত্যেক পঙক্তিটি বুদ্ধিবিদ্যায় চকচকে, প্রত্যেক পরিচ্ছেদটি শ্লীলতা-শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা। এখানাকে দশ বছর আগে পড়লে হয়তো উপাদেয় লাগতো, আজ কেবল হাই ওঠে। প্রথমটা মনে হয়েছিলো এর ঠাট্টা মস্কারা স্বর্গীয় জেরোম, কে, জেরোমের রসিক মস্তিষ্কে আসন পাবার যোগ্য, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে অতটা বলা অন্যায় হবে; ফিলিপিন আপনার অগ্রজ জেরোমের কালহাস্যের প্রতিধ্বনি মাত্র, তাই সে নিষ্প্রাণ। হতে পারে একটু বাড়াবাড়ি করছি, সমালোচকদের প্রশংসা দেখেই বইখানা পড়তে বসেছিলুম, কিন্তু বেদেলের শেষ-উপন্যাস "মলিনফ, এঁদ্র্ এ লোওয়ার"-এর প্রাণময় নবীনতায় গত বৎসর আমার রোগশয্যার বিরক্তি এমনই লাঘব হয়েছিলো যে, আজকে ফিলিপিনের রোমন্থনে বঞ্চনাবোধ জেগে ওঠা অনিবার্য্য।

মার্ক্ শাদ্রণ-এর "সিসিল্ দ লা ফোলি" বইখানা পড়ার অবকাশ এখনো ক'রে উঠতে পারিনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না। উপন্যাসটির প্রশংসা সর্ব্বত্রই দেখতে পাই, উপরন্তু যে হাত দিয়ে "ভাস্কো" বেরিয়েছে, সে হাতের লেখা নগণ্য হওয়া অসম্ভব।

অঁদ্রে মেরোওয়ার "ল পেসর দাম" পুস্তকখানি আকারে উপন্যাসের সমান হলেও, তাকে কথাসাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করাই বোধ হয় সঙ্গত। সে যাই হোক, এখানা পড়ার পরে মোরোওয়ার শতমুখী প্রতিভাকে অভিবাদন না-ক'রে থাকা যায় না। এই মেরোওয়া আর "এরিএল" ও "ডিসরেলি"-র স্রষ্টা যে একই লোক, তা বিশ্বাস করা কঠিন। এমন কি ভাষা এবং রচনারীতি সুদ্ধু আলাদা। গল্পটি পো-হউসমাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে রোমহর্ষণে মোরোওয়ার কলম ওই দুটি লেখনীর অনেক নীচে। তা হলেও কাহিনীটা অপ্রত্যাশিত এবং উপসংহারটি চমকপ্রদ। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও এর থেকে পরিচয় পাওয়া যায় শুধু মোরোওয়া-সাহেবের লিপিচাতুর্য্যের, তাঁর মনপ্রাণের ঠিকানা মিলে না।

এর পাশে রোজে মারতাঁ দু গার-এর "কঁফিদাঁস্ আফ্রিকেন্" গল্পটা বসালেই সাহিত্যে অকৃত্রিমতা কাকে বলে তার যথার্থ খবর পাওয়া যাবে। তবে রুচিবাগীশদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি, এই অগম্যাগামী প্রেমকাহিনীটি নীতিপরায়ণ নয়। এমন জীবন্ত লেখা খুব কমই পড়েছি; পড়ছি ব'লেই মনে হয় না, বোধ হয় ছবি দেখ্ছি। রচনা পাকা হাতের, প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক বাক্য ওজন ক'রে বসানো, তার একটির নড়চড় হলে গল্পটির স্বরূপ বদলে যাবে ব'লে ভয় হয়। অথচ কোথাও অতিরঞ্জনের লেশ মাত্র নেই, এই অসামান্য ছবির একটি রেখাও অবান্তর নয়।

কাব্যজগতে জর্জ্ ল্যাঁবুরের "লিন্যুসত্র শভাল্ ব্লাঁ" উল্লেখযোগ্য। এই বইখানাকে কাব্য বলছি, সমালোচকদের খাতিরে। তাঁরা যদি চোখে আঙুল দিয়ে

কাহিনী-তিনটের প্রচ্ছন্ন কাব্যাগ্নিটুকু দেখিয়ে না-দিতেন, তাহলে বইখানাকে কথা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতুম। এখনো, তাঁদের অনুদেশ সত্ত্বেও, নিঃসন্দেহ হতে পারিনি ; তবে এটা মানছি, রচনাগুলি গদ্যপদ্যের সীমাসন্ধিতে অবস্থিত,—কোনোটার ঝোঁক গদ্যের দিকে বেশি, কোনোটার বা পদ্যের দিকে। এটাও স্বীকার্য্য যে, এগুলো যদি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হতো, তাহলে আলঙ্কারিক বইখানাকে কাব্য আখ্যাই দিতেন। কিন্তু তখন কাব্য বললে বোঝাতো, রসাত্মক লেখা মাত্র, সে-নামের সঙ্গে রচনা-পদ্ধতির বিশেষ কোনো সংস্রব ছিলোনা। আজ আমরা যে-ক্ষুধার তাড়নায় কাব্যের দ্বারস্থ হই, সেটা কেবল পেটের ক্ষুধা নয়, চোখেরও। অর্থাৎ আজকে আমরা শুধু রসেই তৃপ্ত থাকতে পারিনা, রূপকেও চেয়ে বসি। এর থেকে কেউ যেন না-ভাবেন যে আমার মতে গদ্য রূপহীন। তা মোটেই নয়, তবে আমার মনে হয় কাব্যের রূপ আর গদ্যের রূপ ভিন্ন প্রকৃতির, এবং এই বিভিন্নতা সংরক্ষিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করা উচিত, আমাদের সাহিত্য স্বল্পাঙ্গ ব'লেই হয়তো আমি এই বহুলাঙ্গতার পক্ষপাতী ; যেদেশে বাহুল্য আজ জটিলতায় গিয়ে ঠেকেছে, সেখানে কাব্যের মৌল সত্তার পুনরন্বেষণই স্বাভাবিক। দিন কতক আগে ফরাসী বিদগ্ধেরা আবে ব্রেম'র প্রতিধ্বনি করে বলতে সুরু করেছিলেন, কবিতার মানে না থাকলেও চলে, কিন্তু তার অন্ধিসন্ধিতে ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিবিজ্ঞান, মনোবিকলন, মন্ত্রসিদ্ধি, ধর্ম্মপ্রাণতা ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্লভ বিশেষজ্ঞানের চমক থাকা চাই। লঁ্যবুরের আকস্মিক প্রতিপত্তি হয়তো সেই হঠোক্তির পাল্‌টা জবাব।

"লিল্যসত্র শভাল্ ব্লঁা"-র সঙ্গে আমার ঝগড়া শুধু পরিভাষা নিয়ে। গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, এই নবীন লেখনীর মুখে প্রতিভার ইসারা আছে। লঁ্যবুরের জাদুতে পশুপক্ষী মানুষের চেয়ে বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে, জলস্থলের কানাকানি শ্রুতিগম্য হয়ে আসে, শূন্য যেন মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দেয়। এই কাহিনীগুলোর মুখ্য ভূমিকায় মানুষ নেই, নায়কের স্থান অধিকার ক'রে রেখেছে দুটি ঘোড়া আর একটি পাখী। কিন্তু এই জন্তুগুলির সৃষ্টিব্যাপারে অতিমর্ত্ত্যের হাত খুবই স্পষ্ট। প্রথম গল্পের প্রধান পাত্র একটি বুড়ো ঘোড়া ; তাঁর সারা জীবনটা কেটেছিলো এক খনির অন্ধকারে, কিন্তু একটি সারকাসদলের কল্যাণে ছাড়া পেয়ে সে যখন নিশুতি লণ্ডনের পথ দিয়ে সগর্ব্বে পা ফেলে চলে, তখন মনে হয় স্বয়ং উচ্চৈঃশ্রবা বুঝি অধরার আকৃতি প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার পরের গল্পটির কেন্দ্রেও দেখি একটি ঘোড়াকে। এটির জীবন আরো রহস্যময়। অশ্ববর্জ্জিত ভেনিসের ঘাটে সে একদিন কোন অজানার পার থেকে এসেছিলো, এবং এই পঙ্কিল সহরের বীভৎস আলোড়ন যেদিনে দুঃসহ হয়ে উঠলো, সেদিন তার মানবী প্রেয়সীকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলো, কেউ তার ঠিকানা পেলেনা ; কিন্তু সকলেই বুঝলে এই প্রাচীন নগরীর সমস্ত সৌন্দর্য্য, তারি অনুসরণ করেছে। শেষের কথাটির নায়ক একটি অলৌকিক পাখী। কোনো ব্রাত্যের ঔরসে সে জন্মেছিলো এক জাদুকরীর গর্ভে। বহুদিন পরে তার জন্মদাতা যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে এক অনাম মরুর মাঝে ফাঁসিকাঠে ঝুলছে, তখন সে এসেতার পিতাকে রক্ষা করলে। তার পর সে মৃত্যু বরণ করলে এবং তারই চিতায়জীবনের অবশিষ্ট মহত্ত্বটুকু সহমরণে গেলো।

গল্প জিনিষটাকে সংক্ষেপ করা বিপজ্জনক ; উপরোক্ত বর্ণনা প'ড়ে মনে হতে পারে বইখানা আষাঢ়ে গল্পে ভরা। কিন্তু আসলে লেখকের বাস্তবিকতা অবাক্ ক'রে দেয়। অদ্ভুত অতিকথনের মাঝে মাঝে এমন এক-একটা নিষ্ঠুর স্পষ্টোক্তি আছে যার সংঘাতে দম বন্ধ হয়ে আসে। ফরাসী মনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে এই জাতি বারে বারে জন্তুজগতের অন্তরতম লোকে প্রবেশ করতে পেরেছে। কিন্তু লঁ্যবুরের লেখা পড়ে লা ফঁতেনকে মনে পড়েনা, এমন কি দমেসঁকেও মনে পড়ে না, স্মরণে আসে ডি, এইচ, লরেন্সের নাম। এই উচিত ক্রোধের উদ্দীপনা এই অহেতুক বিপ্লবের উচ্চণ্ডতা কেবল "সেন্ট মর"-এর মধ্যেই দেখেছি। আবার মরুভূমির বর্ণনায় মিলটনের ছায়া আছে ; এই বিরাট্ শূন্যের পরিকল্পনা, এই দুর্ব্বোধ্য বিদ্রোহের ব্যর্থতা, মনে হয় শুধু তাঁরি শিষ্যের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু নাটিকাগুলোর দৃশ্যপট এঁকেছে ওব্রে বিয়ার্ডস্‌লির প্রেতাত্মা, এই ধরণের অবক্ররপ্রীতি এক তারি ছবিতে দেখা গেছে। লঁ্যবুরকে একবার অনুবাদকরূপে দেখেছিলুম, অনূদিত কবিতাগুলির মূল ইংরেজি ভাষায় রচিত। এ-প্রমাণ যদি না-ও থাকতো, তবুও বুঝতুম ইংরেজী পরিশীলনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

নাটকের মধ্যে জীদের "ঈদিপ্" অবশ্য-পাঠ্য। কয়েক বছর থেকে অতীতকে বর্ত্তমানে টেনে আনার যে-হাওয়া উঠেছে, এই নাটকখানি হয়তো তারি পরিসমাপ্তি। কিন্তু অভ্যস্ত হ্যামলেটকে গল্‌ফ্ ক্লাব হাতে নিয়ে আসরে নামতে দেখে আমাদের যে-কৌতূহল মেটে, এই নাটকখানি পড়ে চরিতার্থ হয় ঠিক তার বিপরীত মনোভাবটি। প্রথম চেষ্টাটি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দূরকে নিকটে আনার চেষ্টা, তার মূল কথা ব্যবধান-বিনাশ ; কিন্তু জীদের পুস্তকখানি দূরবীনের উল্টো দিক্ দিয়ে প্রতিবেশকে দেখার মতো, আত্মীয়কে পর ক'রে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য, তার প্রয়াস ব্যবধান-সৃষ্টি। হ্যামলেট যেই কথা কইতে সুরু করে অমনি ভুলে যাই, তার পরনে কোন্ যুগের ছদ্মবেশ, কিন্তু এই নাটকখানির প্রথমাঙ্কের প্রথম কথা থেকে যবনিকা পতন পর্য্যন্ত আমরা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারিনা যে, বিগ্রহের প্রাবরণ যে-যুগেরই হোক, তার প্রাণ একেবারে সদ্যস্তন। প্রশ্ন উঠতে পারে জীদের ঈডিপাস আর সফোক্লিসের ঈডিপাস যদি অভেদাত্মাই নয়, তবে নামকরণের সার্থকতা কোথায়? আমার বিশ্বাস এর মূলে আছে তাঁর স্পর্দ্ধা, সফোক্লিসের প্রেতাত্মাকে ডাক দিয়ে, তিনি হয়তো এই কথাই বলতে চেয়েছেন,—মিলিয়ে দেখো, তোমার মতো মহানাটক লেখা আমার ক্ষমতায় কুলোয় কিনা। তবে জীদের মতো মনস্বী আর্টিষ্টের পক্ষে কেবল দম্ভের খাতিরে কোনো কিছু করা অসম্ভব। হয়তো বাঞ্ছিত অবচ্ছিন্নতার সন্ধানই তাঁকে এই প্রাক্‌পৌরাণিক জগতে টেনে এনেছে, হয়তো বর্ত্তমানের বিরাট্ ব্যাকুলতার ছবি-খানাকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রতীপগমন অনিবার্য্য। তবে এই ধরণের পিছু-হটার প্রবৃত্তি প্রায়ই জন্মায় ভয়ের থেকে। সৌভাগ্যক্রমে জীদের অসীম সাহসের নতুন প্রমাণ অনাবশ্যক ; তাই বলতে হয়, এই অপসরণের মূলে আতঙ্ক নেই, আছে হয়তো অক্ষমতা। আমাদের খেয়ালী জগতে ঈডিপাসের ধ্রুপদী সমস্যার উত্তর খুঁজে পেতে হলে যে-পরম প্রজ্ঞার দরকার, তা হয়তো জীদেরও নেই। এ-যুগের ট্র্যাজিডি দেবতার কোপে ঘটেনা, ঘটে শুধু জ্ঞানের অভাবে ; এমন-কি এখনকার শোকাবহ পরিণতির মধ্যে ট্র্যাজিডির মহত্ত্বটুকুও নেই, আছে কেবল দরদের উপলক্ষ

অশুচি সম্পর্কসঙ্কর অসহ্য ব'লে আমাদের ঈডিপাস কৃষ্টদেবের উদ্দেশে চক্ষুবলি দেয়না, সে চোখ উপড়ে ফেলে আত্মধিক্কারের তাড়নে, সে চোখ উপড়ে ফেলে, ভূত-ভবিষ্যতের অনন্ত অন্ধকারে তার অহংকৃত দৃষ্টি নিতান্ত নিষ্ফল, তাই। গ্রীক্ ঈডিপাস আর ফরাসী ঈডিপাসের মধ্যে তফাৎ এইখানে; একজনের জীবন দৈবপ্রাবর্তিন, অপরের জীবন অবিদ্যার অধীনে; একজন আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে দেবতার আশীর্ব্বাদ পায়, অপরে সর্ব্বস্ব হারিয়ে শুধু বোঝে যে, তার ঋদ্ধি, তার সিদ্ধি, সে-সমস্তই বিধিবদ্ধ।

জানিনা, ঠিক এই কথাই জীদ বলতে চেয়েছেন কিনা। হয়তো বইখানা লেখার সময় হিতোপদেশের নামমাত্র তাঁর মনে ছিলোনা; যে-যুগের অনুপ্রাণনায় তিনি লেখা সুরু করেন, তার মূল মন্ত্র ছিলো; art for arts' sake। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকুক আর নাই থাকুক, বইখানার ফাঁকে ফাঁকে যে-দুর্ব্বহ আত্মজ্ঞানের, যে-অসহ্য নৈরাশ্যের, যে-দারুণ বেদনার ইসারা দেখেছি, উপরোক্ত উচ্ছ্বাস সেই সংরক্ত আঘাতের প্রথম প্রতিক্রিয়া। নাটকখানা-সম্বন্ধে আরো অনেক দোষগুণের কথা বলবার রইলো, কিন্তু বাচালতার ভয়ে এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানছি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

Sunflower and Elm—By Gertude Woodthorpe,
60 pages, Sidgewick and Jackson Ltd.
Poems (1926—1930)—By Robert Graves.
90 pages, William Heinemann Ltd.
Vale and other Poems—By A. E. 56 pages,
Macmillan & Co., Ltd.

মিস্ গারট্রুড্ উড্থর্প ইংরাজী কাব্য-সংসারে নূতন আগন্তুক, এতই নূতন যে, তাঁহাকে পরিচিত করাইবার ভার লইয়াছেন ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার। মিস্ উড্থর্প-এর The Child's World—নামক কবিতাটী পড়িলেই বোঝা যায়, কেন ডি লা মেয়ার পরিচয়ের ভার লইতে অস্বীকার করেন নাই। কারণ, কবিতাটী শুধু সুন্দর নয়, ইহাতে এই দুই কবির প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব সুস্পষ্ট। তাই বলিয়া মিস্ উড্থর্প-এর কবিতাকে ডি লা মেয়ার-এর কবিতার প্রতিচ্ছায়া বলিয়া ধরিলে অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। তিনি আগন্তুক হইলেও অতিথি নন্, তাঁহার বিশিষ্ট কবি-প্রতিভাই তাঁহাকে কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। পরিচিতিতে স্বয়ং দু'চারিটি কথায় ডি লা মেয়ার বলিয়া দিয়াছেন, কোন্ বিশেষ পাদপীঠ হইতে এই কবিতাগুলিকে দেখা উচিত। ইহাদের মধ্যে চমকপ্রদ এমন কিছুই নাই—ভাষায়, ভাবে বা ছন্দে—যা' সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এদিক্ হইতে দেখিলে কবিতাগুলিকে 'শক্ত' কবিতা বলা যায়; এমন একটি কবিতাও নাই যাহার রস একবার চোখ বুলাইয়া গেলেই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায়। কবিত্ব জাহির করিবার, ভাবের অভাবে কারদানি দিয়া ফাঁক ভরিয়া দিবার প্রয়াস কোথাও চোখে পড়ে না। বর্ত্তমান চিত্ত-বিক্ষোভের দিনে এই নীরব অনাড়ম্বর প্রশান্তির মূল্য উপলব্ধি

করা কঠিন। কিন্তু যাঁহারা নিছক কাব্য রসে তৃপ্তি পান, তাঁহারা মনোযোগ দিয়া পড়িলে যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবেন, আশা করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

AUSPICES.

This early evening birds fly far and low,
Out of the West round to the South they go.

And all the West is a clear sea of gold,
Where the gold Sun declines.

And still behold!
Wheeling athwart the Sky, one after one,
The birds emerge from regions of the Sun.

As though on some great errand they were sped
Over the curve of earth, where shadows spread
To night. Winged and celestial they go
Into the twilight; far and swift and low.

NOVEMBER.

The yellow chestnut fans are rarer, rare
As dreams that stay.
They fall, they float down through the quiet air,
Naught they say.
The sleepy tree can scarce be well aware
They go away.

Over a milky sky thin tracery
The chestnut weaves.
The low, late sun illumines pensively
A world it leaves,
All tranquil, half in Heaven already, free,
Nothing grieves.

For this calm voyage than stillness doth no less
Satisfy.
Falling, falling down through peacefulness
To die.
Whilst Earth the thoughtful autumn sun doth bless,
And sky.

মিস্ উড্থর্প-এর পর রবার্ট গ্রেভ্স্ পড়িতে বসিলে মনে হয় যেন শান্ত স্রোতস্বিনী বাহিয়া আমরা অকূল সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে পরিচিত কোন কিছুই নাই, ভাব, ভাষা, ছন্দ সবই অপরিচয়ের বিস্ময় জাগাইয়া তোলে। রবার্ট গ্রেভ্স্ তরুণ কবি হইলেও সুপরিচিত। তাঁহার আত্মজীবনচরিত—Good-bye to All That, যাহার উত্তরে পিতা লিখিলেন A Return to All That এবং পুত্র পুনরায় লিখিলেন, Still It Goes On—এবং তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তিকা Lars Porsena, তাঁহাকে গল্প লেখক হিসাবেও যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি কবিতা

অনেক কাব্য-চয়নিকায় স্থান পাইয়াছে, দু'-একটির বাংলা অনুবাদও হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে। এই কবিটির মন অত্যন্ত সজাগ—ছেলেমানুষি ছড়া হইতে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-নরক, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সব কিছুতেই ইনি আকৃষ্ট হন। সেইজন্যই ইঁহার লেখার মধ্যে গঠনের অভাব, অপরিচ্ছন্ন এলোমেলো ভাব দেখা যায়। তাঁহার আগেকার কবিতাগুলি পড়িয়া একজন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছিলেন—

"To read Robert Graves' poetry is to feel that one is assisting him to wrestle with Chaos. Chaos may in the end be too strong for him, yet every poem he writes will be well worth reading, since he creates confidence that he has the potential power to organise, out of his very interesting Chaos, a Universe of corresponding interest."

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, গ্রেভ্‌স্ এই "Confidence" বজায় রাখিতে পারেন নাই—তিনি বিশ্বাস-ভঙ্গ করিয়াছেন। Chaos তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, তাঁহার নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার কোনরূপ অর্থ সংগ্রহ করা সুকঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। কবির উচ্ছৃঙ্খলতা যে কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচের কবিতাটীতে পাওয়া যাইবে।

ANAGRAMMAGIC

Anagrammatising
TRANSUBSTANTIATION,
Shyly deputising
For old Copopulation
SIN SAT ON A TIN TAR TUB.
And did with joy his elbows rub.

Art introseduced him
To females dull and bad,
Flapper flappings, limb—slim,
From his blonde writing-pad,
The river-girlgling drained of blood—
Post-Card flower of kodak mud.

By such anagrammatic
And mansturbantiation
They father then his tragic
Lustalgia on the nation,
And after that, after that,
ON A TIN SIN TUB ART SAT.

বুঝিলাম ইহা খেলাচ্ছলে লিখিত—Transubstantiation কথাটাকে লইয়া ভাঙাচোরা খেলা—তবুও বিশ্বাস করা যায় না ইহা কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক কবি লিখিতে পারেন। অবশ্য এ-পুস্তকের সকল কবিতাই এ-শ্রেণীর নহে। ইচ্ছা করিলে তিনি যে ভাল লিখিতে পারেন, তাহার প্রমাণ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাঁহার অন্তরের 'প্রেম'-কে সম্বোধন করিয়া তিনি কয়েকটী সুন্দর লাইন লিখিয়াছেন—

Take your delight in momentariness,
Walk between dark and dark, a shining space
With the grave's narrowness, though not its peace.

কিন্তু Dismissal কবিতাটির অমন সুন্দর আরম্ভের পর কেন যে অমন অদ্ভুত শেষ হইল, বোঝা যায় না। আবার কয়েকটী কবিতায় তিনি স্বকীয় বিশেষত্ব বর্জ্জন করিয়া টী, এস্, এলিয়ট্-এর অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। উদাহরণতঃ, Lift Boy-এর নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার "ভাই"-সম্বন্ধে কবিতাটি ভাবে-ভঙ্গীতে খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়।

BROTHER

It is odd enough to be alive with others,
But odder yet to have sisters and brothers,
To make one with a characteristic litter—
The sisters doubtful and vexed, the brothers vexed and bitter
That this one wears, through praise and through abuse
His family nose for individual use.

এ,ই-র পরিচয় আমাদের দেশে নতুন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শুধু কবি বলিয়া নহে, আয়র্ল্যণ্ডের জাতীয়তা-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত বলিয়া, ও সমবায়-তন্ত্রের প্রধান পুরোধা বলিয়া তিনি বহুপূর্ব্বেই আমাদের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শোনা যায়, তিনি নাকি যোগসাধনাও করেন। তাঁহার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি তাঁহার Candle of Vision-নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতাও প্রধানতঃ এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সাহিত্যিক প্রকাশ। সেইজন্য পাঠক-সাধারণের নিকট তাঁহার কবিতা আদৃত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি চিরদিনই গুণী পাঠকের প্রিয় কবি হইয়া থাকিবেন। একথা সত্য, তিনি যে-জগতে বাস করেন, তাহার সহিত আমাদের সজ্ঞান পরিচয় নাই বলিলেই হয়, কিন্তু তাঁহার মার্জ্জিত ভাষার এমন গ্রাহকরী শক্তি আছে যে, সেই জগতের ব্যঞ্জনা স্ফুট করিয়া তুলিতে পারে। তিনি বলিতেছেন—

"For if our dreams
Be not immortal, the soul is not. The soul
Is but a congregation of high dreams.

FORGOTTEN.

The hills have vanished in dark air;
And night, without an eye, is blind,
I too am starless. Time has blurred
The aeons of my life behind.

Oh, what in those dark aeons lay?
What tumult, beauty and desire?
I know not, all are lost beyond
Sunsets of anguish and of fire.

এই ছোট কবিতাটিতে আমাদের মনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন দুর্জ্জ্যের বেদনাটীকে কবি একান্ত সুপ্রচলিত ছন্দের বাঁধনে বাঁধিয়া কী অপূর্ব্বভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন।

দেহের আকর্ষণ, পৃথিবীর আকর্ষণ যে কী দুর্নিবার, তিনি তাহা ভাল করিয়াই জানেন। তাঁহার Earth-Bound কবিতার শেষ স্তবকটী এই,—

When body lay in stillness
The soul could not recall
The airy solemn being
It had before its fall.
It was tangled in old folly,
The earth had it in thrall.

কিন্তু মুক্তিকামী ইহাতে ভরসা হারান নাই। তাই Fugitive কবিতায় তিনি মুক্তি-পথের সন্ধান দিতেছেন।

Did it seem shuttlecock,
That soul, now here, now there,
That seemed to have no goal
In intellectual air?

To be itself, to elude
The Dark, the Light, that hold
By bitter or sweet rule
Mankind from of old;

That was its dream. It found
In its own deeps a star,
And steered by that new pole,
No crazy mariner.

It passed those famous ports
To which all sails were set;
Passed heaven's gay towers, passed hell's
Last stormy parapet.

Some wisdom in it guessed
They were not foes, these twain;
By what was pride for one
The other still had gain.

মুক্তির সন্ধান মেলে অন্তরের অনির্ব্বাণ আলোকের দীপ্তিতে, স্বর্গমর্ত্ত্য উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারায়, একের বাহু-বন্ধনে ধরা না দিয়া বহুর অভিমুখে হৃদয়ের আলিঙ্গন প্রসারিত করিয়া দিতে পারায়। তাই Sybil কবিতায় কবি বলিতেছেন—

A myriad loves
Her heart would confess,
That thought but one
To be wantonness.

এই বহু-পরিচর্য্যার ফলে

So thronged was her spirit
It seemed a pack
That carried the moon
And stars on her back

When the spirit wakens
It will not have less
Than the whole of life
For its tenderness

And that was why
She could not stay,
From the gilded fireside
Running away.

She laughed in herself
On her seat of stone,
"It would be wanton
To love but one."

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

পাঠকগোষ্ঠি

"পরিচয়ে" প্রকাশিত প্রবন্ধাদি-সম্বন্ধে পাঠকগোষ্ঠির মতামত ব্যক্ত করিবার জন্যই এই পরিচ্ছেদের সূচনা। সমালোচনা পত্রাকারে ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম সংখ্যায় কোনো প্রবন্ধের আলোচনা অসম্ভব। অতএব নূতন পত্রিকা প্রকাশের প্রবৃত্তিকে আক্রমণ করিয়া বীরবল যে-পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বীরবলের পত্র

(১)

আপনি যখন আমাকে আপনার কাগজে কিছু লিখ্‌তে অনুরোধ করেন, তখন আপনার অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে মুখে অস্বীকার না করলেও, মনে মনে রাজী হইনি। এরূপ ইতস্ততঃ করবার কারণ কি জানেন্? লেখা ব্যাপারটা আমার নিত্যকর্ম্ম নয়। আর পাঁচ রকম অসাহিত্যিক নিত্য কর্ম্মের দাবী মিটিয়ে ফুরসৎ পেলেই তবে কলম ধরা, তাও আবার যদি আকাশ-বাতাসের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী না হয়।

আমরা হিন্দুরা এই বলে সূর্য্যের স্তব সুরু করি যে সূর্য্য জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতি। ওর অনুস্বর বাদ দিয়ে কথাটা দাঁড়ায় এই যে হে তপনদেব, তুমি কাশ্যপগোত্রের লাল টুকটুকে জবাফুল—আর তোমার জলুস পেল্লায়, অতএব তোমাকে নমস্কার করি, অবশ্য চোখ বুঁজে। কিন্তু এসব কথা শুধু আমাদের মুখস্থ কথা। সত্য কথা এই যে, এই মহাদ্যুতির তেজ সম্বরণ করা আমাদের মত ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীদের পক্ষে অসাধ্য সাধন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদকে আমরা বলি আম-পাকানো রোদ আর ভাদ্র মাসের রোদ নাকি তাল-পাকানো রোদ। আর এই কলকেতা সহরে গত একমাস ধরে গ্রীষ্ম যে রকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছিল, তাতে আম ও তাল দুই এক সঙ্গে পেকে যেত, অবশ্য এ বৎসর গাছে যদি আম থাকৃত, আর তাড়ীহন্তাদের তাড়ায় তাল যদি তাড়াতাড়ি ফলত। বলা বাহুল্য সূর্য্য যখন এ হেন অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওঠেন তখন সময়টা ঠিক বাংলা লেখার পক্ষে অনুকূল নয়—সংস্কৃত অথবা আরবীর পক্ষে হতে পারে। তা ছাড়া দেশব্যাপী money famine ত আছেই, তবে সে বিষয়ে বৃথা বাক্যব্যয় করব না, কারণ, আর কেউ তা করছেন না। এমন কি অর্থশাস্ত্রীরাও নীরব। বোধহয় এ ক্ষেত্রে famine relief-এর একমাত্র উপায় হচ্ছে মৌনব্রত অবলম্বন করা। ধর্ম্মের অবিরোধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন অর্থ ও কামের সেবা করতেন, আমাদের বোধ হয় তেমনি অর্থের বিরোধে সাহিত্য-সেবা করতে হবে। Genius ব্যতীত অপরের পক্ষে ব্যাপারটা একটু কষ্টকর। আর আমাকে genius বলে কেউ কখনো ভুল করে নি। এমন কি আমার স্ত্রীও করেন নি।

(২)

সূর্য্যের এই অগ্ন্যুৎপাতের কথাটা উল্লেখ করলুম এই কারণে যে, এ জাতীয় ভৌতিক উৎপাতের ধাক্কায় দেহ ও মন এমন কাতর হয়ে পড়ে যে আমার মত অ-বীর লেখকের পক্ষে সে অবস্থায় কলম চালানো অসম্ভব, কারণ কলমকে চালায় মন, হাত নয়।

আপনার কাগজের জন্য লেখবার প্রস্তাবে নিম-রাজী হবার আরও একটি কারণ ছিল। আমি দুটি একটি প্রকাশোন্মুখ কাগজের জন্য লিখ্‌তে প্রতিশ্রুত আছি। আর আমি কথা দিয়ে পারতপক্ষে সে কথাটা রাখ্‌তে চেষ্টা করি। তবে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে এ রকম কথা দিই কেন? উত্তর, না দিয়ে রক্ষা নেই, কারণ আমি পুরোনো লেখক। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নতুন কাগজ মানে হচ্ছে—সেই কাগজ যার লেখক সব পুরোনো। সুতরাং পুরোনো লেখকেরা যদি না লেখেন, তাহলে নতুন কাগজ আর চলে না! এর কারণ তরুণ পত্রের প্রধান লক্ষণই এই যে তার অন্তরে প্রেরণা নেই। তারুণ্য গুণটি কি, বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা ভরসা করে বলা যায় যে যার নিজের উপর ভরসা নেই, সে যুবক হতে পারে কিন্তু তরুণ নয়। অপর পক্ষে যার নিজের শক্তির উপর অগাধ অচলা ও অযথা ভক্তি আছে সেই হচ্ছে যথার্থ তরুণ। যতদিন কিছু না করা যায়, ততদিন সব করতে পারি, এ বিশ্বাস সহজেই হয়। নিজের শক্তির সীমা, আমরা কিছু করতে সুরু করলেই, টের পাই। অবশ্য টের পাওয়াটা যদি আমাদের ধাতে থাকে। লেখা-সম্বন্ধেও এ কথাটা খাটে। তবে অনেক কাল ধরে লিখ্‌লেই যে লেখক হওয়া যায়, তা অবশ্য নয়। এমন পুরোনো লেখকও আছেন যাঁরা লিখে লিখে পুরোনো হয়েছেন কিন্তু আজও লেখক হতে পারেন নি। অর্থাৎ যাঁদের লিখ্‌তে লিখ্‌তে চুল পেকেছে কিন্তু হাত পাকে নি। সুতরাং পুরোনো লেখকের উপর নতুন কাগজের ভরসা রাখাটা ভয়ের কথা।

(৩)

অতঃপর আমি যে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছি, তার প্রথম কারণ, এ বৎসর পয়লা আষাঢ় কালিদাসের মুখ রক্ষা করেছে—অর্থাৎ বৃষ্টি পড়েছে—যদিচ কালিদাস এ কথা কোথাও বলেন নি, এমন কি মেঘদূতেও নয়, যে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বৃষ্টি পড়্‌বেই পড়্‌বে। কিন্তু তাঁর বলা উচিত ছিল। কারণ, মেঘকে আগে কাঁদিয়ে, তার পর তাকে বিরহের কাঁদুনির দূত করাই ন্যায্য। কথামতই হোক্ আর যে কারণেই হোক্ আষাঢ়ের সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি দেখা দিয়েছে।

আর তার দ্বিতীয় কারণ এই—আমি বাঙ্গালার একখানি উপ-পত্রিকায় আমার জনৈক সাহিত্যিক বন্ধুর "ব্যক্তিগত পত্র" পড়েছি। সে পত্রে অনেক কথা ও অনেকের কথা আছে। যথা একদিকে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও Bergson, অপর দিকে শ্রীমান দিলীপ কুমার রায় ও Bertrand Russell প্রভৃতি। আর এই সব ভিন্নধর্ম্মী লেখকদের মধ্যে "হাইফেন"-স্বরূপ আমারও নাম বিরাজ করছে। এতেই আমি মহা খুসী হয়েছি। কেন জানেন? এই স্পষ্ট প্রমাণ যে বাঙ্গালা সাহিত্যিকদের মতে সাহিত্য-জগতে "আমি্ও আছি"। আর "আমি আছি" এই কথাটাই কি জীবনে ও সাহিত্যে সব চাইতে বড় কথা নয়? বেদের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু বেদান্তে যাকে বলে সোঽহং তা কি এই "আমি আছি"র সংস্কৃত তরজমা নয়? বেদান্ত-দর্শনের সার কথা কি এই নয় যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করলে, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হচ্ছে "আমি আছি"। আমি শুধু একা আছি তাই নয়, তুমিও অবশ্য আছ। নিজেকে "সোঽহং" বলতে হলে, তোমাকে বল্‌তে হবে "তত্ত্বমসি"। যেখানে স অহং হয়ে যায়,

সেখানে তৎ ত্বম হতে বাধ্য। যাক্ ও সব বাজে দার্শনিক কথা। বাঙলায় একটা প্রবাদ আছে যে "যে মাছটা সুতো ছিঁড়ে পালায় সেইটেই বড়, যে ছেলেটা মরে সেইটেই ভাল"। উক্ত লৌকিক ন্যায়-অনুসারে সাহিত্য-সম্বন্ধে অনেক সাহিত্যিককে সাহিত্য-লীলা সম্বরণ করবার পরই lionise করা হয়। স্বনামখ্যাত জার্ম্মান কবি Heine বলেছেন যে, I would rather be a live jackal than a dead lion। এই কথাটাই কি মানুষের খাঁটি প্রাণের কথা নয় ? সুতরাং বাঙলার সাহিত্য-সমাজে "আমি আছি," যদিচ জানিনে কোথায়, এই কথা শুনে আবার স্ফূর্তিতে লিখ্তে বসেছি।

ভাল কথা, আমার ইদানিং সন্দেহ হয়েছিল যে ইতিমধ্যে আমি হয়ত লেখক-হিসেবে লঙ্, লিট বা লুঙ্ হয়ে গিয়েছি। সংক্ষেপে লিখছি বলে অতীতের এই সব সংস্কৃত সঙ্কেত দিলুম। ও সবের ইংরেজী নাম লিখ্তে গেলে অনেকটা জায়গা জোড়ে। আর বাঙলায় যে অতীত ও বর্ত্তমানের ভিতর বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই, তা কে না জানে ? অন্ততঃ আপনারা ত নিশ্চয়ই জানেন। কারণ বাঙালীর জীবনে ও মনে sequence of tenses আনবার জন্যই ত আপনারা নূতন পত্রিকা প্রকাশিত করতে ব্রতী হয়েছেন।

(৪)

আমি আছি বটে কিন্তু কোথায় আছি. সেই কথাটাতেই ফিরে আসা যাক্? আমি আছি এর ওর মধ্যে "হাইফেন"-স্বরূপে অর্থাৎ মধ্যস্থ-স্বরূপে। যে লেখক ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই হাত চালায় সে যদি কোথায় থাকে, ত মধ্যে। এই কথাটাই আমার বন্ধুবর অন্য কথায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কেউ Bergson-এর anti-intellectualism প্রচার করতে উদ্যত হলেই আমি তার প্রতিবাদ করি, আবার কেউ, Russell-এর rationalism প্রচার করতে উদ্যত হলেই আমি তার প্রতিবাদ করি। এ কথা শুনে খুসী হবার কারণ—আমি নাকি অনুবাদী নই, ছেরেফ প্রতিবাদী। তথাস্তু। আমরা গত একশ বৎসর ধরে বিলেতি বুলির যথাসাধ্য অনুবাদ করে এসেছি, আর আপনারা কি চান ভবিষ্যতেও আমরা সুধু তাই করব ? ধরুন যদি তাই কাম্য হয়, তাহলেও কি আমরা ইউরোপের নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির অনুধাবন করতে পারব। মনোরাজ্যে দিবারাত্র বিলেতের পিছু পিছু ছোট্‌বার মত আমাদের দম নেই। আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে, ধীরে ধীরে যাও গোরাচাঁদ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু গোরাচাঁদ এখন ছুটে চলেছে প্রগতির পথে। আর আমার কথা হচ্ছে যে ওদেশে মনোজগতে এত দেবতা আছে যে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ, তা স্থির করিতে পারি নে। কেন জানেন? বিলেতের এই Modern লেখকেরা প্রত্যেকেই এক একটি লালমুখো মাষ্টার মহাশয়। আর এঁদের সকলের মুখেই আছে সুধু প্রভুসম্মিত বাণী। প্রভুবাক্য বেশীদিন ধরে প্রসন্নমনে অস্বীকার করা যায় না। Dogmatic বাণীর দোষই এই যে—তাতে অনেক শ্রোতার মনে scepticismএর উদ্রেক করে। আসল কথাটা কি জানেন ? "আমি যে আছি" এই কথাটাই প্রমাণ করবার জন্য আমি গুরুশ্রেণীর লোকদের কথার পাশে প্রশ্ন-চিহ্ন বসিয়ে দিই।

আমার ব্যক্তিগত কথা ছেড়ে দিন। যখন এদেশে স্বরাজ হবে, আর তা হ'তে শুনছি আর বড় বেশী দেরী নেই, তখনও কি দেশের লোক, বিলেতের উক্তির শুধু পুনরুক্তিই করবে ? এই কি আমাদের ideal অর্থাৎ কপালের লেখা ? আমাদের নিজস্ব মন বলে কি কোন জিনিষ নেই অথবা থাক্‌বে না ? আমরা কি কস্মিন কালেও দুনিয়াটা নিজের চোখ দিয়ে দেখ্তে ও বিচার করতে সাহসী হব না ? স্বরাট হওয়ার অর্থ কি, মনোজগতে অপরের ষোল-আনা দাসত্ব অস্বীকার করা—না পরমতের নির্ভুল নকল করা ? মনোরাজ্যে "কিং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে"—ধমক ইউরোপ যেদিন ভারতবর্ষকে দেবে, সেইদিনই আমার মতে ভারতবর্ষের যথার্থ সুদিন হবে। যেমন আজ রাসিয়ায় হয়েছে।

(৫)

ভারতবর্ষের বড় কথা ছেড়ে, এখন নিজের ছোট কথায় ফিরে আসা যাক্। আমার বন্ধুবর আবিষ্কার করেছেন, যে আমি নাকি logicএর নাম শুনলেই magic-এর দোহাই দিই, আর magic এর নাম শুনলেই logic এর দোহাই দিই। অবশ্য বন্ধুবর ঠিক এ কথা বলেননি। তবে বিপিন বাবুর চোখা ভাষায় বন্ধুবরের মত ব্যক্ত করতে গেলে দাঁড়ায় এই।

এর কারণ সম্ভবতঃ আমি logic ও magic-এর কোনটিরই ধার ধারি নে। আর না হয়ত কোনও বিষয়ে একরোখা হবার আমার সাহস নেই। আমি extremist হতে ভয় পাই, কারণ ইংরেজেরা বলে extremes meet—অর্থাৎ যিনি না বেঁকেচুরে সোজা ডান দিকে ছোটেন আর যিনি একই ভাবে বাঁ দিকে ছোটেন, তাঁরা অবশেষে পরস্পর আলিঙ্গন করেন, কারণ পৃথিবী গোলাকার।

Logic-এর extremist হতে ভয় পাই এই জন্যে যে, শেষটা হয়ত দেখব যে magic-এর কোণে গিয়ে পড়েছি। এই কারণেই বোধ হয় আমি Bertrand Russell-র আঁচল ধরে ছুটতে পারি নি। Russell-এর অতি ভক্ত হলে শেষকালে হয়ত আর ভাবতে পারিনে বলে যোগের অতিভক্ত হয়ে পড়্ব। সে ব্যাপারটা যে হবে ঘোর anti-intellectual সে বিষয়েও আর সন্দেহ নেই। যোগ মানে যে "চিত্তবৃত্তি নিরোধ" এ কথা ত স্বয়ং পতঞ্জলিই বলে গিয়েছেন। আর ঘোর logical হতে হলেও যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে হয়—সে কথা Russell সাহেব না বললেও, সত্য। কারণ logic হচ্ছে পদার্থের অর্থ বাদ দিয়ে তার পদ সাধা মাত্র। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার অর্থ কি সার্থকতা আমি কস্মিন কালেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। আমি স্বভাবতঃই নিরোধের চাইতে বিরোধের বেশী পক্ষপাতী। চিত্ত মানেই হচ্ছে চিত্ত-চাঞ্চল্য আর সে চাঞ্চল্যকে ঠাণ্ডা করার মানে চিত্তকে ঠাণ্ডা করা—অর্থাৎ জড় পদার্থে পরিণত করা। এখন বলি বন্ধুবর গোড়াতেই একটু ভুল করেছেন। Intellect বলতে যদি logic বুঝতে হয়, তাহলে Bergson anti-intellectual নন, মারাত্মক logician আর (rationalist মানে যদি হয় sceptic) Russell সাহেবও ralionalist নন—মারমুখো dogmatist আর তাতেই তাঁর জোর। Dogma বলতে সুধু সেকেলে খ্রীষ্টধর্ম্মের dogma বোঝায় না—একেলে নব dogma-ও বোঝায়। আর dogmaর সঙ্গে লড়্তে পারে সুধু

dogma। আজ আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক এই মত প্রকাশ করেছেন।

"Je regarde le rationalisme et l'anti-intellectualisme comme deux *vices contraires* egalement pernicieux a la vie de l'esprit."

এ-কথা পড়ে মহা আশ্বস্ত হয়েছি, কারণ ঐ কথাই প্রমাণ যে এই বিপুলা পৃথিবীতে আমার সমানধর্ম্মী সাহিত্যিক আজও আছে।

(৬)

তবে বন্ধুবর একটা কথা ঠিকই ধরেছেন। আমি মনোরাজ্যে modern নই মডারেট। Moderation জিনিষটে যে অতি সেকেলে, তা কে না জানে। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব ও গ্রীসে আরিষ্টটেল, উভয়েই সামাজিক লোক্‌কে মধ্যপথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আর কোন কথা পুরোনো হলেই—যে অসত্য হয়ে যায় তা ত নয়। বরং অনেক সময়ে দেখা যায় যে লোকে যাকে নতুন কথা বলে, তা একটু বেশি পুরোনো—অর্থাৎ এত পুরোনো যে লোকে তা ভুলে যাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে। স্বতরাং অতি modern রাসেল সাহেবও যে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি আশ্চর্য্য হই নি, অবশ্য তাঁর ভক্তরা রাগ করতে পারেন। তেলাকুচোর গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলে—কে না রাগ করে। সে গাছের নাম modernismই হোক আর rationalismই হোক্।

এখন Russell তাঁর সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে কি লিখেছেন শুনুন।

"The ancients, as everyone knows, regarded moderation as one of the cardinal virtues. The ancients, however, were clearly in the right. In the good life there must be a balance between different activities and no one of them must be carried so as to make the other impossible."

(The Conquest of Happiness p. 165.)

অবশ্য intellectual activities-ও যাকে আমরা বলি activities তারই অন্তর্ভুক্ত। অতএব চিন্তারাজ্যেও মনের balance রাখবার চেষ্টাটা লজ্জাকর নয়। আর এই প্রচেষ্টার নাম হচ্ছে moderation।

এতক্ষণ ত বীরবলের বাচালতা শুনলেন। আপনার পত্রে কি এ-রকম বাজে বকুন্নির স্থান হবে? আর যদি না হয় ত প্রমথ চৌধুরীকে আপনাদের দলে ভর্ত্তি করে নেবেন। বড় কথাকে ছোট করা আমার স্বভাব হবে কিন্তু ভদ্রলোক দেশীবিদেশী সব রকম বড় কথাকে আরও বড় করতে সদাই ব্যগ্র, সদাই প্রস্তুত।

বীরবল

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৩৩৮

পরিচয়

পত্রিকা

শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু

কল্যাণীয়েষু—

তোমার ত্রৈমাসিকের আসরে আমার কোনো একটি লেখার উদ্দেশে তোমার আমন্ত্রণ আছে। কোনো সাজসজ্জা না ক'রে এক-ছুটে গেলে যদি মানা না পায় তাহলে এই সুরু হোলো।

প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের ক'রলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলাদেশে চল্‌তে পারে তা বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িক পত্রে সময়রক্ষা ক'রে চলার বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেকালে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ যেমন অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নে যাত্রা সুরু ক'রতে লজ্জিত হত না, মাসিকপত্র তেমনি ললাটে মলাটে বৈশাখমাসের তিলক কেটে অগ্রহায়ণ মাসে যখন অসঙ্কোচে আসরে নাম্‌ত সহিষ্ণু পাঠকের কাছে কোনো কৈফিয়তের দরকার হত না। পাঠকদের ক্ষমাগুণের 'পরে নির্ভর ক'রে এমনতর আট-পৌরে ঢিলেমি করবার সুযোগ প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করেননি—নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন্ হতে দিলেন না। তিনি প্রমাণ করলেন বাংলা সাময়িক পত্রে এই প্রচুর ভোজ এবং নূতন ভদ্র চাল অচল হবে না। বস্তুত পাঠকদের এমন অভ্যাস জন্মে গেল যে আয়োজনে কম প'ড়লে বা আচরণে শৈথিল্য ঘটলে আর নিজগুণে তারা ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রবে না যে, এতে সন্দেহ রইল না।

তা'র পর থেকে চ'ল্‌ল এই ছাঁদেরই মাসিক পত্রের অনুকরণ। নূতনত্বের চেষ্টা কেবল পরিমাণবাহুল্যের দিকে, ফর্ম্মা বৃদ্ধির ঘোড়দৌড়ে। আরো ছবি, আরো গল্প, আরো হাজার রকমের ইত্যাদি।

প্রবাসী-জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি ক'রেচে। জন-সাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু